ব্যাচেলর অব এডুকেশন

জীববিজ্ঞান শিক্ষণ

Teaching Biology

EDBN 1424

রচনা

প্রফেসর সুফিয়া বেগম
ড. রেহেনা খাতুন
হাসনাৎ জাহান
সামসুদ্দিন আহমেদ তালকুদার
আবুল আজহার মুঃ ছানাউল্লাহ

মূল্যায়ন

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র ভৌমিক
ড. ইরম জাহান
মাফরুহা নাজনীন

সম্পাদনা

হাসনাৎ জাহান

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

জীববিজ্ঞান শিক্ষণ
EDBN 1424
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0114-4

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

শিরোনাম		
ক্রমিক	**ইউনিট ১ : মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও জীববিজ্ঞান শিক্ষাক্রম**	পৃষ্ঠা
১.১	মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
১.২	লক্ষ্য থেকে ক্রমশ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু তৈরির কৌশল	৫
১.৩	পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ, শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে পাঠ্য বইয়ের মূল্যায়ন	৭
১.৪	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে শ্রেণিশিক্ষকগণের ভূমিকা	১০
	ইউনিট ২: জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনা	
২.১	পাঠ পরিকল্পনা ও জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	১৩
২.২	জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ	১৩
২.৩	জীববিজ্ঞান শিখনে দক্ষতা অর্জনের উপায়	২১
	ইউনিট ৩: জীববিজ্ঞান শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির উপায়	
৩.১	বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিক্ষণ: অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি, প্রদর্শন ও প্রজেক্ট পদ্ধতি, হাতে কলমে শিখন, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিখন	২৩
৩.২	জীববিজ্ঞান বিষয়ে বিতর্ক, পত্রিকা, জার্নাল, ফিল্ড ট্রিপ	৩২
৩.৩	বিজ্ঞান যাদুঘর পরিদর্শন, তথ্যপ্রযুক্তির মেলা, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান ক্লাব	৩৯
	ইউনিট ৪: জীবকোষ, কোষের গঠন, কোষ বিভাজন	
৪.১	জীবকোষ, কোষ অঙ্গানু, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম	৪৭
৪.২	কোষ বিভাজন: মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব	৫৪
	ইউনিট ৫: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব	
৫.১	সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও প্রভাবকের (ক্লোরোফিল, আলো ইত্যাদি) ভূমিকা	৬০
৫.২	সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া: ক্যালভিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র	৬৩
৫.৩	শ্বসন প্রক্রিয়া	৬৭
	ইউনিট ৬: জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ	
৬.১	বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের আন্ত:সম্পর্ক , জীববৈচিত্র্য ও এর প্রকারভেদ	৭৪
৬.২	অনুসন্ধানমূলক কাজ: একটি নির্বাচিত পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক অনুসন্ধান	৭৬
৬.৩	বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব, স্থলজ, জলজ ও মরুজ পরিবেশে জীবের অভিযোজন	৭৯
	ইউনিট ৭: জীববিজ্ঞান শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	
৭.১	জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য, শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (অধিক সংখ্যক, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রে)	৮৩
৭.২	জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজ ও কাজের উদ্দেশ্য, জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের ধাপ ও পরিকল্পনা. জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নৈতিক মূল্যবোধ, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সতর্কতা	৮৪
৭.৩	জীববিজ্ঞান শিখন সহায়ক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ	৮৬

ইউনিট ৮: জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়ন		
৮.১	মূল্যায়ন ও জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ	৯২
৮.২	জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন	৯৪
৮.৩	জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য ও কৌশল	৯৬
৮.৪	জীববিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন	১০০
৮.৫	জীববিজ্ঞান বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন	১০৭
৮.৬	জীববিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন টুলস তৈরিতে আইসিটির ব্যবহার	১০৯
ইউনিট ৯: জীববিজ্ঞানে স্ব-শিখন		
৯.১	**জীববিজ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা, শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠন, নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল**	১১৩
৯.২	ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন, জীববিজ্ঞান শিখনের নবতর ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখা,	১১৯
৯.৩	জীববিজ্ঞান শিখনে প্রতিফলন প্রক্রিয়া/কর্ম সহায়ক গবেষণা	১২৭
ইউনিট ১০: রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র		
১০.১	রক্ত, রক্তের উপাদান ও কাজ , রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ও রক্ত নির্বাচন, ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা (রক্ত সঞ্চালন ও গর্ভধারণজনিত জটিলতা)	১৩৩
১০.২	ব্যবহারিক কাজ: রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড	১৩৮
১০.৩	রক্ত সঞ্চালন(হৃদপিণ্ডের গঠন ও কাজ, শিরা ও ধমনির কাজ, রক্ত চাপের ভূমিকা)	১৩৯
১০.৪	মানবদেহে রক্ত সংবহন: সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারী সংবহন, হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগ ও করণীয়	১৪২
১০.৫	ABO রক্ত গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সম্যসা (রক্ত সঞ্চালন ও গর্ভধারণজনিত জটিলতা)	১৪৭
ইউনিট ১১: খাদ্য, পুষ্টি, পরিপাক ও শোষণ		
১১.১	বিএমআর ও বিএমআই	১৫০
১১.২	মুখগহ্বরে, পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে ও ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক	১৫১
১১.৩	পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা, বিভিন্ন ধরনের আন্ত্রিক সমস্যা	১৫৬
ইউনিট ১২: জীনতত্ত্ব ও জৈব প্রযুক্তি		
১২.১	বংশগতির ধারণা ও মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স(মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র),লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি, সেক্সলিঙ্কড ডিসওয়ার্ডার (বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি)	১৬০
১২.২	বিবর্তনের ধারণা ও প্রমাণাদি	১৬৬
১২.৩	জীব প্রযুক্তি	১৭০

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও জীববিজ্ঞান শিক্ষাক্রম

জ্ঞান অর্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্তকরণ ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি শাখা যাতে জীব ও জীবন সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা করা হয়। তাদের গঠন, বৃদ্ধি, বিবর্তন, শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জীববিজ্ঞান খুব বিস্তৃত একটি ক্ষেত্র, যেটির অনেক শাখা-উপশাখা আছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান বলে -- কোষ হচ্ছে জীবনের মূল একক, আর জীন হল বংশগতির মূল একক আর বিবর্তন হল একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নতুন প্রজাতির জীব সৃষ্টি হয়।

জীবকে জানার ইচ্ছা আমাদের সবারই থাকে। কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে ঘুরঘুর করে। যেমন: আমাদের চারপাশে নানা রকম জীব দেখি- এদের উদ্ভব কিভাবে হল? কিভাবে তারা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে? খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমাচ্ছে? কেন আমাদের হাড়ের সঙ্গে কুমিরের হাড়ের মিল আছে? কেন বানর দেখতে আমাদের কাছাকাছি, কিন্তু গাছপালা দেখতে একদম অন্যরকম? ডাইনোসর কেন পৃথিবীতে ছিল আর এখন নেই ? কিভাবে প্রথম প্রাণ তৈরি হয়েছে? এই সব প্রশ্ন থেকেই জীববিজ্ঞান বিষয়ের অবতারণা।

কারিকুলাম কথাটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল ঘোড় দৌড়ের নির্দিষ্ট পথ। আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য একটি কোর্স। শিক্ষার কোনো একটি নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রয়োজন। এ পূর্ব পরিকল্পনা থেকেই শিক্ষাক্রমের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক এবং সামাজিক বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা জীবনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুঁজে পাবে ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। একই সাথে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মানবিক আবেদন উপলব্ধি করতে পারবে। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত ও উদার মনোভাবাপন্ন হয় শিক্ষাক্রমে তার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রক্রিয়ায় সাথে পরিচিত করে একটি বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার জন্য জীববিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

১.১ মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১.২ লক্ষ্য থেকে ক্রমশ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু তৈরির কৌশল
১.৩ পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ, শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে পাঠ্যবইয়ের মূল্যায়ন
১.৪ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে শ্রেণি শিক্ষকগণের ভূমিকা

১.১ মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

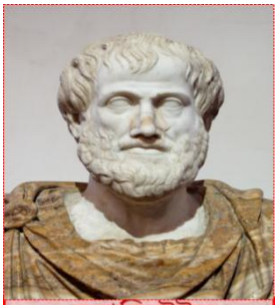
অ্যারিস্টটল

বিজ্ঞানের অন্যতম একটি মৌলিক শাখা জীববিজ্ঞান। প্রকৃতিতে আমরা যা দেখতে পাই তার একটি জড় পদার্থ ও অপরটি জীব। জড় পদার্থের গুণাগুণ পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান শাখায় পর্যালোচনা করা হয়। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন, জৈবনিক ক্রিয়া এবং জীবনধারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পাওয়া যায় তাকেই জীববিজ্ঞান (Biology) বলা হয়। জীববিজ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখা। জীববিজ্ঞানের ইংরেজি Biology। Biology দুটি ল্যাটিন শব্দ bios অর্থ জীবন এবং logos অর্থ জ্ঞান এর সমন্বয়ে গঠিত। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে (খৃস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) জীববিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

জীববিজ্ঞানের শাখাসমূহ

জীবের ধরণ অনুসারে জীববিজ্ঞানকে প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করা হয়, যথা- উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান। জীবের কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে জীববিজ্ঞানকে আবার ভৌত জীববিজ্ঞান ও ফলিত জীববিজ্ঞান এ দুটি শাখায় ভাগ করা হয়।

ভৌত জীববিজ্ঞান-ভৌত জীববিজ্ঞান শাখায় তত্ত্বীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এতে সাধারণত নিচের উল্লেখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

১. অঙ্গসংস্থান (Morphology): জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক বা দৈহিক গঠন বর্ণনা এ শাখার আলোচিত বিষয়। দেহের বাহ্যিক বর্ণনার বিষয়কে বহি:অঙ্গসংস্থান (external morphology) এবং দেহের অভ্যন্তরীণ বর্ণনার বিষয়কে অন্ত:অঙ্গসংস্থান (internal morphology/Anatomy) বলা হয়।

২. শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যা বা ট্যাক্সোনমি (Taxonomy): জীবের শ্রেণিবিন্যাস ও রীতিনীতিসমূহ এ শাখার আলোচিত বিষয়।

৩. শারীরবিদ্যা(Physiology): জীবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জৈব রাসায়নিক কার্যাদি এ শাখায় আলোচিত হয়। এছাড়াও জীবের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজের বিবরণ এ শাখায় পাওয়া যায়।

৪. হিস্টোলজি(Histology): জীবদেহের টিস্যুসমূহের গঠন, বিন্যাস ও কার্যাবলি নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৫. ভ্রূণবিদ্যা (Embryology): এখানে জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৬. কোষবিদ্যা (Cytology): এখানে জীব দেহের একক কোষের গঠন, কার্যাবলি ও বিভাজন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৭. বংশগতিবিদ্যা(Genetics): জীন ও বংশগতি নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৮. বিবর্তনবিদ্যা(Evolution): প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তন নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৯. বাস্তুবিদ্যা(Ecology): প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

১০. এন্ডোক্রাইনোলজি (Endocrinology): জীবদেহে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও হরমোনের কার্যকারিতা নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

১১. জীবভূগোল (Biogeography): জীবের ভৌগলিক বিস্তারের সাথে ভূমন্ডলের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

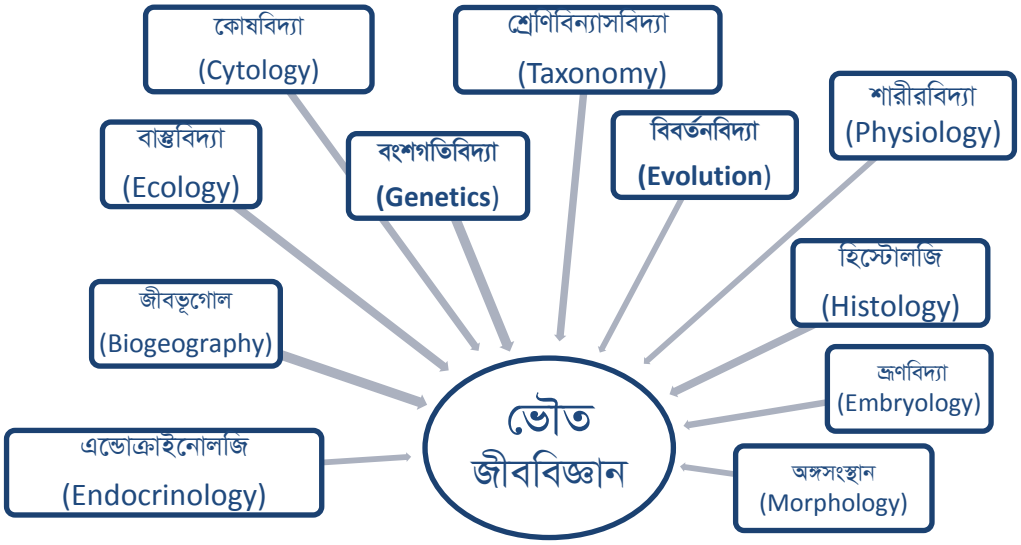

ফলিত জীববিজ্ঞান- জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীব সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখাটিকে ফলিত জীববিজ্ঞান বলে। এতে সাধারণত নিচের উল্লেখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়-

১. প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা (Palaeontology): প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ ও জীবাশ্ম নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

২. জীবপরিসংখ্যানবিদ্যা(Biostatistics): জীব পরিসংখ্যান বিষয়ক জ্ঞান।

৩. পরজীবীবিদ্যা (Parasitology): পরজীবী জীবের জীবন ইতিহাস ও এদের কারণে সৃষ্ট রোগ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৪. মাৎস্যবিজ্ঞান (Fisheries) : মাছ, মাছ চাষ, মাৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৫. কীটতত্ত্ব (Entomology) : কীটপতংগের জীবন ইতিহাস, অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং বাস্তুতন্ত্রে এদের ভুমিকা নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

৬. অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology): ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য অনুজীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

৭. কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture): কৃষি বিষয়ক বিজ্ঞান।
৮. চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medical Science): মানব জীবন, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ।
৯. জিন প্রযুক্তি (Genetic Engineering): জিন প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১০. প্রাণরসায়ন (Biochemistry): জীবের প্রাণরাসায়নিক কার্যাবলি নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১১. পরিবেশ বিজ্ঞান(Environmental Science): পরিবেশ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১২. মৃত্তিকা বিজ্ঞান(Soil Science): মাটি, মাটির গঠন ও পরিবেশ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১৩. সামুদ্রিকজীববিজ্ঞান (Oceanography): সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১৪. বনবিজ্ঞান(Forestry) : বন, বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও গুরুত্ব নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১৫. জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology): মানব ও পরিবেশের কল্যানে জীবপ্রযুক্তি নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।
১৬. ফার্মেসি (Pharmacy): ঔষধ শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান।
১৭. বন্যপ্রাণিবিদ্যা (Wildlife): বন্যপ্রাণী বিষয়ক জ্ঞান।
১৮. বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics): কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর জীববিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য :

বিজ্ঞান বিমুখ কোনো জাতি এই একবিংশ শতাব্দীতে দীর্ঘকালের জন্য সুন্দরভাবে টিকে থাকতে পারবেনা। কর্মজগতে অংশগ্রহনের জন্য বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করার জন্য মাধ্যমিক স্তরেই জীববিজ্ঞান পাঠে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে জীববিজ্ঞানের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শতক । জীববিজ্ঞান শিক্ষার মূল উপজীব্য হচ্ছে জীবন থেকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা গ্রহণ । আর শিক্ষা গ্রহণের ধারাবাহিকতায় প্রকৃতি ও জীবনকে জানা একটি অনস্বীকার্য বিষয় । নবম ও দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞানের নতুন শিক্ষাক্রমে আনন্দের সাথে জীবজগতকে জানার সেই সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে জীববিজ্ঞানকে জানার জন্য বৈজ্ঞানিক ধারণা ও তত্ত্বের পাশাপাশি জীবনভিত্তিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে ভালভাবে জানবে এবং সংরক্ষণ করবে এই প্রত্যাশা আজ সবার। এই প্রত্যাশা সামনে রেখে মানব ও পরিবেশগত দিকগুলোকে যুগোপযোগী করে তুলে ধরে শিক্ষাক্রমে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত হয়েছে বিভিন্ন রোগতত্ত্বের ও জীবপ্রযুক্তির প্রাথমিক ধারণা। এতে শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের এবং বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ার উপর নতুন শিক্ষাক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্থনির্ভর পড়ালেখা থেকে নিরুৎসাহিত করতে বাস্তব ও জীবনভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উদাহরণ তুলে ধরে তার সম্ভাব্য প্রতিকারমূলক দিকগুলো রাখা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধিৎসু হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে জীবজগতকে জানার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। আর শিক্ষকবৃন্দও উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল অনুসরণ করতে উৎসাহিত হবেন। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রায়োগিক শাখার বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে ।

মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

শিক্ষাক্রমের ধারণা : শিক্ষাক্রমকে বলা হয় একটি শিক্ষা ব্যবস্থার হৃদপিণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন-
"শিক্ষাক্রম হল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল শিখন অভিজ্ঞতা" (ক্যাসওয়েল ও ক্যাম্পবেল -১৯৩৫)।
"শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা"(হিলদা-১৯৬২)
১৯৫৬ সালে রাফ টাইলর ৪টি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-

- শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?
- ঐ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য কী কী শিখন অভিজ্ঞতা আবশ্যক?
- ঐ অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে সংগঠিত করা যায়?
- ঐ উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হলো কিনা তা কিভাবে যাচাই করা যায়?

পাঠ্যসূচি হল শিক্ষাক্রমের অংশ বিশেষ। শিক্ষাক্রমের একটি বিশেষ উপাদান বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠ্যসূচি গঠিত হয়। কোনো শ্রেণিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু পড়ানো হবে, তারই বিস্তারিত বিবরণ বা তালিকা হল পাঠ্যসূচি। সাধারণত শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাক্রম পৌঁছায়না। পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায়। শিক্ষাক্রমকে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হলে, পাঠ্যসূচি হবে ওই বৃক্ষের একটিশাখা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

- ❖ শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপক ধারণা
- ❖ কোনো একটি শিক্ষাস্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ও পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলো জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি অর্জনের নিমিত্তে সামগ্রিক কার্যের রূপই হলো শিক্ষাক্রম।
- ❖ শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (যে সকল বিষয়ে ব্যবহার আছে) দিক উল্লেখ থাকে
- ❖ শিক্ষাক্রম একটি স্তরের কিংবা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার জন্য হতে পারে
- ❖ একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণিতে কোনো একটি বিষয়ের জন্য কী কী শিখানো হবে তাই পাঠ্যসূচিতে থাকে
- ❖ পাঠ্যসূচিতে সুনির্দিষ্টভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক মানবণ্টনসহ উল্লেখ থাকে
- ❖ পাঠ্যসূচী প্রত্যেকটি বিষয়ের ও শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা প্রণয়ন করতে হয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ নবম ও দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যঃ

১. প্রকৃতির নানা বস্তু ও ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এগুলোর প্রতি অনুসন্ধিৎসূ ও কৌতূহলী হওয়া।

২. বিশ্ব জগতে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পেছনের কারণ (Reason behind) উপলব্ধি করা।

৩. বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ধারণা, সূত্র, নীতি ও তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সেই সঙ্গে লেখচিত্র, সারণি, প্রতীক, চিত্র, নকশা, মডেল এবং ভাষা প্রকাশে দক্ষ হওয়া।

৪. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ পদ্ধতি (Scientific Process and Experimental Method) চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতা (Creativity), যাচাই করার দক্ষতা (Critical thinking skill) ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Problem Solving Skill) অর্জন করা ।

৫. বিজ্ঞানের ব্যবহারিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং বিভিন্ন যন্ত্রনির্মাণ ও প্রযুক্তির বিকাশে বিজ্ঞানের নিয়মের কার্যকারিতা অনুধাবন করা।

৬. জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বিজ্ঞানের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা।

৭. বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হওয়া।

৮. বিজ্ঞান চর্চার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপলব্ধি করা।

৯. বিজ্ঞানের বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল ধারা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী হওয়া ।

১০. বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত ও যৌক্তিক চিন্তার অধিকারী হওয়া।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ নবম ও দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১. জীববিজ্ঞানের ধারণা ও পরিধি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

২. জীবের শ্রেণিবিন্যাস করার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।

৩. জীবদেহের গাঠনিক একক- কোষের জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

৪. জীবের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এগুলির প্রতি অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী হওয়া।

৫. জীব ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, এদের সমন্বয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

৬. জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও মানব কল্যাণে এর অবদান উপলব্ধি করা।

৭. জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা নীতি, তত্ত্বসমূহ, চিত্র, নকশা, সারণি এবং ভাষায় প্রকাশের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।

৮. জীববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও মানব কল্যাণে অবদান রাখার দক্ষতা অর্জন করা।

৯. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে জীববিজ্ঞানের অবদান উপলব্ধি করা।

১০. জীববিজ্ঞান চর্চার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপলব্ধি করা এবং জীবের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ তৈরি হওয়া।

১.২ লক্ষ্য থেকে ক্রমশ উদ্দেশ্য, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু তৈরির কৌশল

লক্ষ্য থেকে ক্রমশ উদ্দেশ্য: শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরের (যেমন- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি) শিক্ষণীয় বিষয়ের সমষ্টি বা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মসূচি সব কিছুই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে- তার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলামের লক্ষ্য জাতীয় দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ, জাতীয় চাহিদা ও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য থাকে অনেক ব্যাপক।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য : লক্ষ্য অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এ সব উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে কোন কোন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তরভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয় শিখন ফল। একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও শিখন ফল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী কী অর্জন করবে- তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই হল শিখন ফল। শিখনফল গুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ যোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রধান প্রধান অংশগুলোর মধ্যে থাকবে–

- ভূমিকা
- স্তরভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্য
- বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য
- প্রান্তিক শিখনফল
- শিখন শেখানো কার্যাবলি, পদ্ধতি, উপকরণ ইত্যাদি
- মূল্যায়ন নির্দেশনা
- সময় ও নম্বর বণ্টন

অধ্যায় বিন্যাস ও সময় বণ্টন

নবম ও দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়টিকে তিনটি শিখনক্ষেত্রের চৌদ্দটি অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৫০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সপ্তাহে তিনটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। হাতে–কলমে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষক একাধিক পিরিয়ড একসাথে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

অধ্যায় ভিত্তিক বরাদ্দকৃত পিরিয়ড : ৯ম ও ১০ম শ্রেণি

অধ্যায়	অধ্যায় এর নাম	পাঠ সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	জীবন পাঠ	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	জীব কোষ ও টিস্যু	২২
তৃতীয় অধ্যায়	কোষ বিভাজন	১৩
চর্তুথ অধ্যায়	জীবনীশক্তি	১৫
পঞ্চম অধ্যায়	খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়	জীবে পরিবহণ	২৫
সপ্তম অধ্যায়	গ্যাসীয় বিনিময়	১১
অষ্টম অধ্যায়	রেচনপ্রক্রিয়া	১৫
নবম অধ্যায়	দৃঢ়তা প্রদান ও চলন	১৩
দশম অধ্যায়	সমন্বয়	১৫
একাদশ অধ্যায়	জীবে প্রজনন	১৫
দ্বাদশ অধ্যায়	জীবের বংশগতি ও বিবর্তন	১৪
ত্রয়োদশ অধ্যায়	জীবের পরিবেশ	১৫
চতুর্দশ অধ্যায়	জীব প্রযুক্তি	১২

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ নবম ও দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন ব্যবস্থা : বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০%।

প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন :

(ক) শ্রেণির কাজ--০৫

(খ) বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ-০৫

(গ) শ্রেণি অভীক্ষা-১০

প্রতি বিষয় শিক্ষক কর্তৃক স্ব স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। শ্রেণিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নিয়ে ৮০% এ পরিবর্তিত করে এবং ২০% ধারাবাহিক মূল্যায়ন যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হবে। বোর্ড পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের পরীক্ষা ও ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে। ৭৫ নম্বরের পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের সৃজনশীল ও ২৫ নম্বরের বহুনির্বাচনীমূলক প্রশ্নের পরীক্ষা হবে।

শিখনফল ও বিষয়বস্তু তৈরির কৌশল

শিখনফল: কোন একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্য হল শিখনফল। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শিখনফল বলে। অন্যভাবে বলা যায় শিখনফল হল শিখনের লক্ষ্য(Learning Goal)।

শিখনফলের বৈশিষ্ট: এক কথায় শিখনফল হবে SMART।

- সুনির্দিষ্ট(Specific): নির্দিষ্ট পাঠের জন্য নির্দিষ্ট শিখনফল থাকবে। পাঠের বাইরে শিখনফল নির্ধারণ করা যাবেনা।
- পরিমাপযোগ্য (Measurable): শিখনফল অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হবে। যে সকল ভাষা পরিমাপযোগ্য নয় তা শিখনফলের ভাষা হিসেবে লেখা যাবেনা।
- অর্জনযোগ্য (Achievable): শিখনফল অবশ্যই অর্জনযোগ্য হবে। শ্রেণিকক্ষে অর্জন করা যাবেনা এমন শিখনফল নির্ধারণ করা যাবেনা।
- বাস্তবধর্মী(Realistic): শিখনফল হবে বাস্তবধর্মী। কারণ অবাস্তব কিংবা জীবন বা সমাজের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে শেখানো যাবেনা।
- নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তিযোগ্য (Time bound) : একটি সেশনের জন্য নির্দিষ্ট যে সময় বরাদ্দ ঠিক সে সময়ের মধ্য সেশনটি শেষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে পরবর্তী সেশনের শিক্ষক এসে ক্লাশের বাইরে দাড়িঁয়ে না থাকেন। কারণ এটি উভয়ের জন্য বিড়ম্বনা।

জীববিজ্ঞান শিখনফল লেখার উপযোগী কিছু কার্যকরী ক্রিয়াবাচক শব্দ: বলতে পারা, উল্লেখ করতে পারা ,বর্ণনা করা,ব্যাখ্যা করা. প্রমান করা, পরীক্ষা করা, চিহ্নিত করা, পরিমাপ করা, উদাহরণ দেয়া, নামকরণ করা, অংকন করা, বিশ্লেষণ করা, পার্থক্য করা, মিল করা, তুলনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যুক্তি দেয়া, পর্যবেক্ষণ করা, সনাক্ত করা, গঠন করা, শ্রেণিবিভাগ করা, নির্বাচন করা, প্রয়োগ করা, সাঁজানো, বিবৃত করা ইত্যাদি। **কখনই জানতে,ধারণা করা বা বুঝতে** পারবে লেখা যাবে না ।

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক শিখনফল

বুদ্ধিবৃত্তীয়

১. ভৌত ও বস্তু জগৎ

- অনুসন্ধিৎসূ দৃষ্টিতে ভৌত জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারবে।
- ভৌত বিজ্ঞানের ধারণা, সূত্র, নীতি ও তত্ত্বের আলোকে বস্তু ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
- বস্তুর বৈশিষ্ট্য, নামকরণ, শ্রেণিবিভাগ ও গঠন বিন্যাস এবং বাহ্যিক প্রভাবে এদের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে ভৌত বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনা, সূত্র, নীতি এবং তত্ত্ব যাচাই করতে পারবে এবং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।
- বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে লেখচিত্র, সারণি, প্রতীক, চিত্র, নকশা, মডেল এবং ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবে।

২. পৃথিবী এবং মহাকাশ

- মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর পরিচয় ও তাদের গতি প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে।
- মহাবিশ্বের বিস্তৃতি এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর পরিচয়, এর উৎপত্তি ও পরিণতি ব্যাখা করতে পারবে।
- সৌর জগতের বিস্তৃতি, উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পৃথিবীর উৎপত্তি, গতি ও ফলাফল এবং কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবে।

৩. জীব জগৎ

- জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাস, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন, শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালী, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে জীবজগতের বিভিন্ন ঘটনা, এদের গঠন, শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জীব জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে চিত্র, নকশা, মডেল এবং ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।

৪. আমাদের পরিবেশ

- প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থানের উপাদানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
- বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারসাম্য রক্ষা করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে।

মনোপেশিজ

- যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।
- লেখচিত্র, সারণি, প্রতীক, চিত্র, নঁকশা অংকন করে বিজ্ঞানের ধারণা, সূত্র, নীতি, মডেল এবং তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারবে।

আবেগীয়

- জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কারমুক্ততা এবং মূল্যবোধের লালন ও তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।
- বিজ্ঞান চর্চার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও আনন্দ উপলব্ধি ও তার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।
- বিজ্ঞানের বিকাশমান ও পরিবর্তনশীল ধারা উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করবে।

১.৩ পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ এবং শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে পাঠ্য বইয়ের মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অধ্যায় ও বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন। শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখকগণ তখন বই রচনা করেন। লেখকের লক্ষ্য থাকে যেন পাঠ্যবইয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের যথাযথ প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানী, দক্ষ, সৃজনশীল ও মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। এসবের পাশাপাশি শিক্ষাক্রমের আর একটি লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই লেখকের উপর দায়িত্ব বর্তায় পাঠ্যবইকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন করা।

বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ

শিক্ষকের কাছে পাঠ্যবই একমাত্র শিক্ষণ উপকরণ নয়। শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্যবইয়ের বাইরে তাদের জন্য অনেক উপকরণ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবই মূখ্য শিখন সামগ্রী। তাদের পাঠ প্রস্তুতির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে বৈচিত্র্যময় শিখন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভ করে। তাই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ খুব

সতকর্তার সাথে অধ্যায় নির্বাচন ও বিষয়বস্তু সাজিয়ে থাকেন। বিষয়বস্তুর বিন্যাসে ক্রমান্বতি বা ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মাধ্যমিক স্তরের জীববিজ্ঞান বইটির বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি যথাযথ আছে কি না তা বিশ্লেষণে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

- প্রতিটি বিষয়ের কিছু সাধারণ ও মৌলিক ধারণা থাকে। পাঠ্যবইয়ের প্রথম অধ্যায়টি থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক ধারণা সম্পর্কিত। শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের অর্জিত জ্ঞান বিবেচনায় নিয়ে নতুন বইয়ে সে জ্ঞান কিছুটা বর্ধিত আকারে উপস্থাপন করতে হয়। উদ্দেশ্য হল আগের শিখনকে ভিত্তি করে নতুন শিখন যেন সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়। একে বলে বিষয়বস্তুর উল্লম্ব বিন্যাস।
- শিখনতত্ত্ব অনুযায়ী জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ধারায় সম্প্রসারিত হতে থাকে। জ্ঞান যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে সে জ্ঞান কখনো স্থায়ী হয় না। তাই পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের সাথে পরের অধ্যায়গুলির ক্রমান্বতি বা ধারাবাহিকতা বজায় আছে কিনা তা দেখার বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়ের পরের অধ্যায়গুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্প্রসারিত থাকে। অর্থাৎ আগের ধারণা আগে এবং পরের ধারণা পরে, এই অনুক্রম বজায় রাখতে হয়। একে বলে বিষয়বস্তুর আনুভূমিক বিন্যাস।
- শুধুমাত্র অধ্যায়গুলোই অনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত হবে না। প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠগুলোও আনুভূমিকভাবে বিন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্রমশ বর্ধিত হবে। বিষয়বস্তুর ধারণার এই ধরনের বিন্যাসকে বলে স্পাইরাল বা প্যাঁচানো। অর্থ্যাৎ ধারণা যতই অগ্রসর হউক না কেন তার মূল ভিত্তি হবে অভিন্ন।
- বিষয়বস্তু সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিন এই অনুক্রমে সাজানো থাকবে। শিক্ষার্থীর নিকট কোন বিষয়বস্তু সহজ মনে হওয়ার অর্থ হল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান তার আছে। কাজেই পরের পাঠগুলি তার কঠিন মনে হবে না। সে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস সহকারে পাঠে অগ্রসর হবে।
- বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বিস্তারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কোন বিষয়বস্তুর তত্ত্ব ও তথ্য অনেক বিশ্লেষনধর্মী হলে তার ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি হবে অনেক বেশি। এমনটি না হলে ঐ বিষয়ে ধারণার সাঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানার্জনে বাধাগ্রস্ত হবে।
- বিষয়বস্তুগুলোর অবস্থান্তর পর্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকেবে। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর ব্যত্যয় ঘটলে সম্পর্কের দিক থেকে বিষয়বস্তুগুলিকে পরস্পর খাপছাড়া মনে হবে।

পাঠ্যবইয়ের মূল্যায়ন

একটি মানসম্মত পাঠ্যবই কারিকুলামের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করে। কারিকুলামে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস থাকে। এমনকি বিষয়বস্তু আত্তস্থকরণের জন্য সম্ভাব্য শিখন কৌশল দেওয়া থাকে। একটি ভাল পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবে এটাই স্বভাবিক। কিন্তু একটি পাঠ্যবইয়ের গূণাগুণ সম্পর্কে জানতে হলে বইটিকে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। পাঠ্যবই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়গুলি নিম্নরুপ:

বিষয়বস্তু

- কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর বিন্যাস থাকবে।
- শিখনফল অর্জনে বিষয়বস্তু থাকবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্য কোন সহায়ক সামগ্রির সহায়তা ছাড়াই শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এক কথায় বিষয়বস্তুতে বাড়তি বা ঘাটতি কিছু থাকবে না।
- বিষয়বস্তু হবে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ,প্রাসঙ্গিক ও সঠিক। বিশেষ তথ্যের ক্ষেত্রে রেফারেন্স বা উৎসের উল্লেখ থাকবে।
- বিষয়বস্তুগত ধারণাসমূহ হবে সঠিক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বিষয়বস্তুকে সহজে উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত ছবি, প্রচ্ছদ ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ থাকবে। উদাহরণগুলি হবে মজাদার এবং শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- কোন কিছুর ধারণা গঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন ধারণা পুরাতন ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।
- বিষয়বস্তুর গভীরতা ও বিস্তারের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।
- বিষয়বস্তুর কাঠিন্যমাত্রা শিক্ষার্থীর বয়স, চিন্তন ক্ষমতার সামর্থ ও কারিকুলামের প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যস্ত থাকবে।
- বিষয়বস্তু রচনার শুরুতে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বিবেচনায় রেখে সহজ থেকে ক্রমশ কঠিনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।
- বিষয়বস্তুর মৌলিক ধারণা ও দক্ষতাসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বিষয়বস্তুর উন্নয়ন ঘটবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স ও লিঙ্গভেদে বিষয়বস্তুত হবে পক্ষপাতমুক্ত।
- শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত বইয়ের তালিকা ও ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকবে।
- বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশে সহজে পৌঁছার জন্য বইয়ের শেষে ইনডেক্স সংযোজিত থাকবে।

শিখন কার্যক্রম

একটি ভাল মানের পাঠ্যবই শিক্ষার্থীকে নানাবিধ শিখন কাজে সম্পৃক্ত করে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে করে বৈচিত্র্যময় ও ফলপ্রসূ। পাঠ্যবইয়ে শিখন কার্যক্রম সংক্রান্ত নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

- শিখন শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞান বিষয়ের সাধারণ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকবে।
- বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রের সকল দক্ষতা স্তরের ভারসাম্যমূলক অন্তর্ভূক্তি থাকবে। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা(বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ,মূল্যায়নে) অর্জনের সুযোগ থাকবে।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উচ্চতর শিখন দক্ষতার সুযোগ ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে সংযোজিত থাকবে।
- সৃজনশীল চিন্তন, সমস্যা সমাধান ও অনুসন্ধানমূলক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থাকবে।
- শিখন প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ থাকবে।
- বিষয়বস্তুর এক একটি অংশ এমনভাবে বিন্যস্ত থাকবে যেন সেগুলো এককভাবে স্বতন্ত্র ধারণা প্রকাশে সক্ষম এবং সামগ্রিকভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।
- শিক্ষার্থীর জন্য শিখনকর্মকান্ড এমনভাবে সাজানো থাকবে যেন তারা নতুন জ্ঞান সংযোজন, অনুশীলন ও প্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে æCORE" বা অনুরুপ মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। CORE এর অর্থ হল: শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে সংযুক্ত করা (**C**onnect to student's prior knowledge); নতুন বিষয়বস্তু সংগঠিত করা (**O**rganize new content); অর্জিত শিখনের প্রতিফলন ঘটানো (**R**eflect to what has been learnd); নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত শিখনের প্রসার ঘটানো (**E**xtend by transferring knowledge to new contexts)। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্জনে অভ্যস্ত শিক্ষার্থীরা জীবনব্যাপী ও জীবনবিস্তৃত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাছাড়া পরিবেশের সহজপ্রাপ্য বিভিন্ন উপাদানকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।
- শিখনকর্মকান্ড হবে মজার যেন সেগুলো করতে শিক্ষার্থীরা সহজেই আগ্রহী হয়। আর কাজের নির্দেশনা থাকবে খুবই স্পষ্ট।
- অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীর জন্য অনুশীলন কাজ থাকবে এবং এগুলো বিষয়বস্তুর কাজের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

পাঠ্যবইয়ের সংগঠন ও কাঠামো

- বিষয়বস্তুর ক্রম হবে যথাযথ এবং যৌক্তিক। গুরুত্বপূর্ণ শব্দ এবং ধারণাসমূহ দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে।
- বইয়ের সূচীপত্রে ইউনিটের শিরোনাম, টাইটেল ও আউটলাইন স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
- প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ইউনিটের লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা থাকবে। ইউনিট শেষে সংক্ষিপ্ত সার থাকতে পারে।

পাঠ্যবইয়ের ভাষা

- টেক্সস্ট বা পাঠ্যাংশের লেখা হবে উচ্চমানের যেন শিক্ষার্থীরা সরাসরি ও স্বাধীনভাবে শিখতে পারে এবং নিজের মত অর্থ গঠন করতে সক্ষম হয়।
- ভাষা হবে সহজ ও সাবলীল এবং বানান থাকবে নির্ভুল ।
- বাক্য গঠনের কাঠিন্যমাত্রা শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- বৈজ্ঞানক শব্দের পরিভাষা ও বিশেষ ব্যাখ্যা থাকবে।

পাঠ্যবইয়ের সাজসজ্জা

- বইয়ের বাহ্যিক সাজসজ্জা পূর্বাপর একই রকম হবে এবং যৌক্তিকতা বজায় থাকবে।
- প্রতিটি অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ থেকে অনুচ্ছেদ, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব একই রকম হবে।
- পাঠ্যবইয়ে সংযোজিত চিত্র, ছবি, নকশা, গ্রাফ, প্রবাহচিত্র প্রভৃতি স্পষ্ট, সঙ্গতিপূর্ণ ও বোধগম্য হবে।
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর ছবি বা ডায়াগ্রামের বিভিন্ন অংশ সঠিকভাবে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত থাকবে।
- অধ্যায়ের শিরোনাম, উপ-শিরোনাম, টেক্সস্ট প্রভৃতিতে অক্ষরের ফন্ট সাইজ সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।
- বইয়ের কাগজ, ছাপার মান এবং ওজন শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী হবে।

উপরে আলোচনায় প্রাপ্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করে একজন জীববিজ্ঞান শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি বিশ্লেষণ এবং সার্বিক বিচারে পাঠ্যবইটি মূল্যায়ন করতে পারবেন।

১.৪ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে শ্রেণিশিক্ষকের ভূমিকা: মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান নির্ভর করে মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উপর। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করেন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, আর শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক পাঠ্যবই রচনা করেন লেখক। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইদল সদস্যসের দ্বারা দুটি যায়গায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজটি সম্পন্ন হয় একই শ্রেণিকক্ষে। আর সেটি করেন শ্রেণিশিক্ষক,পাঠ্যবইয়ের সহায়তায়। কাজেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের ভাল মন্দ, সুবিধা অসুবিধা এসব দিক সম্পর্কে জানাশুনা ও অভিজ্ঞতা অন্যদের চেয়ে একজন শ্রেণিশিক্ষকের অনেক বেশি থাকে। এ কারণে তিনি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে তার পরিসরও বেশি। এ পাঠে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষাক্রমের মানোন্নয়নে শ্রেণিশিক্ষকের ভূমিকা:

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রেণিশিক্ষক। তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কারণে তিনি যে কোন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সময় শিক্ষক শিক্ষাক্রমকে বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ পান। শিখন শেখানোর প্রতিটি কাজে শিক্ষক শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুসরণ করেন। তখন শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। শিক্ষাক্রমের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কর্তপক্ষ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে তাঁদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে পারেন। পরবর্তীতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সময় বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের মূল্যবান মতামত বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। এমনকি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন শিক্ষককে উন্নয়ন কমিটিতে যুক্ত করে শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন ঘটান। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষকের করণীয় নিম্নরুপ--

- **জীববিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতার যথার্থতা:**

  বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের মধ্যে মৌলিক ও সাধারণ উদ্দেশ্য থাকবে শুরুর দিকে। অতপর অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি পারস্পরিক যুক্ত থেকে বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্যগুলির মাঝে ধারণার বিচ্ছিন্নতা থাকলে শিক্ষার্থীরা পূর্ণাঙ্গ ধারণার পরিবর্তে খন্ডিত ধারণা পাবে। ফলে জীববিজ্ঞান পাঠের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে ফাঁক থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য সংযোজনের প্রয়োজন হলে সুপারিশ করতে পারেন। শিক্ষকগণ পাঠ্যবই ব্যবহারের সময় এ ধরনের দুর্বলতা সহজে চোখে পড়ে।

- **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটা:**

  এটা শিক্ষাক্রমের জন্য একটি বড় ধরনের ত্রুটি। কখনো কখনো আংশিক বা পূর্ণাঙ্গরুপে এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের পূনরাবৃত্তি হয়ে যেতে পারে। এর ফলে পাঠ্যপুস্তকেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটে, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য বিরক্তিকর বিষয়। শিক্ষকগণ পাঠ পরিকল্পনা তৈরির সময়ই তাদের কাছে এ সমস্যা ধরা পড়ে। পরবর্তীতে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের সময় তাঁরা এর উত্তরণ ঘটিয়ে শিক্ষাক্রমের মানোন্নয়ন করতে পারেন।

- **শিক্ষাক্রমের অধ্যায় বা ইউনিট বিন্যাসের ধারাবাহিকতা:**

  শিখনফলের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিকাশের মত অধ্যায়গুলির মধ্যেও একটি ক্রমিক ধারা থাকতে হয়। একে বলে অধ্যায়ের আনুভূমিক বিন্যাস। অধ্যায়গুলোর মধ্যে ধারণাগত সামঞ্জতা না থাকলে শিখন শেখানো খাপছাড়া হয়ে যায় ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাহত হয়। শ্রেণিশিক্ষকগণের বছরব্যাপি শিক্ষন অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে মূল্যবান সুপরিশ করতে পারেন।

- **আনুভূমিক ও উল্লম্ব বিন্যাসের ধারাবাহিকতা:**

  বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে **আনুভূমিক ও উল্লম্ব বিন্যাসের ধারাবাহিকতা** বা সামঞ্জস্য কতটুকু সে বিষয়ে শ্রেণিশিক্ষকগণ মতামত দিয়ে শিক্ষাক্রমের মানোন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন।

- **শিক্ষাক্রমে পাঠের পিরিয়ড বন্টনের যথার্থতা নিরুপণ:**

  শ্রেণিশিক্ষকগণ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য সময় বন্টন করে থাকেন। উদাহরণস্বরুপ, ৯ম-১০ম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের জন্য ১২টি পিরিয়ড রাখা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (TCG) অনুযায়ী পড়াতে গিয়ে বাস্তবে দেখা গেল আরও ২টি পিরিয়ডের প্রয়োজন। কিংবা এর উল্টো ঘটনাও ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মতামত শিক্ষাক্রম মানোন্নয়নে সহায়তা করে।

জীববিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নে শ্রেণিশিক্ষকের ভূমিকা: শিক্ষাক্রমের একটি প্রধান উপকরণ হল পাঠ্যবই । শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করে থাকেন। শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল পাঠ্যপুস্তক। শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুসরণ করে পাঠ্যবইয়ের সহায়তায় শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদন করেন। তাই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাঠ্যবই কতটুকু সহায়ক তার বিচার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ রাখার তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে গিয়ে বইটির সবলতা বা দুর্বলতা তাঁর চেখে পড়ে। বইটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব ও মতামত সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন। সুতরাং মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান বইয়ের কী কী দুর্বলতা রয়েছে সেটা শণাক্ত করে এর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জানাতে পারেন। তাছাড়া বইটির লেখকবৃন্দকে অবহিতকরণের মাধ্যমে মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন। সাধারণত শ্রেণিশিক্ষকের জীববিজ্ঞান বই সম্পর্কে নিচের বিষয়গুলিতে মতামত রাখার সুযোগ সবচেয়ে বেশি ।

- **বিষয়বস্তু** (Subject Content): পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর সার্বিক মান পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হতে হয়। শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত বুদ্ধিবৃত্তিয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ এই তিন ক্ষেত্রের শিখনফল আয়ত্ত্ব করার সুযোগ পাঠ্যপুস্তকে থাকা দরকার। এর কোন যায়গায় ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে শিক্ষক সুচিন্তিত মতামত দিয়ে মানোন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। এ বিষয়টি অধ্যায় থেকে অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ থেকে অনুচ্ছেদ দুই ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে হয়। বিষয়বস্তু বর্ণনায় ধারাবাহিকতা না থাকলে শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা গঠন বাধাগ্রস্থ হয়। এ বিষয়টি শিখনের গঠনবাদ তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়ে পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়ন করতে পারেন।
- **তথ্য ও তত্ত্বের সঠিকতা** (Accuracy of information and theory): পাঠ্যবইয়ে জীববিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব থাকবে নির্ভুল এবং হালনাগাদ। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান বিষয়ে প্রতি বছর অনেক গবেষণা হচ্ছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় জীব বিজ্ঞানের মৌলিক ও ফলিত শাখায় গবেষণার হার বেশি। তাই তথ্যের বর্ণনা ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা হবে যথাযথ। জীববিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের সর্বত্র এক ও অভিন্ন তথ্য থাকবে। কোথাও ভুল ও সেকেলে তথ্য ও তত্ত্ব থাকলে তা সংশোধনে পরামর্শ দিতে পরেন।
- **ভাষার সহজবোধ্যতা ও বানান** (Plain language and spelling): পাঠ্যবই যথাসম্ভব সহজ ও বোধগম্য ভাষায় লেখা থাকে। শিক্ষাথীর বয়স বিবেচনা করে চেনা জানা শব্দ ও সহজ সরল বাক্যের প্রয়োগ থাকা বাঞ্চনীয়। জীববিজ্ঞান বইয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহজ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা থাকা উচিত। জীববিজ্ঞান পাঠ্যবইটি হবে স্বব্যাখ্যাত। অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজে নিজে পড়েই অধিকাংশ জিনিস বুঝে ফেলবে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে শিক্ষক তা কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন। পাঠ্যবইয়ে কখনো কখনো ভুল বানান ও বানানের অসঙ্গতি থাকতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়ে পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়ন করতে পারেন
- **ধারণার পূনরাবৃত্তি** (Repeatation of concept): পাঠ্যবইয়ে কখনো কখনো একই ধারণা একাধিক অধ্যায়ে চলে আসতে পারে। পাঠ্যবইয়ের এটা বড় ধরনের একটি সমস্যা। এর জন্য একজন দায়িত্বশীল শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ জরুরী। তিনিই এই সমস্যার উত্তরণ ঘটিয়ে পাঠ্যবইয়ের কাঙ্খিত মান বজায় রাখতে পারেন।
- **পরিষ্কার চিত্র ও নক্সা** (Clear Image and diagram): জীববিজ্ঞান বইয়ে জীবের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংগঠন ভালভাবে বুঝার জন্য বর্ণনার পাশাপাশি ছবি ও চিত্র সংযোজন আবশ্যক। ছবি ও চিত্র অস্পষ্ট হলে কিংবা বিভিন্ন অংশ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হলে এগুলো শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল্যবান মতামত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।
- **শিখন কর্মকান্ড** (Learning activity): একটি ভাল পাঠ্যবইয়ের লক্ষ্য থাকবে বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদানের সাথে সাথে ধারণা আয়ত্ত্ব করতে শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন শিখন কর্মকান্ড। এধরনের বইকে বলা হয় মিথস্ক্রিয়ামূলক(interactive) বই। জীববিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের শিখনফল ও বিষয়বস্তুর পরিসর বিবেচনা করলেই শিখন কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সঠিক শিখন কর্মকান্ড নির্বাচন করে পাঠ্য বইয়ের গুণগত মান্নোয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন।
- **পাঠ্যবইয়ের সার্বিক সংগঠন:** পাঠ্যবইটি আরামদায়কভাবে ব্যবহারের জন্য এর প্রচ্ছদ, সূচীপত্র, কাগজ, ছাপা, গ্লোসারী, প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মতামত দিতে পারেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা কী?

২। পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১ ।জীববিজ্ঞান শিক্ষন কী? মাধ্যমিক স্তরে জীববিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর ক্রমান্বতি ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। জীববিজ্ঞান বইয়ের মানোন্নয়নে শ্রেণিশিক্ষক কীভাবে অবদান রাখতে পারেন ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব লাবনী একজন জীববিজ্ঞান **শিক্ষক। তিনি শিক্ষাক্রম সংগ্রহ করে** ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে প্রান্তিক শিখনফল সনাক্ত করেন। **শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং শিক্ষার্থীরা তা উপভোগ করে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন করেন। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নে স্কুলের পরীক্ষা গ্রহন করেন, এতে পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ফলাফল ভাল করে।**

ক। শিক্ষাক্রম কী?

খ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে পার্থক্য করুন।

গ ।উদ্দীপকের আলোকে শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব লিখুন।

ঘ। জীববিজ্ঞান শিখনফল অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

References:

1. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
2. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিজ্ঞান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি:
3. নবম-দশম শ্রেণির জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক ২০১৩, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।
4. http://www.edb.gov.hk/eb/curriculum-development/resource-support/textbook-info/GuidingPrinciples.
5. www.iiste.org: Journal of Education and practice-Vol.7, No.9, 2016

ইউনিট ২ : জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনা

পরিকল্পনা হচ্ছে কোন কাজের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ। পরিকল্পনাকে কর্মপরিকল্পনায় রূপ দিয়ে যে কোন কাজের লক্ষ্য অর্জন হয়। কোন কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য দরকার একটি কার্যকরী পরিকল্পনা। পরিকল্পনাকে তুলনা করা হয় দক্ষ মাঝির সংগে। কারণ একজন দক্ষ মাঝি প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যেও তার নৌকাকে নিরাপদে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাতে পারে তেমনি একটি সঠিক পরিকল্পনা কাজের সাফল্য নির্ধারণ করে। পরিকল্পনাহীন কাজ হাল ছাড়া নৌকার মত গন্তব্যহীন। নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট শ্রেণিতে,নির্দিষ্ট বিষয়ে শিখন- শেখানো কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শিক্ষক কাজ করেন। শিক্ষকের একটি পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকের সঠিক শিখন-শেখানো কার্যাবলী নিশ্চিত করে। পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক, নির্ভুল ও সযত্নে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনাই পারে শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনকে নিশ্চিত করতে।

এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

২.১ পাঠ পরিকল্পনা ও জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

২.২ জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ, পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

২.৩ জীববিজ্ঞান শিখনে দক্ষতা অর্জনের উপায়

২.১ পাঠ পরিকল্পনা ও জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো পাঠ পরিকল্পনা। A lesson plan is a framework and a roadmap which each teacher will create using an individual style. জীববিজ্ঞান পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে শ্রেণি কক্ষে জীববিজ্ঞান পাঠের বিষয়বস্তু প্রয়োগের কার্যকর পরিকল্পনা। শিক্ষককে জীববিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করার পূর্বে জানতে হবে- কি শেখাবেন? (What to teach?) তিনি কাকে শেখাবেন? (Whom to teach?) কেন শেখাবেন? (Why to teach?) কিভাবে শেখাবেন? (How to teach?) কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? (How to evaluate?) ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে জীববিজ্ঞান শিখনের কাংখিত লক্ষে পৌঁছার একমাত্র নিয়ামক যথাযথ জীববিজ্ঞান পাঠপরিকল্পনা প্রনয়ন।

আদর্শ জীব বিজ্ঞান পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য-

- বিষয় বস্তু নির্বাচন করা।
- উদ্দেশ্য নির্ধারণ।
- পাঠের বিষয় বস্তুকে বিভিন্ন পর্বে বিন্যাস।
- কোন অংশের জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।
- চিত্রাংকনের কৌশল নির্ধারণ করা
- উপকরণ সংগ্রহ করা।
- উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করা।
- শিক্ষার্থীদের জানা বিষয় থেকে পাঠ শুরু করে পরে অজানা বিষয়ে অবতারণা করতে হবে।
- যে সব বিষয় শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে সেগুলো প্রথমে উপস্থাপন করে পরে কঠিন বিষয়ের দিকে যেতে হবে।
- একটি বিষয় সম্পূর্ণ না বুঝিয়ে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বুঝালে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সহজে বুঝতে সক্ষম হয়।

জীববিজ্ঞান পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

১। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য জানা যায়।
২। জীববিজ্ঞান পাঠের বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।
৩। জীববিজ্ঞানের শিক্ষণ শিখনের উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা যায়।
৪। সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে পাঠ উপস্থাপন করা যায়।
৫। সময় অপচয় রোধ করা যায়।
৬। জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায়।
৭। মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।
৮। জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব যাচাই করা যায়।

৯। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহন যায়।
১০। অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা যায়।
১১। জীববিজ্ঞান শিক্ষণ শিখনের পক্রিয়া আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হয়।
১২। যথা সময়ে সিলেবাস শেষ করার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।

২.২ জীববিজ্ঞান শিক্ষণে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

শিক্ষা একটি ত্রিমূখী প্রক্রিয়া। এখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী,ও অভিভাবকের সমন্বয়ে আবর্তিত হয় শিখন কার্যক্রম। একটি শ্রেণিকক্ষ সজীব উপাদান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। সকল শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর ফলপ্রসু শিখনের জন্য শিক্ষক পাঠপরিকল্পনা প্রনয়ন করা থাকেন। তাই পাঠপরিকল্পনা প্রনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয়-

১। জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, বয়স, সামর্থ্য ও চাহিদা।

২। সময় বিবেচনা।

৩। পাঠের উদ্দেশ্য সমূহ।

৪। বিষয় বস্তু নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।

৫। পাঠের পরিবেশ সৃষ্টির উপায় উল্লেখ ও পাঠ ঘোষণার কৌশল নির্ধারণ।

৬। শিখন শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ নির্ধারণ ।

৭। উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন।

৮। পাঠ মূল্যায়নের জন্য যথাযথ প্রশ্ন প্রণয়ন যার মাধ্যমে শিখন ফল যাচাই করা যায়।

৯। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করণ ও পুনরালোচনা।

১০। বাড়ির কাজ প্রদান।

পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নের পথিকৃত শিক্ষাবিদ জন ফ্রেডারিক হার্বাট (J.F Herbart)। তিনি ১৭৭৬ সালে জার্মানির ওল্ডেনবার্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা মানসিক ভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন বিষয়বস্তুর সঠিক নির্বাচন ও সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন। শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কিছু না কিছু মৌলিক ঐক্য ও যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রগুলো চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেয়া অনুবদ্ধ তত্ত্ব। এটি অত্যন্ত কার্যকরী মতবাদ। এজন্যই তিন শতাব্দী ধরে এ মতবাদ বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। তিনি শিক্ষার্থীর শিক্ষার উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করে (সাধারণ উদ্দেশ্য ও আচরনিক উদ্দেশ্য) পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নের কথা বলেন। তাঁর অনুগামী হলেন শিক্ষাবিদ জাড, মরিসন, ব্রুনার প্রমূখ। শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক হার্বাট শিক্ষার্থীর শিখনের চারটি ধাপ উল্লেখ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নের চতুর্সোপান প্রস্তাব করেন।

পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নের চতুর্সোপান

১) প্রথম স্তর : পূর্বজ্ঞানের সুস্পষ্টতা(Clarity) এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নতুন জ্ঞান দেয়া হবে। তাই শিক্ষকের উচিৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি স্তর জানা।

২)দ্বিতীয় স্তর : নতুন তথ্যের সংযোজন(Association) এ স্তরে শিক্ষার্থীকে নতুন জ্ঞান বা তথ্য দেয়া হবে এবং নতুন তথ্যের সাথে পূর্ব জ্ঞানের সংযোজন করতে হবে।

৩)তৃতীয় স্তর : শ্রেণিকরণ বা সামান্যীকরণ (Systematisation and generalization) এ ক্ষেত্রে শিক্ষক দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান ও তথ্যগুলো সুসংহত ,সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করবেন এবং পূর্বজ্ঞানের তথ্যের সাথে শ্রেণিকরণ করে সামান্যীকরণে পৌঁছাবেন।

৪)চতূর্থ স্তর : প্রয়োগ(Application) এটি শিখনের শেষ স্তর।এ স্তরে শিক্ষার্থীর নব লব্দ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে।

পঞ্চসোপান : হার্বাটের চতুর্সোপান অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়নে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়ায় শিক্ষাবিদ জিলার ও শিক্ষাবিদ রেন প্রমূখ তাঁর অনুসারীগন হার্বাটের চারটি সোপানের কিছুটা পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর শিখনের পাঁচটি সোপানের কথা প্রস্তাব করেন। এ সোপানগুলো হলো--

১) প্রস্তুতি(Preparation) ২) উপস্থাপন(Presentation) ৩) অনুসংগ স্থাপন বা তুলনাকরণ ((Association /Comparision) ৪) সামান্যীকরণ(generalization) ৫) প্রয়োগ(Application)

ত্রিসোপান-- পরবর্তীকালে শিক্ষাবিদ জিলার ও শিক্ষাবিদ রেন এ পঞ্চসোপান নীতির আরও একবার সংস্কার করেন। নতুন সংস্করণে তিনটি সোপান রাখা হয়। তা হলো-

১) প্রস্তুতি (Preparation) : এ সোপানের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে নতুন পাঠের উপযোগী করে তোলা। সামাজিক -গাঠনিক মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিবার বা সমাজ থেকে কিছু জ্ঞান নিয়ে আসে। সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখাতে হবে। শিখনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষার্থীদের কোন ছবি, ভিডিও, গান, কৌতুক, মডেল দেখানো অথবা কোন বাস্তব ঘটনা বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা সমাধানও দেয়া যায়। এগুলো থেকে শিক্ষার্থীর মুখ থেকে পাঠ শিরোনাম বের করে বোর্ডে পাঠ শিরোনাম লিখতে হবে।

২) উপস্থাপন (Presentation) : শিরোনাম লেখার পর শুরু হবে পাঠ উপস্থাপন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় বাস্তব উপকরণ, ডিজিটাল কন্টেন্টের সাহায্যে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, পরীক্ষণ ও অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিবেন। শিখন- শেখানো কার্যক্রমের সফলতার জন্য ও হাতে-কলমে শিখনের জন্য একক কাজ, জোড়াঁয় কাজ, দলগত কাজ ইত্যাদি দিতে হবে। শিক্ষক শ্রেণি শৃংখলার দিকে নজর দিবেন। দলগত কাজ মেন্টরিং করবেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করবেন। উপস্থাপন হবে সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, অংশ থেকে সমগ্র, সাবলীল ও আকর্ষনীয় এবং শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী।

৩) প্রয়োগ (Application) : এ সোপানে নব লব্দ জ্ঞানকে বিভিন্ন পরিস্থতিতে প্রয়োগ করতে পারে কিনা তা যাচাই করা হয়। যাচাই এর জন্য প্রশ্ন করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক সুত্র বা তত্ত্বকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমান করলে পর্যবেক্ষন করা যেতে পারে। লিখিত অভীক্ষাও ব্যবহার করা যায়। এ স্তরে বাড়ির কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শীতা দেখা হয়।

আমাদের দেশে ত্রিসোপান অবলম্বন করে পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। তবে সামাজিক গঠনবাদের আলোকে শিখন শেখানোকে কার্যকর করার জন্য ধারণা পরিবর্তন মডেল, ব্রেইনস্টর্মিং, ধারণা মানচিত্র, পিওই, ৫ই মডেল, মাইন্ডম্যাপিং ইত্যাদি কলা-কৌশলগূলো পাঠ পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে।

৫ই মডেল এর মাধ্যমে পাঠ-পরিকল্পনা: ৫ই মডেল এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য যেমন তাদের নিবিড়ভাবে জড়িত রাখে ঠিক তেমনি তারা শিখনকে নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করারও সুযোগ পায়। এই মডেলটি ধারণা পরিবর্তন মডেলের অনুরূপ। এই মডেল পাঁচটি ভিন্ন কিন্তু সম্পর্কযুক্ত ধাপে সজ্জিত। নিম্নে এ ধাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হল:

Engage বা নিবিড়ভাবে জড়িত করা : শুরুতেই শিক্ষক ঐ পাঠের টপিক বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ট কোন ঘটনা উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আহবান করে তাদেরকে বিষয়ের প্রতি আগ্রহী ও কৌতুহলী করে তোলা হয়। শিক্ষক পাঠের বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করেন, শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন টার্গেট ও মূল্যায়ন নীতিমালা নির্ধারণ করেন। যেমন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঠ পরিচালনার প্রথমে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাদের বিদ্যমান ধারণা জানার মাধ্যমে তাদেরকে শিখনে জড়িত করা যেতে পারে।

Explore বা অনুসন্ধান : এই ধাপে শিক্ষার্থী একটি সমস্যা বা ধারণা সম্পর্কে হাতে কলমে কাজ করে বা তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি অনুসন্ধান করে। শিক্ষক এই ধাপে শিক্ষার্থীদের কোন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ দেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনায় অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন নির্ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। যেমন সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বোঝা যায় এরকম একটি কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটি টবের উদ্ভিদকে একদিনের জন্য অন্ধকারে রাখলে কী ঘটে তা দেখা যেতে পারে।

Explain বা ব্যাখ্যা প্রদান : এই ধাপে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুসন্ধানে সময় লব্ধ পর্যবেক্ষণ এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং শিক্ষকও শিক্ষার্থীর নতুন ধারণা গঠনে সহায়তা প্রদান করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা গঠন করে।

Elaborate বা পরিবর্ধন : এ ধাপে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা নতুন অর্জিত ধারণাকে পাকাপোক্ত করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ধারণাকে এ ধাপে শিক্ষার্থীরা অন্য ঘটনা - যেমন অন্ধকারে সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে ও পরিবর্ধন করে।

Evaluate বা মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধাপে শিক্ষক তা মূল্যায়ন করে থাকেন। শিক্ষক এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সবগুলো ধাপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে বোঝার চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্ম-মূল্যায়নে সহায়তা করেন এবং ফিডব্যাক দেন।

একটি পাঠ পরিকল্পনা ছক

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম : প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম: রোল নং- শ্রেণি : উপস্থিত শিক্ষার্থী : মোট - জন।	বিষয় : সাধারণ পাঠ : আজকের পাঠ : সময় : তারিখ :

শিখনফল: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	পদ্ধতি	উপকরণ ও সতর্কতা
প্রস্তুতি	৫মিনিট	শুভেচ্ছা বিনিময় ও বাড়ির কাজ আদায়	শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা কাজে অংশগ্রহন করবে।	শিক্ষক সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।	শিক্ষক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করবেন।
উপস্থাপন (শিখন-শেখানো কার্যাবলি)	৩৫মিনিট	চার্ট,মডেল, বাস্তব উপকরণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট দিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দলগত কাজ / জোড়ায় কাজ প্রদান।	শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা কাজে অংশগ্রহন করবে।	শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।	শিক্ষক বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করবেন।
মূল্যায়ন	১০মিনিট	শিখন যাচাইমূলক প্রশ্ন ও বাড়ির কাজ প্রদান	শিক্ষার্থীরা উত্তর দিবে		

নিম্নে কিছু নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেয়া হল-

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-১	
শিক্ষকের নাম--	বিষয়ের নাম-জীববিজ্ঞান
বিদ্যালয়ের নাম	অধ্যায়ের নাম- জীবনীশক্তি
শিক্ষার্থী সংখ্যা-	পাঠের বিষয়- সালোকসংশ্লেষণ
সময়-৫০ মিনিট	তাং - ২০/১০/২০১৭ইং

শিখনফল : এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ---

- সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম বলতে পারবে
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক পর্যায় বিশ্লেষণ করতে পারবে

উপকরণ : যে কোন সম্পূর্ণ উদ্ভিদ, সালোকসংশ্লেষণ এর উপর একটি ডিজিটাল কন্টেন্ট।

শিখন পদ্ধতি : জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ , প্রদর্শন ও আলোচনা পদ্ধতি।

মূল শিক্ষণীয় বিষয় : সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হলো -১।আলো ২।ক্লোরোফিল ৩।পানি ও ৪।কার্বন ডাই অক্সাইড। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দুইটি পর্যায় -- আলোক পর্যায় ও আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ADP সৌরশক্তি গ্রহণ করে ATP তে রুপান্তরিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশণ প্রক্রিয়া বলে। সূর্যালোক ও ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি বিযোজিত হয়ে অক্সিজেন , হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন উৎপন্ন হওয়াকে বলে ফটোলাইসিস।

শিখন-শেখানো কলা কৌশল

ধাপ	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	সতর্কতা
প্রস্তুতি	৫মিনিট	সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করব-১।এটা কী? ২। উদ্ভিদ কিভাবে বেঁচে থাকে? ৩। এ প্রক্রিয়াকে কী বলে? এ পর্যায়ে বোর্ডে পাঠ শিরোনাম-"সালোকসংশ্লেষণ" লিখব।	শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদ পর্যবেক্ষণ করবে ও প্রশ্নের উত্তর দিবে। পাঠ শিরোনাম খাতায় তুলবে।	
উপস্থাপন	৩৫ মিনিট	এবারে ডিজিটাল কন্টেন্ট উপস্থাপন করে প্রথমে সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম বলব ও বোর্ড লিখব। এ পর্যায়ে জোড়ায় কাজ দিব। প্রশ্ন---সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর নাম লিখ। তারপর একে একে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা প্রস্তুতি ব্যাখ্যা করব ও সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক পর্যায় বিশ্লেষণ করব। এ পর্যায়ে দলীয় কাজ দিব। প্রশ্ন--- লেখ চিত্রের সাহায্যে ATP ও NADPH2 তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।	শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। খাতায় নোট নিবে। বোর্ডে আসবে। দলীয় কাজে ও জোড়ায় কাজে অংশগ্রহণ করবে।	উদ্ভিদের কোন অংশ শ্রেণি কক্ষে পড়ে থাকে বনা
মূল্যায়ন	১০ মিনিট	নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব---- • সালোকসংশ্লেষণের পর্যায় কয়টি? • ফটোলাইসিস কী? • ফটোফসফোরাইলেশণ প্রক্রিয়ায় কী ঘটে? বাড়ির কাজ--- জীবজগতের সবচেয়ে গুরুত্ব জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ --ব্যাখ্যা কর।	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিবে। বাড়ির কাজ খাতায় তুলে নিবে	বোর্ড মুছে যেতে হবে

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-২

শ্রেণি : ৯ম-১০ম **বিষয় :** জীববিজ্ঞান **অধ্যায় :** খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক **সময় :** ৫০ মিনিট

শিখনফল : বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) এর হিসাব করতে পারব।

অনুসন্ধানমূলক সমস্যা : বিএমআই নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা।

শিখন শেখানো কার্যক্রম

১.পূর্বজ্ঞান যাচাই/প্রস্তুতকরণ: প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে চাইব

- বিএমআই কী?
- বিএমআই বিভিন্ন হয় কেন?
- বিএমআই নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২.পরিকল্পনা প্রনয়ন: পরিকল্পনা: বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) নির্ণয় করা হবে। শিক্ষার্থীরা কাজটি কীভাবে করবে তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনা চুড়ান্ত করব।

- এ পরীক্ষরণের জন্য কী কী উপকরণ দরকার?

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ওয়েট মেশিন, পরিমাপ ফিতা/স্কেল, সাদা কাগজ, সাইন পেন।

সতর্কতা -দেহের ওজন ও উচ্চতা সঠিক ভাবে পরিমাপ করতে হবে।

৩.পরিকল্পনা বাস্তবায়ন/তথ্য সংগ্রহ

- প্রতিটি দলের সদস্যগন ওয়েট মেশিনে সকলের ওজন পরিমাপ করব।
- এরপর পরিমাপ ফিতা/স্কেল দিয়ে সকলের উচ্চতা পরিমাপ করব।
- প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত মান সাদা কাগজে লিখব।
- এবার নিচের বিএমআই সূত্র অনুসারে সকলের বিএমআই নির্ণয় করব।

ছক-১

বিএমআই নির্ণয়: বিএমআই= দেহের ওজন(কেজি)/দেহের উচ্চতা(মিটার)^২	
দল-১	**বিএমআই**
শিক্ষার্থী	
শিক্ষাথী	

মান নির্দেশিকা

মান	মন্তব্য
১৮.৫ এর নিচে	শরীরের ওজন কম, পরিমিত খাদ্য গ্রহণে ওজন বাড়াতে হবে
১৮.৫-২৪.৯	সুস্বাস্থের আদর্শ মান
২৫-২৯.৯	শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ব্যায়াম কওে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন
৩০-৩৪.৯	মোটা হওয়ার প্রথম স্তর, বেছে খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন
৩৫-৩৯.৯	মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন
৪০ এর উপরে	অতিরিক্ত মোটা, মৃত্যু ঝুঁকির সমূহ সম্ভবনা, ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন

৪.তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

উপরের ছক অনুসারে ফলাফল বিশ্লেষণ করব।

- লম্বা ও খাঁট এর জন্য বিএমআই পার্থক্য হয়েছে কী ?
- বিএমআই এর আদর্শ মান কত?
- কেন বিএমআই নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ ?

৫.সিদ্ধান্ত গ্রহণ: বিএমআই নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে ।

৬.মূল্যায়ন: নিচের মানদন্ডগুলোর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করব

- **প্রক্রিয়া অনুসরণের সঠিকতা**
- **সঠিক পরিমাপ করতে পারা**
- **সুস্বাস্থ্যের জন্য উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কত হওয়া উচিত ব্যাখ্যা করতে পারা**

পাঠ পরিকল্পনা-৩

শ্রেণি : ৯ম-১০ম **বিষয় :** জীববিজ্ঞান **অধ্যায় :** জীবে পরিবহন **সময় :** ৫০ মিনিট

শিখনফল : উদ্ভিদ ও পানির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব

শিখনফলের বিভাজন: উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি পরিবহন ব্যাখ্যা করতে পারব।

অনুসন্ধানমূলক সমস্যা : উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ

শিখন শেখানো কার্যক্রম

১.পূর্বজ্ঞান যাচাই/প্রস্তুতকরণ : প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে

- অভিস্রবণ সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাই করব।
- অভিস্রবণ ঘটার জন্য কী আবশ্যক তা জানতে চাইব।
- বেশি ঘনমাত্রা ও কম ঘনমাত্রা বিষয়টি বোঝে কিনা তা জানব।
- উদ্ভিদকোষে অর্ধভেদ্য পর্দা বা ঝিল্লী আছে কিনা বা কোথায আছে তা জানতে চাইব।

২.পরিকল্পনা প্রনয়ণ

- **পরিকল্পনা:** অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কম ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে দ্রাবক অর্ধভেদ্য পর্দার ভেদ করে বেশি ঘনমাত্রার দ্রবণে যাবে। উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ ঘটে কিনা এটা তোমরা কীভাবে দেখবে? শিক্ষার্থীরা কাজটি কীভাবে করবে তার পরিকল্পনা ও সপক্ষে যুক্তি শুনে পরিকল্পনা চুড়ান্ত করব।
- পরিকল্পনাটি এরকম হতে পারে - ঘন দ্রবণ, উদ্ভিদ অংশ ও পানি ব্যবহার করে কম ঘনমাত্রার দ্রবণ থেকে বেশি ঘনমাত্রার দ্রবণের দিকে দ্রাবক (পানি) পরিবাহিত হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিস্রবণের ধারণাটি বোঝা যেতে পারে।
- এ পরীক্ষণের জন্য কী কী উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নিব।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ : বড় আকারের আলু, বিকার, চিনি, পানি, ছুরি

সতর্কতা

- ছুরি দিয়ে আলু কাটার সময় সাবধানে কাটতে হবে যেন হাত না কাটে এবং আলু ছিদ্র হয়ে না যায়।
- আলুর গর্তে পানি/চিনির ঘন দ্রবণ রাখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন আলুর গর্ত সম্পূর্ণ ভরে না যায়।

৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন/তথ্য সংগ্রহ

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের তিনটি দলে বিভক্ত করব এবং কোন দল কোন কাজ করবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিব।
- প্রতিটি দল একটি করে আলু নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে চারকোণ আকৃতির করবে।
- প্রতিটি চারকোণাকৃতির আলুখণ্ডের ভিতর চারকোণাকৃতির একটি গর্ত করবে।
- প্রথম দল একটি গর্তযুক্ত চারকোণাকৃতির আলুকে একটি বিকারে রাখবে। আলুর গর্তে পানি এমনভাবে রাখতে হবে যেন গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে না যায়। বিকারে পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে আলুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ডুবে থাকে।
- দ্বিতীয় দল বিকারে চিনির ঘন দ্রবণ নিবে। তারপর একটি আলুখণ্ডের গর্তে পূর্বের মতো পানি নিয়ে আলুখণ্ডটি বিকারে রাখবে যেন চিনির দ্রবণ আলুখণ্ডের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে।
- তৃতীয় দল বিকারে পানি নিবে। তারপর একটি আলুখণ্ডের গর্তে চিনির ঘন দ্রবণ নিয়ে আলুখণ্ডটি বিকারে রাখবে যেন পানি আলুখণ্ডের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে।

শিক্ষার্থী কর্তৃক পর্যবেক্ষণ :

- প্রতিটি দল প্রতিটি আলুখণ্ডের গর্তের ভিতর পানি ও দ্রবণের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করবে।
  শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল লক্ষ করবে কোন বিকারে রক্ষিত আলুর গর্তে পানি/ দ্রবণের উচ্চতার কিরূপ পরিবর্তন হবে? কেন এই পরিবর্তন হবে?
- ২০ মিনিট পর পুনরায় শিক্ষার্থীরা বিকারে রক্ষিত আলুর গর্তে পানি/দ্রবণের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিচের ছক পূরণ করবে।

প্রাপ্ত তথ্য/ ফলাফল

দল	পর্যবেক্ষণ		
	পরীক্ষণের পূর্বের অবস্থা	পরীক্ষণের পরের অবস্থা	পরিবর্তন
দল-১			
দল-২			
দল-৩			

৫. **তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করব- তোমাদের অনুমানের সাথে পর্যবেক্ষণ মিলেছে কী? তিনটি আলুখণ্ডে পানি/দ্রবণের উচ্চতার পরিবর্তন তিন ধরনের কেন?
কোনো আলুখণ্ডে অভিস্রবণ ঘটেছে কি? কোন আলুখণ্ডে? তাহলে পর্যবেক্ষণ থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌছা যায়?

৬. **সিদ্ধান্ত :** উদ্ভিদকোষে অভিস্রবণ সংঘটিত হয়।

৭. **মূল্যায়ন :** নিচের মানদন্ডগুলোর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করব

- পরিকল্পনা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা।
- উপকরণের যথাযথ ব্যবহার
- তথ্য বিশ্লেষণের সামর্থ্য/সঠিকতা
- আলুখণ্ডের ভিতরে পানির উচ্চতা পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা
- অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কী কাজ করে তা ব্যাখ্যা করা

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা-৪

বিষয়: জীববিজ্ঞান

শ্রেণি : নবম — পাঠ : পরাগায়ন
অধ্যায় : **একদশ জীবের প্রজনন** — সময় : ৫০ মিনিট

শিখনফল	**শিখন-শেখানো কার্যাবলি**	**শিখন অর্জন যাচাই**	**শিক্ষোপকরণ**
সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্রের সাহায্যে উদ্ভিদের যৌন প্রজনন ব্যাখ্যা করতে পারবে। শিখনফলের বিভাজন- ১) পরাগায়ন কী তা বলতে পারবে ২) পরাগায়নের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	একটি পূর্ণাঙ্গ মরিচ গাছ দেখিয়ে প্রশ্ন: ১। ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? ২। ফুল থেকে কীভাবে মরিচ হলো? ৪মি: উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ ঘোষণা । ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পরাগায়ন উপস্থাপন করব। জোড়ায় কাজ : পরাগায়নের প্রকারভেদ লিখ? ১০মি:	শিক্ষার্থীর উত্তর প্রদান। জোড়ায় কাজে অংশগ্রহন ও উত্তর প্রদান।	মরিচ গাছ পরাগায়নের একটি ডিজিটাল কন্টেন্ট।
৩)পরাগায়নের মাধ্যমগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবে।	ভিডিও এর মাধ্যমে পরাগায়নের মাধ্যমগুলো বিশ্লেষণ ও দলগত কাজ প্রদান । ১০মি: **দলগত কাজ:** পানি পরাগায়ন ও বায়ু পরাগায়নের মধ্যে তুলনা কর। ১৬মি: **বাড়ির কাজ:** উদ্ভিদের ফল পেতে পরাগায়নের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ২মি:	শিক্ষার্থীরা দলগত কাজে অংশগ্রহন করবে ও উপস্থাপন করবে। **চিন্তনমূলক প্রশ্ন:** পরাগায়ন সপুষ্পক উদ্ভিদের জীবন চক্রে যৌন প্রজনন সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ বিষয়টির পক্ষে যুক্তি দাও	পরাগায়নের বিভিন্ন মাধ্যমের ভিডিও
পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়: ছবি ও ভিডিও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।		**শিক্ষকের আত্মপ্রতিফলন:**	

২.৩ জীববিজ্ঞান শিখনে দক্ষতা অর্জনের উপায়

একটা কাজ সঠিক ভাবে সুচারুরুপে অপচয়বিহীন সম্পাদন করতে পারাই হলো দক্ষতা। স্বল্পতম সময়ে স্বল্পতম সম্পদ ব্যয়ে সর্বোচ্চ মানের কাজ সম্পাদনের সামর্থ্যকে দক্ষতা বলে। দক্ষতা = যোগ্যতা + সামর্থ্য + সক্ষমতা। আর অভিজ্ঞতা বলতে বুঝায় একটা কাজ বার বার করার ফলে ঐ কাজে অভিজ্ঞ হয়ে পড়া। সঠিক দক্ষতা শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক আচরণে সমর্থ করে, নিজের ও অপরের সকল রকম অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে। নিজের, পরিবারের ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার মতো আত্মবিশাসী, দায়িত্বশীল, সৃজনশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের জন দক্ষতা, জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল দেশের শিক্ষা ও দক্ষতা উচ্চ মানের, সে সকল দেশ বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনেক বেশি কার্যকর। একটি সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিবে। দক্ষতা প্রশিক্ষণের সকল উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নের জন্য দক্ষতাসমুহ

- দলীয় অলোচনায় নিজের মতামত দিয়ে অংশগ্রহণ
- শ্রেণির কাজে নিজ অংশগ্রহন এবং অন্যকে অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা
- অন্যের ধারণা বা মতামতকে শ্রদ্ধা করা, অন্যের ধারণার বিরোধিতা করা কিন্তু ব্যক্তির বিরোধিতা না করা
- নতুন তথ্যের আলোকে নিজ ধারণার সংশোধন করার মানসিকতা রাখা।

জীববিজ্ঞান শিক্ষকের শিক্ষন উন্নয়নের জন্য দক্ষতাসমূহ

১। সুনির্দেশনা
২। সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি
৩। পাঠে গতিশীলতা দান
৪। পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ
৫। শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি
৬। হাতে কলমে শিক্ষাদান
৭। ফলপ্রসূ শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োগ
৮। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব
৯। উন্নত বাচন ভঙ্গি প্রয়োগ
১০। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা
১১। নাটকীয় ভঙ্গিমার প্রয়োগ
১২। বিষয়গত জ্ঞানের গভীরতা অর্জন
১৩। শ্রেণিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ
১৪। শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ কৌশল
১৫। উন্নত মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ
১৬। একীভূত শ্রেণিব্যবস্থাপনা

জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে শিক্ষক

কোনো কাজের অর্পিত দায়িত্ব পালনের সময় মেধা, শ্রম ও সময়কে সদ্ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের মৌলিক ক্ষমতাকে দক্ষতা বা Skill বলে। যে কোনো মানুষের জীবনে সাফল্য আনতে হলে পেশাগত জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়নের প্রয়োজন পড়ে। পেশাগত দক্ষতা অর্জন ব্যতীত প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা যায় না। এ কথাটি অন্যান্য পেশার ন্যায় শিক্ষাকতা পেশায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। কেন না শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। যে পেশার উন্নয়নে জ্ঞানদক্ষতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। একজন শিক্ষককে তাঁর পেশার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিনিয়ত নব নব জ্ঞান ও কৌশলের সন্ধান করতে হয়। পাঠদানকে শতভাগ সফল করতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার সন্ধানে নিরলস প্রচেষ্টায় নিজেকে নিরত রাখতে হয়। শিক্ষকের পেশাগত মূল্যবোধ, আত্ম - প্রত্যয় ও বোধগম্যতার সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রেণি-পাঠদান সার্থক করতে হয়। আর এসব পদ্ধতি ও কৌশলকে আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষকের জ্ঞানদক্ষতার উন্নয়ন করতে হয় শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে তা হচ্ছে self-evaluation বা আত্মমূল্যায়ন। কেন না শিক্ষকের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য সহজতর ও অতীব কার্যকরী উপায় এটি। শিক্ষক এর দ্বারা যোগ্যতা অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপে সচেতন বিশ্লেষণ করতে পারেন ও প্রয়োজনীয় কৌশল ব্যবহার করে যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। প্রসিদ্ধ লিকার্ট স্কেল এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী কৌশল হতে পারে। কেন না এর মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর অর্জিত যোগ্যতার মান পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজেকে যোগ্যতার সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে পারেন। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একজন শিক্ষককে অবশ্যই জ্ঞান জগতের নব দিগন্তে প্রবেশ করে সর্বশেষ

শিক্ষণ-প্রযুক্তি ও গবেষণার তথ্য-কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। জীববিজ্ঞান শিক্ষককে একবিংশ শতকের দক্ষতা 4C (Creativity, Communication, Collaboration, Critical thinking) আয়ত্ত করতে হবে। তাঁকে দক্ষ হতে হবে জীভন দক্ষতা ও জীবিকা অর্জনের দক্ষতা সম্পর্কে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষকতা পেশায় অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসেবে তাঁর উপস্থিতি দীর্ঘ করতে পারবেন বটে কিন্তু নিজস্ব উৎকর্ষতার দ্যুতি বিস্তৃত করতে পারবেন না। তাঁর দ্বারা নিজের ভেতরে থাকা দুর্বলতাকে কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করে এর উন্নয়ন ঘটানো কখনো সম্ভব হবে না। শিক্ষকতা হলো মহান পেশা। এ ধরনের আদর্শিক পেশার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সৌভাগ্য সকলের হয় না। যাঁর জীবনে এ পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সুযোগ এসেছে তাঁকে শেখার মনোবৃত্তি নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১) জীববিজ্ঞান শিক্ষন দক্ষতা কী?

২) জীববিজ্ঞান শিক্ষকের শিক্ষন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৩) নবম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ের উপর একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রনয়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব গনি একজন শিক্ষক। তিনি রাতের বেলা পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন। উপকরণ সংগ্রহ করে রাখেন এবং যথা সময়ে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করেন। জনাব রনিও একজন শিক্ষক। অনেক ভাল রেজাল্ট করে শিক্ষকতায় এসেছেন। পাঠ পরিকল্পনা ও উপকরণ না নিয়েই শ্রেণিকক্ষে যান। শ্রেণিকক্ষে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক মজার গল্প করেন।

প্রশ্ন-১)ক। পাঠ পরিকল্পনা কী?

খ। পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য লিখুন।

গ। উদ্দীপকে উল্লেখিত কোন শিক্ষক আদর্শ ব্যাখ্যা করুণ।

ঘ। আনন্দদায়ক শিখনের জন্য পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুণ।

References :

১. শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বিজ্ঞান), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল:এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

২. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি এড) বিজ্ঞান শিক্ষণ(মডিউল ১ ও ৩), টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন পজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিকাদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৮ খ্রি:

৩. হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬ খ্রি:

4. http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html

ইউনিট ৩ : জীববিজ্ঞান শিখনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির উপায়

আগ্রহ ও উদ্দীপনা না থাকলে কোন শিখনই স্থায়ী হয় না। শিক্ষার্থী দ্বারা শিখন কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হলে তার মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা দরকার। এ আগ্রহকে প্রেষণা বলে। প্রেষণা হল অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করার জন্য আগ্রহের প্রাবল্য। মানুষ কোন বিশেষ কাজ, কথা কিংবা চিন্তায় নিয়োজিত হয় তার উৎস মূলে আছে প্রেষণা। মানুষ তখনই উদ্বুদ্ধ বোধ করে যখন সে অনুধাবন করে যে সে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট। প্রেষণা আগ্রহ ব্যক্তির একটি বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থা। এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখা দিলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি উত্তেজনা জাগে। উত্তেজনা শিক্ষার্থীর সাম্যাবস্থাকে বিনষ্ট করে। প্রেষণার তৃপ্তির দ্বারা শিক্ষার্থী সেই সুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এবং অনুসন্ধিৎসা বাড়ানোর জন্য শিক্ষণ-শিখন পরিবেশে বৈচিত্রময় নানা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পরিকল্পিত ভাবে সূচনা করতে হয় যা প্রেষণা তৈরি করে। প্রেষণা শিক্ষার্থীকে শিখনে অনুপ্রাণিত করার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

৩.১ : বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিক্ষণ-

- অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি ও প্রজেক্ট পদ্ধতি
- হাতে কলমে শিখন, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন
- প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিখন

৩.২ : জীববিজ্ঞান বিষয়ে বিতর্ক, পত্রিকা, জার্নাল, ফিল্ড ট্রিপ, বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন, তথ্যপ্রযুক্তির মেলা, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান ক্লাব

৩.১ : বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিক্ষণ-অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি ও প্রজেক্ট পদ্ধতি

অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি

সাম্প্রতিক বিজ্ঞান শিক্ষায় অনুসন্ধান মূলক শিখন প্রক্রিয়াটির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষা কেবল তথ্যের উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা নয় বরং শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন, কাহিনী, দৃশ্যকল্প ইত্যাদি উপস্থাপন করে সমস্যা তুলে ধরা এবং শিক্ষার্থীদের একক বা দলগত কাজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করিয়ে জ্ঞান ও ধারণা অর্জনে সহায়তা করা। এই পদ্ধতিতে ‘What is Known’এর পরিবর্তে ‘How to Know’ এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য তথ্যকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে শিখন কাজটি সমাধা করে। এতে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জিত হয় যা তার ব্যক্তিগত জীবনকে সহজতর করে তোলে।

অনুসন্ধান মূলক শিখনে শিক্ষার্থী নিজস্ব উপায়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে অনুক্রমিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অর্জন করে। এই পদ্ধতির যৌক্তিকতা হলো শিক্ষার্থী নিজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অনুধানের মধ্য দিয়ে যে ধারণা অর্জন করে তা ভাসা ভাসা ভাবে জানা নয়, পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ জ্ঞান।

গবেষণায় দেখা যায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। এতে শিক্ষার্থীদের এমনকি শিক্ষকদেরও আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তি বা অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির) মাত্রা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু শিক্ষণের অন্যান্য অবরোহী ও গঠনবাদ পদ্ধতির সাথে অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির সমন্বয় করা যায়।

শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক দক্ষতা বিকাশে অনুপ্রাণিত হলে বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রকাশক শব্দগুলো (terms) শেখে এবং বিজ্ঞানীদের দৈনন্দিন কাজের ধারা উপলব্ধি ও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে শেখে। একই সাথে তারা উপলব্ধি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনিশ্চিত হতে পারে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বিজ্ঞান সবসময় সোজা পথে চলে না এবং তারা উপলব্ধি করে যে বিজ্ঞান সৃজনশীলতা ও কৌতুহল সৃষ্টির সহায়ক।

অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এক্ষেত্রে তাকেই শিক্ষার্থীদের ইপ্সিত লক্ষ্য বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (শিখনফল) কী শিখবে, কতটুকু শিখবে, কী করতে হবে তা নির্বাচন ও সমন্বয় করতে হয়। অনুসন্ধানমূলক কাজ সূক্ষ্ম দূরদর্শী

চিন্তনের উন্মেষ ঘটায়। বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধানে উচ্চ চিন্তনের প্রয়োগকে উৎসাহিত করে। অনুসন্ধান বিজ্ঞান শিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। বিজ্ঞানীরা যখন সমস্যামূলক কাজে হাত দেন তখন তারা যেমন সমস্যার আলোকে তথ্য যোগার করতে নানা রকম অনুসন্ধান চালান, তেমনি বিজ্ঞান শিক্ষণেও শিক্ষার্থীর কোন প্রকল্পের তথ্য যোগার করতে অনুসন্ধান পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। এছাড়া কোন ঘটনার কারণ ও ফলাফল খোঁজার জন্যও বিজ্ঞানে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয় এর জন্য শিক্ষার্থীকে প্রথমে কোন সমস্যা বা ঘটনা বেছে নিতে হয়। তার পর সেই ঘটনার আলোকে তার কারণ খোঁজার জন্য অনুসন্ধান চালনো হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ-

ক. সমস্যা/উদ্দেশ্য নির্ধারণ
খ. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ
গ. অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ঘ. পরিকল্পনা প্রণয়ন
ঙ. তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ
চ. তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই
ছ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ প্রণয়ন
জ. প্রতিবেদন তৈরি

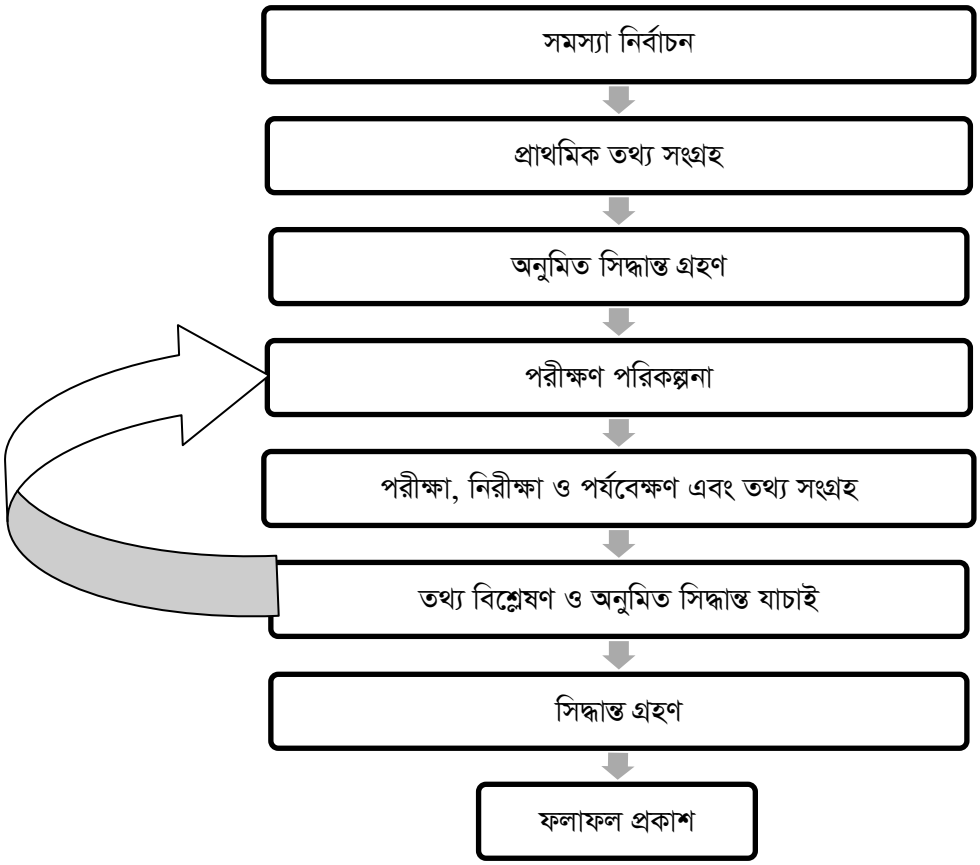

চিত্র : অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রবাহ চিত্র

সর্বপ্রথমে কার্যক্রমের সমস্যা চিহ্নিত করা বা উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কী কী করতে হবে, কোনটি, কীভাবে, কী দিয়ে কখন করতে হবে-এ সবই পরিকল্পনায় থাকে। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রণয়ন করতে হয়। সব শেষে শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ অনুসন্ধানমূলক কাজের উপর একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন বৈজ্ঞানিক ঘটনা অথবা রহস্যের কারণ উৎঘাটন করতে সক্ষম হয় এবং বিজ্ঞানের নানারকম জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে।

প্রদর্শন পদ্ধতি

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতিসমূহের একটি হল প্রদর্শন পদ্ধতি। প্রদর্শন পদ্ধতির মূলকথা হলো কোনো কিছু দেখিয়ে সে সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা। কোনো কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠের বিষয়সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু বা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে বর্ণনা, আলোচনা বা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা হয়। কোন বাস্তব ঘটনাকে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বিজ্ঞান পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষক বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষণ শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ উপস্থাপন করেন। যেমন- একটি জবা ফুলের অংশগুলো দেখিয়ে ফুলের অংশগুলোর সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়তা করা। আবার প্রদর্শন পদ্ধতিকে আমরা কোন বিষয়কে রুপকের মাধ্যমে উপস্থাপন প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করতে পারি। যেমন- মডেলের মাধ্যমে ডিএনএ এর গঠন কাঠামো ব্যাখ্যা করা যায়, গল্পের ছলে চিত্রের মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ এর বিষয়টি শিক্ষক বর্ণনা করেন। এই উপস্থাপনের একটি নীতি বা সূত্র কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যেমন ব্যাপন। প্রদর্শন পদ্ধতিকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা যেতে পারে, কী ঘটবে অনুমান করার জন্য বলা যেতে পারে, অনেক সময় পরীক্ষণ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একই পরীক্ষণ যা বাড়িতে করা সম্ভবপর তা বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। যে সকল বিজ্ঞানের পরীক্ষণ দীর্ঘসময় ধরে করতে হয় তা শ্রেণি কার্যক্রমের আগে সম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষা করার সময় নানা পরিবর্তনকে সংরক্ষণ করতে হবে যেন স্বল্প সময়ে, দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষণ স্তরে স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করা যায়। যেমন- প্রস্বেদনের পরীক্ষা, জলজ উদ্ভিদের অক্সিজেন নির্গমনের পরীক্ষা ইত্যাদি। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শ্রেণিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য নানা রকম এবং নানা প্রকৃতির উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন- চক বোর্ড, ফ্লানেল বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, ছবি, মডেল, নকশা, গ্রাফ, চার্ট, নমুনা, স্লাইড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, টেলিভিশন ইত্যাদি।

মাল্টিমিডিয়া দিয়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষণ দেখানো এক ধরনের প্রদর্শন। এ প্রদর্শনে পরীক্ষণ কিংবা হাতে কলমের কাজ সম্পাদিত হয় না। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভাবে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহনের সুযোগ পায় না। এতে করে হয়ত শিক্ষার্থীরা মজা পায় কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পরীক্ষণ প্রদর্শন শেষে বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য কিংবা পরীক্ষণ প্রদর্শনের আগে পরিকল্পিত ভাবে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বা টেলিভিশন ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তন ক্ষমতা জাগ্রত হয়, বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশের সুযোগ পায়। এখন অনেকে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বা টেলিভিশন দিয়ে পাঠ দান করাকে বিজ্ঞানের নানাবিধ দক্ষতা ও প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের আত্মস্থ করণের প্রক্রিয়া বলে মনে করেন ও বিশ্বাস করেন। তাদের এ ধারণা ভুল। মনে রাখতে হবে এমন ভুল করা যাবে না । বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আনার জন্য শিক্ষকদের ভুল ধারণা ও বিশ্বাসকে সংশোধন করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে জনগণকে সাথে নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর আছে। প্যাডাগজি বহির্ভূত মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ভুল ব্যবহার শিক্ষার গতিকে শ্লথ করে দিতে পারে।

প্রদর্শন পদ্ধতির ব্যবহার :

- বিদ্যালয় সহায়ক যন্ত্রপাতি কম থাকলে।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে।
- যন্ত্রপাতিতে জটিলতা থাকলে।
- পরীক্ষণ পর্বটিতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অধিক থাকলে।
- নিম্নশ্রেণিতে ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্রে।
- নতুন কোন যান্ত্রিক কৌশল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ধারণা দিতে।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধাঃ

- অল্প সময়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রদান সম্ভব।
- অধিক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা।
- সহায়ক সামগ্রী অপর্যাপ্ত হলেও ব্যবহারিক কাজে বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ পরিচালনা সম্ভব।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন।
- স্বল্প ব্যয়, স্বল্প পরিশ্রম ও স্বল্প সময়ে কাজ সম্পাদন।
- পরীক্ষাগার পদ্ধতির বিকল্প এটি।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধাঃ

- শিক্ষার্থী দের চেয়ে শিক্ষকের সক্রিয়তা অধিক থাকে।
- দেখতে অসুবিধা হতে পারে।
- শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা হতে পারে।
- হাতে কলমে কাজ করতে না পারায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জিত হয় না।
- শিক্ষক দ্রুতগতির হলে ছাত্ররা ঠিকমত বুঝতে পারে না।

প্রকল্প পদ্ধতি

প্রকল্প হচ্ছে একটি উদ্দেশ্য মূলক কাজ যা সামাজিক পরিবেশে সর্বান্তকরণে সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ কোন সমস্যা মূলক কাজ যখন স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হয় তখন তাকে প্রজেক্ট বা প্রকল্প বলে। বিজ্ঞান শিখনে প্রকল্পের ভূমিকা অত্যাধিক। কেননা এটা হচ্ছে সমস্যামূলক কাজ যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হচ্ছে সমস্যামূলক কাজ। তাই বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান অর্জনের কাজটি অজ্ঞাতসারে সু-সম্পন্ন হয়। কোন একটি প্রকল্পের কাজ সু-সম্পন্ন করতে ৫ টি ধারাবাহিক সোপানের মাধ্যমে যেতে হয়। সোপানগুলো হলো-

১. উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন।
৩. লিপিবদ্ধ করণ ও যোগাযোগ সাধন।
৪. বিচারকরণ।
৫. মূল্যায়ন।

এভাবে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ করা, যার অপর নাম গবেষণা। তাই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি হয়।

প্রকল্প পদ্ধতি বিজ্ঞান শিক্ষায় নিম্নলিখিত ভূমিকা পালন করে

- শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করে
- প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, চার্ট, মডেল ইত্যাদি নির্মাণ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। এতে তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ সাধিত হয়।
- ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়- প্রকল্পের কাজ করতে শিক্ষার্থীর ব্যাক্তি স্বাধীনতা থাকে, তার রুচি, চাহিদা ও কৌতুহল অনুযায়ী কাজের সুযোগ পায় যা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।
- সামাজিক গুণের বিকাশ হয়- প্রকল্পের কাজ শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধভাবে করতে হয়। দলে সকলের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাদের নানা রকম নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দলানুগত্য, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, গনতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যেবোধ, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে। মিথস্ক্রিয়তা এক ধরনের ঐক্যের জন্ম দেয় যা যুক্তি সঙ্গত চিন্তন বিনিময়কে সম্ভবপর করে তোলে। ধারাবাহিক ভাবে কাজ সম্পাদনের সংস্কৃতি তৈরি করে। জটিল চিন্তন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ফলাফল অর্জনে কর্মকে ধাবিত করে।
- শিক্ষার্থী -শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

- জ্ঞান ও ধারণার প্রয়োগ দক্ষতা অর্জিত হয়।
- আগ্রহ, দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ হয়- প্রকল্পের কাজ করতে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, পরীক্ষা সম্পাদনের দক্ষতা, যন্ত্রপাতি নির্মাণের দক্ষতা ও অঙ্কন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পায় বিধায় কাজে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।
- ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরি হয়।
- দৈনন্দিন জীবনের বৈজ্ঞনিক সমস্যা সমাধানে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

হাতে কলমে শিখন (Learning by doing)

একটি প্রচলিত প্রবাদ 'I hear- I forget, I see – I remember, but I do – I learn'। শিখনের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত সত্য। বিশেষ করে বিজ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে সকল শিক্ষাবিদ learning by doing - কে প্রধান্য দেন। Learning by doing বা করে শেখাই হাতে কলমে শেখা বা ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ করে শেখা। এটি ল্যাবরেটরিতে, শ্রেণিকক্ষে, এমনকি শ্রেণিকক্ষ বা ল্যাবরেটরির বাইরেও হতে পারে।

ব্যবহারিক বা হতে কলমে বিজ্ঞান শেখাকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তা হলো-

১। নির্দেশিত পরীক্ষণ (Directed Experiment)
২। প্রস্তাবিত বা পরামর্শমূলক পরীক্ষণ (Suggested Experiment)
৩। সমস্যা সমাধানমূলক অনুসন্ধান (Problem Solving Exploration)

নির্দেশিত পরীক্ষণ: নির্দেশিত পরীক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত তথ্য, কাজের নির্দেশনা, ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত বলে দেবেন। শিক্ষার্থী একক বা দলগতভাবে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক কাজ সম্পন্ন করে প্রদত্ত তথ্যের ও ফলাফলের সত্যতা যাচাই করবে। যেমন ধুতুরা ফুলের লম্বচ্ছেদ কেটে বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন।

প্রস্তাবিত বা পরামর্শমূলক পরীক্ষণ: প্রস্তাবিত বা পরামর্শমূলক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু অনুমিত সিদ্ধান্ত, কিছু তথ্য দেবেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ এবং ফলাফল উল্লেখ থাকবেনা। শিক্ষার্থী একক বা দলগতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ বা ইঙ্গিত ব্যবহার করে নিজেই পরীক্ষণ পরিকল্পনা করে অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই করবে এবং ফলাফল নির্ণয় করবে। যেমন- কম আলোতে ও বেশি আলোতে সালোকসংশ্লেষণের হার পরিমাপ করা।

সমস্যা সমাধানমূলক অনুসন্ধান: সমস্যা সমাধান মূলক অনুসন্ধান কাজে শিক্ষক কেবল সমস্যা তুলে ধরবেন বা একটি সমস্যার অবতারণা করবেন। শিক্ষার্থী অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরীক্ষণ পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ বা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বা ফলাফল নির্ণয় করবে। এভাবে কাজ করলে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আত্মস্থ হবে। যেমন পাখি কী খায়? এই তিন ধরনের পরীক্ষণই ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা বা 'হাতে কলমে' বিজ্ঞান শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানোর জন্য এই তিন ধরনের ব্যবহারিক শিখন কার্যক্রম অপরিহার্য। প্রথম দু'ধরনের শিখন পদ্ধতি কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের প্রদত্ত জ্ঞান বা ধারণা সুস্পষ্ট হয়, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানে আগ্রহ বাড়ে, পাঠে আনন্দ পায়, পাঠ উপভোগ্য হয়। অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এসব গুণাবলি অর্জনের সাথে সাথে নিজের কাজের প্রতি আস্থাশীল হয়, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জন করে এবং নিজেকে বিজ্ঞানী ভাবতে শুরু করে।

"বিজ্ঞান" বিষয়টির কার্যকর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ শিখনের লক্ষ্যে অবশ্যই শিখনে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। 'করে শিখি' বা ব্যবহারিক কাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যে সব কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তাহলো:

<table>
<tr><td rowspan="2">অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া
বিশ্লেষণমূলক চিন্তন
পরীক্ষণ ও তথ্য বিশ্লেষণ
ব্যবহারিক কাজ
(অন্যকে) শিখিয়ে</td><td rowspan="2">যৌথ কাজ
সৃজনশীল চিন্তন
প্রজেক্ট সম্পাদন
প্রশ্নোত্তর
(অন্যকে) বুঝিয়ে</td><td>ছোট ছোট দলীয় কাজ
সৃজনশীল সমস্যা সমাধান</td><td>আরোহপদ্ধতিতে সামান্যিকরণ
ছদ্ম শিখন বা সিমুলেশনে অংশগ্রহণ</td></tr>
<tr><td colspan="2">বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (সমস্যা নির্বাচন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ,পরীক্ষণ পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ।)</td></tr>
</table>

হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বঃ

- শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়। (যেমন- মুক্তমনস্কতা, জিজ্ঞাসা,আগ্রহ, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বুদ্ধিগত সততা ও নৈতিকতা, কার্যকরণ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস, নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা,পরিকল্পনা মনস্কতা ইত্যাদি)।
- যৌক্তিক চিন্তার সামর্থ্য এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ভীতি দূর হয় এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার দক্ষতা সৃষ্টি হয়।
- বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট হয়, শিখন স্থায়ী হয়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা যেমন-পর্যবেক্ষণ, পরিমাপণ, পূর্বানুমান, পরীক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদিরও বিকাশ ঘটে।

পরীক্ষণ পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

বিজ্ঞান হল প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান এবং অবশ্যই এই জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে লব্দ/প্রাপ্ত অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে কীভাবে ? এ সম্পর্কিত জ্ঞান হল বিজ্ঞানের জ্ঞানের উদাহরণ। কারণ এটি প্রকৃতিতে ঘটা কোন ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান। বিজ্ঞানকে তা হলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হল প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত।

বিজ্ঞান শিখনে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চারিদিকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বুঝতে এবং ভবিষৎতে কী হতে পারে তা উপলব্ধিতে আনতে পর্যবেক্ষণ একটি বড় হাতিয়ার। পরীক্ষণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত ধারণার কার্যকারিতা বোঝা যায়। তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষণ পূর্ব, চলাকালীন এবং উত্তর পর্যবেক্ষণের বিকল্প কিছু নাই। দেখা এবং পর্যবেক্ষণ এক বিষয় নয়। পর্যবেক্ষণ ব্যাক্তিকে গভীর চিন্তা ও উপলব্ধিতে নিয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতেই বাস্তব জীবনের কোন ঘটনাকে শিক্ষার্থীদের মানসপটে নিয়ে যেতে হবে, যেন সে মনোছবিতে বিষয়টি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অথবা প্রদর্শনকৃত কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকল্প পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, অনুসন্ধান মূলক কাজ, হাতেকলমে কাজ, বাস্তব জীবনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, উচ্চ চিন্তনে প্রবেশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোন ভাবেই সম্ভবপর হতে পারেনা। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য কে লিখিত আকারে রাখতে হবে যেন তা থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা যায়। এ জন্য ছক এবং ধারণা মানচিত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। তুলনা মূলক বিশ্লেষণের জন্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানে তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রজ্ঞাকে দৃঢ় করে। শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণে অভ্যস্থ হলে প্রতিনিয়ত সে প্রফুল্ল চিত্তে বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করতে পারে।

বিজ্ঞান হল কতগুলো বৈশিষ্ট্যের সমাহার। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্বে আনার জন্য হাতে-কলমে কাজের বিকল্প নাই। আবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলোই বিজ্ঞান শিক্ষাকে তাৎপর্যময় করে তোলে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলোই পরীক্ষণ কার্য সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়। হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে হয়। বিজ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টি তৈরিতে পরীক্ষণ পদ্ধতি গুরত্বপূর্ণ এবং এটি প্রকল্প পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি ও অনুসন্ধানমূলক কাজ এর প্রাণ।

সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ বলতে কেউ কেউ কিছুকে মনোযোগ দিয়ে দেখা বোঝেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ আসলে তা নয়। ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণ। শিক্ষক এর দায়িত্ব হল কোন বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষার্থীদের সবগুলো ইন্দ্রিয় ব্যবহারে সাহায্য করা।

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে আবিষ্কারকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে হয়। একজন শিশুর কাছে পরীক্ষণ হল " কী ঘটবে তা দেখার জন্য কিছু একটা করা।" পরীক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল কী পরীক্ষা করা দরকার তার একটি ধারণা (অনুমিত সিদ্ধান্ত) এবং অন্যটি হল চলক নিয়ন্ত্রণ করা। পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সক্রিয়ভাবে কতকগুলো বাস্তব পদক্ষেপ অনুসরণ করে সঠিক তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক কাজের বিভিন্ন ধাপ

- সমস্যা নির্দিষ্টকরণ।
- সমস্যা সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেণ।
- অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- পরীক্ষার পরিকল্পনা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই।
- পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বর্জন বা সংশোধন।
- ফল প্রকাশ।

সুবিধা

- শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কার্য চালাতে হয় বলে তাদের মনোযোগী হওয়ার আশংকা কম থাকে ।
- পরীক্ষার ফলে প্রাপ্ত সমাধান শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে।
- শিক্ষার্থীদের রুচি, আগ্রহ, পারঙ্গমতা, বিভিন্নতা সর্ম্পকে জানা যায় বিধায় শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র অনুযায়ী শিক্ষক বিষয় বস্তু সর্ম্পকে ধারণা দিতে পারেন।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়রস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

অসুবিধা

- প্রয়োজনানুসারে শিক্ষা উপকরণ ও পরীক্ষা উপকরণ সহজলভ্য না হওয়ায় অনেক সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।
- কোন কোন সময় পরীক্ষার ফলাফল লাভের জন্য দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এতে পরীক্ষা প্রারম্ভে যে উদ্যম ও অনুপ্রেরণা থাকে পরবর্তীতে সেটা হারিয়ে যায় এবং শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।
- পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী অভিরুচি, পারগতা ও দক্ষতার কথা বিবেচনা করে বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য যে ধৈর্য্য, বুৎপত্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন অনেক শিক্ষকের মধ্যে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিখন

যে কোন ব্যক্তি কোন না কোন ভাবে প্রতিদিন অসংখ্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এর সব কিছু তিনি সচেতন ভাবে মনে রাখেন না। আবার যে অভিজ্ঞতাগুলো কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তিনি সেইসব অভিজ্ঞতাকে বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং ফলাফলকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন। অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তির কাছে অর্থপূর্ণ এবং পরবর্তীতে কোন কাজে লাগবে বলে মনে করেন, সে অভিজ্ঞতার সাথে পূর্বের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে নতুন পরিস্থিতিতে কাজে লাগান অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করেন। কোন বিষয়ে গভীর চিন্তনে নানা সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদানগুলো নিয়ে সূক্ষ্ম জটিল চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, ফলে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। একটি শিশুর বেড়ে উঠা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা তাকে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে এবং শিখনে উৎসাহিত করে। যেমন হাঁটতে শেখা, কথা বলতে শেখা, নতুন নতুন বস্তু কে স্মরণ করতে শেখা, নিজের চিন্তাকে (মতামত) প্রকাশ করতে পারা ইত্যাদি। অভিজ্ঞতা মানুষের একটি বড় সম্পদ, যদি তাকে কাজে লাগানো যায়। একজন মানুষ প্রতিদিন নানারকম কাজ করে যেমন- ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজে, প্রাতভ্রমণে যায়, পাখি দেখে, বৃক্ষ দেখে, চিমনির ধুয়া দেখে, কুকুর-বিড়াল দেখে, গরুর শরীরে বসে থাকা পাখি দেখে, মেঘ দেখে, যানবাহন দেখে। এমন অজস্র ঘটনা দেখে। কিন্তু সব ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে না, সকল দেখাও মনে রাখেনা। শিক্ষার্থীর পাঠের সাথে এ দেখাকে যদি সংযুক্ত করা যায়, দেখার বিষয়টিকে যদি বিশ্লেষণ করে পাঠের দিকে ধাবিত করা যায় তবে পাঠটি হয়ে উঠবে হৃদয়গ্রাহী, আনন্দদায়ক, অর্থবহ। এ দেখা তখন আর সাধারণ দেখা থাকবে না, এটি পর্যবেক্ষণ থেকে গভীর চিন্তনের বিষয়ে পরিণত হবে। নানা রকম জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে উঁকি দিবে, জানার আগ্রহ বাড়বে, অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি হবে এবং নানা রকম তথ্য অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করবে। অর্থাৎ প্রেষণা তাকে শেখার জন্য সামনের দিকে নিয়ে যাবে, স্ব-শিখনে আগ্রহী হবে।

শিখন মূলতঃ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কোন কিছুর সক্রিয় অর্থ গঠন (Active construction of meaning)। শিক্ষার্থী কর্তৃক ফলপ্রসূ ও কার্যকর জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের জন্য শিক্ষককে বাস্তব জীবনের সাথে পাঠের বিষয়কে সংযুক্ত করতে হবে। শিখন হঠাৎ করে সংঘটিত হয় না। মস্তিষ্ক প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাত করে অর্থবোধক করে নেয়। কোন শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক কোন তথ্য গ্রহণ করে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার আলোকে প্রক্রিয়াজাত করে, তারপর তা নিজস্ব আঙ্গিকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে। এ প্রক্রিয়াই গঠনবাদের মূলভিত্তি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আসে প্রতিদিনের নানা রকম ক্রিয়াকলাপ থেকে, প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা থেকে। শিখনে এর জন্য প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্তকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, (বিজ্ঞান- ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি, পদার্থবিজ্ঞান,রসায়ন, জীববিজ্ঞান- নবম-দশম শ্রেণি) এর ভূমিকায় বলা হয়েছে "বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করে প্রাত্যহিক জীবনে এর ব্যবহার এবং এ সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে জীবনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুঁজে পাবে ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে। একই সাথে বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মানবিক আবেদন উপলব্ধি করতে পারবে। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত ও উদার মনোভাবাপন্ন হয় শিক্ষাক্রমে তার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করে একটি বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীর শিখনে প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা সম্পৃক্তকরণে শিক্ষকের ভূমিকা-

- প্রচলিত শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের তত্ত্ব ও তথ্য জানানোর পরিবর্তে শিখন সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পনাবিদ এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করা।
- বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞান, নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা।
- কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি বিজ্ঞান পাঠের সাথে সম্পর্কিত হলে ডায়েরীতে (জার্নালে) লিখতে উৎসাহিত করা।
- কোন ঘটনাকে সূক্ষ্ম ভাবে পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করা।
- কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি বিজ্ঞান পাঠের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণে উৎসাহিত করা।
- কোন ঘটনা বা পরিস্থিতিকে কী ভাবে পাঠের সাথে সম্পর্কিত করবে তার কৌশল দেখান।
- সম্ভব হলে বিজ্ঞান পাঠের সাথে সম্পর্কিত বস্তু বা পরিস্থিতির ছবি তুলে রাখতে উৎসাহিত করা।
- বিজ্ঞান পাঠের সাথে সম্পর্কিত বস্তু বা পরিস্থিতি নিয়ে গল্প/প্রবন্ধ লিখতে, কবিতা লিখতে, দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করতে, স্লাইড বানাতে, খেলা তৈরিতে সাহায্য করা।
- শ্রেণি পাঠের শুরুতে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, অতিথি বক্তৃতার আয়োজন করা।
- পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে আনা।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জীববিজ্ঞান শিখবে এমন সম্যসার উত্তর খুজতে দেওয়া।
- শিক্ষার্থীকে অনুসন্ধিৎসু করার জন্য সমস্যা চিহ্নিত করে কিছু কিছু সহজ অনুসন্ধানমূলক কাজ দেওয়া যেন প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে তথ্য সমূহ অনুসন্ধান করতে পারে।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব ব্যক্তি উপযোগী প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কাজ দেওয়া।
- চারিপাশে ঘটে যাওয়া জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ভিডিও দেখানো।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 'কী শিখবে' এবং 'কীভাবে শিখবে' তার রূপরেখা তৈরি করা। (পাঠে উল্লেখিত বিষয়-বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এমন তালিকা প্রস্তুত করা এবং সে তালিকা থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।)
- অভিজ্ঞতা বিনিময়কালে শিক্ষার্থী হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে এমন বক্তব্য থেকে বিরত থাকা।
- অভিজ্ঞতা বিনিময়কালে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য এমন ভাবে উপস্থাপন করবেন যেন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, দক্ষতা ,বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে অভিজ্ঞতার আলোকে কুসংস্কারমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক ও যৌক্তিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা।
- শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক পূর্বেই প্রাত্যহিক জীবনের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা জীববিজ্ঞানের শিক্ষাক্রমানুযায়ী লিখে নিবেন। প্রতিনিয়ত শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করে নিবেন। প্রয়োজনে এ বিষয়টি নিয়ে কর্মসহায়ক গবেষণা করা।

জীববিজ্ঞান বিষয়বস্তুর শিখনফল চিহ্নিত করে সে আলোকে প্রাত্যহিক জীবনের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার ছক এর নমুনা

শ্রেণি : ষষ্ঠ			
অধ্যায়	টপিক	শিখনফল	প্রাত্যহিক জীবনের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা
-----	--------	---------	------
দ্বিতীয়	জীব জগৎ	১. প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবজগতের শ্রেণিকরণ করতে পারবে। ২. সপুষ্পক এবং অপুষ্পক উদ্ভিদের শ্রেণিকরণ এবং পার্থক্য করতে পারবে। ৩. সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মেরুদন্ডী এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।	চারিপাশের বৈচিত্র্যময় প্রাণি ও উদ্ভিদ কে পর্যবেক্ষণ করা এবং এদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিল ও অমিল খোঁজা। চারিপাশের সপুষ্পক এবং অপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল পর্যবেক্ষণ করা নিজের দেহ এবং পরিবেশে থাকা পতঙ্গ ও প্রাণির বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা। বাড়িতে চিড়িং মাছ ও অন্যান্য মাছের কাঁটার বিষয়টি লক্ষ্য করা।
তৃতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	১. প্রাণী এবং উদ্ভিদের কোষের মধ্যে মিল এবং অমিল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষের প্রধান পার্থক্যকারী অংশসমূহের চিহ্নিত চিত্র অংকন করতে পারবে।	নিজের গালের কোষ এবং বাড়ি থেকে আনা পেয়াজের কোষ পর্যবেক্ষণ। আলু এবং মাংসের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ। বিভিন্ন সবজির গঠন পর্যবেক্ষণ।
-----	--------	---------	------
চতুর্দশ অধ্যায়	পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন	১. পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পরিবেশের উপাদানসমূহ লক্ষ্য করা। পরিবেশ কীভাবে বদলে যায় তা পর্যবেক্ষণ। নানান ধরনের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ। (বাজার, শিল্প এলাকা, ফসলের ক্ষেত ইত্যাদি) নিজের মধ্যে পরিবেশ নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তৈরি।

শ্রেণি : অষ্টম			
অধ্যায়	টপিক	শিখনফল	প্রাত্যহিক জীবনের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা
-----	--------	---------	------
তৃতীয়	অভিস্রবন এবং প্রস্বেদন	১. উদ্ভিদের পানি শোষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. উদ্ভিদ কীভাবে দেহ হতে পানি পরিত্যাগ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	খাবারের গন্ধ পাওয়ার অভিজ্ঞতা। বাড়িতে ফিরনিতে কিসমিস দেওয়ার পূর্ব এবং পরবর্তি অবস্থা পর্যবেক্ষণ। কাপড় ধোয়ার পূর্ব এবং পরবর্তি অবস্থায় হাত পর্যবেক্ষণ। দুপর এবং সন্ধ্যায় গাছের পাতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ। খবরের কাগজ কীভাবে পানি শোষণ করে তা দেখা। চারাগাছের মূল পর্যবেক্ষণ। গাছের ঢাল ভেঙ্গে গেলে সেখানে কী ঘটে তা দেখা। গাছের বাকল পর্যবেক্ষণ। কাঠের উপর এর প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ। টবে নিয়মিত পানি না দিলে চারার অবস্থা কী হয় তা পর্যবেক্ষণ। নানা রকম মাটির গঠন পর্যবেক্ষণ। নানা ঋতুতে গাছের পাতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ।

-----	--------	---------	------
চতুর্থ	উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি	১. বিভিন্ন প্রকার পরাগায়ণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। ২. যৌন এবং অযৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। ৩. নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পরীক্ষার মাধ্যমে অঙ্কুরোদগম প্রদর্শন করতে পারবে। ৫.শিক্ষার্থীর পরিবেশে সংগঠিত স্বপরাগায়ণ এবং পরপরাগায়ণ চিহ্নিত করে কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	চারিপাশের সপুষ্পক উদ্ভিদের ফুল পর্যবেক্ষণ। কুমড়ার ফুল পর্যবেক্ষণ করা। পেঁপে গাছের ফল পর্যবেক্ষণ। কৃষক কীভাবে পরাগায়ণে সাহায্য করে তা দেখা। বাড়িতে ছোলার অঙ্কুরোদগম দেখা। ফুলের আকার ,রং, বর্ণ, নানা অংশ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করা। ফুলে নানা রকম কিট-পতঙ্গ বসা দেখা।

বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কতিপয় আন্তঃসম্পর্ক

বিদ্যালয় পর্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা কিছু সংখ্যক মানসিক দক্ষতা ও প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গঠিত।বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে কতিপয় আন্তঃসম্পর্ক থেকে ধারনা করা যায় বিজ্ঞান একটি সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া। এখানে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, হাতে-কলমে কাজ বিজ্ঞান শিখনের সকল স্তরেই প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে চিন্তা করা যায় না। প্রত্যেকেই একে অপরের সম্পূরক। কোন একটা বিশেষ পদ্ধতির কথা বলা হলেও নামকৃত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে অন্য সকল প্রক্রিয়াগুলো এর মধ্যে গ্রন্থিত। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিখন-শিক্ষণ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতিতে বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে শিখন কার্যক্রমকে গতিময় করা হয়।ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলো নানাভাবে অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে সাহায্য করে এবং তার মধ্যে উচ্চ চিন্তন ক্ষমতা বিকশিত হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া ও ধরন এক রকম নয় কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার শিক্ষার্থীদের একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হলে নানা ধরনের পদ্ধতির সংমিশ্রণে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

৩.২ জীববিজ্ঞান বিষয়ে বিতর্ক, পত্রিকা, ফিল্ড ট্রিপ, বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন, তথ্যপ্রযুক্তির মেলা, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান ক্লাব

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিতর্ক একটি উদ্বুদ্ধকরণ শিল্প। বিতর্কের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষকে নিজের মতামতে অপরকে উদ্বুদ্ধ করা, উজ্জীবিত করা, আত্মদর্শনে অপরকে সঞ্চারিত করা। যে কোন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিতর্কের বিষয়ের গভীরে প্রবেশের জন্য দুরদৃষ্টি সম্পন্ন উচ্চ চিন্তন ক্ষমতার প্রতিফলন প্রয়োজন। প্রশ্নই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে আর দ্বন্দ্ব ব্যতীত মানবিক চিন্তার বিকাশ অসম্ভব। বিতর্ক তর্ক নয়। তর্ক করা হয় জোর করে কোন বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং বিতর্ক করা হয় যুক্তির নিরিখে কোন ঘটনাকে বুঝার জন্য। আমরা সকলেই বিতার্কিক, কেননা আমরা সকলেই বুঝতে চাই এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে চাই। উপস্থাপন, ভাষা, যুক্তিখন্ডন সব কিছুতেই একটা দক্ষতা আবশ্যক। আমাদের সংস্কৃতিতে স্বাধীন চিন্তা, জিজ্ঞাসা, আত্মপ্রকাশের সুযোগ,পরমতসহিষ্ণুতা– এসবের নিদারুণ অভাব। বির্তকে কেবল সঠিক শব্দ প্রয়োগ নয় সঠিক উচ্চারণও দরকার, নইলে বক্তব্য গন্তব্যে পৌছাতে পারবে না। সবকিছুর আগে একেবারে প্রথমে চাই জ্ঞান যা আসে অধ্যয়ন থেকে, বাহিরের জগৎ থেকে এবং মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনের ভেতর দিয়ে। মনে রাখতে হবে একটা চিন্তার বিপরীতে অন্য চিন্তা থাকতে পারে। একটা দৃশ্যের পেছনে আর একটা দৃশ্য থাকতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মূল চাবি কাঠি হল প্রশ্ন। মানসম্মত প্রশ্ন দৃশ্যপটকে পাল্টে দিয়ে সত্য আবিষ্কারের জন্য পথের সন্ধান দেয়। বিতর্কেও পথের সন্ধান দেয় প্রশ্ন। একজন বিতার্কিক যুক্তিদিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে, যেমন একজন বিজ্ঞানী যুক্তিদিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনিত হন। বিতর্কের উপকারিতা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা হয়।বিতার্কিক প্রচুর পড়াশোনার মাধ্যমে অনেক অজানা জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে। বিতর্ক করার জন্য বিতার্কিককে বিভিন্ন বই পড়তে হয়, লাইব্রেরীতে যেতে হবে, নানা ওয়েব সাইটে ঢুকতে হবে। সমসাময়িক পরিবর্তনের উপর নজর রাখতে হবে। জ্ঞানী মানুষের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় বুঝে আসতে হবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রত্যুৎপন্নমতিতার সাথে যুক্তির নিরিখে তথ্য ও তত্ত্বকে উপস্থাপন করতে হবে। সত্য কথা বলা, মাথা ঠান্ডা রাখা এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারার যোগ্যতা থাকা চাই বিতার্কিকের। বিজ্ঞানে যেমন বিশ্লেষণ

গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে বিষয়টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন এবং সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যাখ্যাকে বিবেচনায় আনতে হয় যা বিজ্ঞানের মত ক্রিটিক্যাল চিন্তনের দক্ষতা বাড়ায়। বিতর্কে বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করে বক্তার বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হয়। দলীয় উৎসাহ এবং সমন্বয় বিতর্কের প্রাণ। সহযোগিতামূলক মানসিকতাই দলীয় উৎসাহকে ধরে রাখে। সভ্য জগতে বিতর্কের প্রত্যয়টি হচ্ছে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে ধৈর্য, সহানুভূতির সঙ্গে পারস্পরিক যুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানোর একটি রীতি।

বির্তক সভা

একই বিদ্যালয়ে আলাদা শ্রেণি বা শাখা অথবা দল তৈরি করে অথবা একাধিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের আকর্ষণীয় দিক বা সাম্প্রতিক কোন আবিষ্কার নিয়ে বির্তক সভার আয়োজন করা যেতে পারে। বিতর্ক সভা পবিচালনার জন্য একজন শিক্ষককে সভাপতির দায়িত্ব নিতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমান সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করবে। প্রত্যেককে ৩ থেকে ৫ মিনিট বক্তব্য রাখার সময় দেয়া হবে। একজন পক্ষে বলার পর অন্যজন বিপক্ষে বলবে। উভয় পক্ষে একজন করে দলনেতা থাকবে। যুক্তি খন্ডনের জন্য দলনেতাকে ৩ মিনিট করে আরও একবার বলার সুযোগ দিতে হবে। বিতর্ক শেষে বিজ্ঞানশিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন।

বিতার্কিকের করণীয়

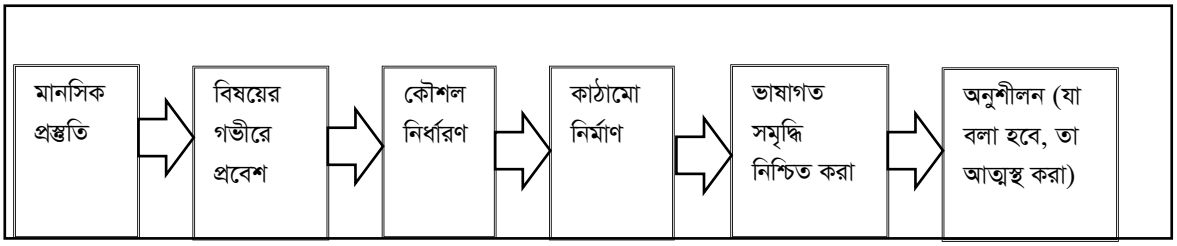

মূল্যায়ন

প্রত্যেক বক্তার বক্তব্য মূল্যায়নের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা যেতে পারে। মূল্যায়নের জন্য নম্বর বন্টনের ছক নিচে দেওয়া হল। প্রয়োজনে এটি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

তারিখ.....

বিতর্কের রিষয়.....

বিতার্কিকের নাম.....

মূল্যায়ন পত্র

উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি	উপস্থাপন ও ভাষার ব্যবহার	তথ্য ও যুক্তি	যুক্তির প্রয়োগ ও বিষয় বস্তুর গভীরতা	যুক্তি খন্ডন (প্রথম বক্তার জন্য যুক্তি সংগত সম্যসার উপস্থাপন)	প্রাসঙ্গিকতা	অভিনবত্ব	মোট
৫	৫	৮	১০	১০	৬	৬	৫০

বিচারকের নাম

স্বাক্ষর

বক্তার মূল্যায়নের জন্য তিন জন বা পাঁচ জনের একটি বিচারক প্যানেল তৈরি করতে হবে। প্যানেলের বিচারকগণ আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের মূল্যায়ন করবেন। তাদের মূল্যায়নের গড় থেকে চুড়ান্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞান পত্রিকা ও দেয়াল পত্রিকা

গণমাধ্যমের শক্তিশালী প্রচার হলো পত্রিকা। বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব, আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা, প্রসার ও ফলাফল নিয়ে যে পত্রিকা বের হয় তাকে আমরা বিজ্ঞান পত্রিকা বলে থাকি।

দেয়াল পত্রিকা বা দেয়ালিকা (Wall magazine) হল বিজ্ঞপ্তি বোর্ডে প্রকাশিত এক ধরণের সাময়িকপত্র; বিশেষত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেখানে শিক্ষার্থী এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সদস্যগণ একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে নিজেদের প্রবন্ধ, কবিতা, অঙ্কন এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশ করতে পারে। কখনো কখনো এই প্রকাশনা কোলাজ আকারে হয়ে থাকে। দেয়ালে হাতের লেখার পত্রিকা প্রকাশিত হয় বলে এটা দেয়াল পত্রিকা বলা হয়ে থাকে যা সংক্ষেপে দেয়ালিকা নামেও পরিচিত।

মাসিক ভিত্তিক না হলেও ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের এর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করতে হবে। তবে প্রবন্ধ অবশ্যই বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে হবে। প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গঠিত হবে। লেখার কৌশল আয়ত্তে আসবে, উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে অভ্যস্থ হবে, লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং নানা বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির সাথে সাথে ক্রিটিক্যাল চিন্তনের দক্ষতা বাড়বে। পত্রিকার ডিজাইন এমন হবে যেন প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিকের জীবনী, আবিষ্কারের মজার ঘটনা, ছোটদের আবিষ্কার, বিজ্ঞান প্রজেক্ট, রোবটিক্স, স্বাস্থ্য কথা, প্রশ্নোত্তর, ভাবার বিষয়, ছবিতে বিজ্ঞান, কবিতায় বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় আকর্ষনীয় ভাবে উপস্থাপিত হবে। পত্রিকা অধ্যয়নের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করা যায়।

জার্নাল

জীববিজ্ঞান শিক্ষায় জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রতিদিন পৃথিবীর নানা প্রান্তে জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা আবিষ্কার হচ্ছে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানুষের জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় অন্যের চিন্তা-চেতনার সাথে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ে নতুন কিছু ভাবেন যা জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে। এ সমস্ত আবিষ্কার এবং চিন্তন অন্যের সাথে বিনিময় করে সকলে নব চিন্তায় উজ্জীবিত হন। নিজেকে হালনাগাদ রাখার একটি উপায় হল অবিরত লেখা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ কাজটি করা হয় জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে জীববিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রম হিসেবে জার্নাল ব্যবহার করা হয়। এতে জীববিজ্ঞানের মডেল, বিজ্ঞানীর ছবি, কার্টুন, নতুন আবিষ্কারের সংবাদ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্ভাবনী কাজ, যন্ত্রপাতির নকশা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গবেষণা ইত্যাদি শিরোনামে প্রকাশের ব্যবস্থা কর হয়। জার্নাল প্রকাশিত হয় নির্দিষ্ট সময় পর পর এবং প্রকাশিত জার্নাল সহজে চেনার জন্য ধারাবাহিকভাবে পরিচিতি নম্বর দেওয়া হয়।

জার্নাল প্রকাশনা কমিটি

একজন শিক্ষক জার্নাল প্রকাশনা কমিটি পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকেন। তবে কয়েকজন শিক্ষক এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী সদস্য হিসেবে কমিটিতে কাজ করেন। কমিটিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।

জার্নাল প্রকাশনা কমিটির কাজ

- জার্নাল প্রকাশের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা
- জার্নাল প্রকাশের বাজেট তৈরি ও অনুমোদন করানো
- জার্নালে কি ধরনের বিজ্ঞান সংবাদ, গবেষণার কাজ, নতুন তথ্য, ছবি, কার্টুন, গল্প সংগ্রহ ও আকর্ষনীয় শিরোনাম করতে হবে সে সম্পর্কে নীতিমালা তৈরি করা
- জার্নাল প্রকাশনা কমিটির সদস্যদের কাজের দায়িত্ব বন্টন করা ও কাজের সমন্বয় করা
- জার্নাল প্রকাশের জন্য কাজের ধাপের সময়সূচি তৈরি করা
- জার্নালকে আকর্ষণীয় করার জন্য ডিজাইন তৈরি করা
- জার্নালকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রচ্ছদ তৈরি করা (এতে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে)
- লেখা অহ্বান করা, সংগ্রহ করা, নির্বাচন করা, সম্পাদনা করা এবং প্রুফ দেখা
- জার্নাল ছাপানো ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা
- জার্নাল বিতরণের ব্যবস্থা করা
- জার্নাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা

- বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা করা
- প্রকাশিত জার্নালের উপর আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা
- জার্নালের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা
- প্রকাশিত জার্নাল বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ত্রুটি/বিচ্যুতি দূর করা

জার্নাল প্রকাশের উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠান প্রধানের পরামর্শে জার্নাল প্রকাশনা কমিটি জার্নাল প্রকাশের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে থাকে। উদ্দেশ্য নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ (যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক-প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক ইত্যাদি) এবং শিক্ষকদের সমন্বয় কর্মশালার মাধ্যমে জার্নালের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।
জার্নাল প্রকাশের কিছু উদ্দেশ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল-

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেও উদ্ভাবনীমূলক কাজে আগ্রহী করে তোলা
- বিষয় নিজস্ব চিন্তা চেতনাকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া
- বিষয়ে সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, নাটক লিখতে ও কার্টুন আঁকতে অনুপ্রাণিত করা
- সংশ্লিষ্ট ছবি তুলতে ও ক্যাপসান লিখতে উৎসাহিত করা
- জীববিজ্ঞানে শিখন-শিখানোর শিখন সামগ্রী সংগ্রহে অভ্যাস গড়ে তোলা
- সৃজনশীলতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার বিকাশ ঘটানো
- জীববিজ্ঞান শিখনকে আকর্ষনীয় ও সহজতর করা
- গবেষণা সংক্রান্ত কাজ প্রকাশ করা
- তথ্য সংগ্রহ করার অভ্যাস তৈরি করা

বিদ্যালয়ভিত্তিক জার্নাল ও গবেষণাভিত্তিক জার্নাল

বিদ্যালয়ভিত্তিক জার্নাল ও গবেষণাভিত্তিক জার্নালের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। বিদ্যালয়ভিত্তিক জার্নাল মূলত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাচেতনা ও গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করে এবং যুক্তি-যুক্ত লিখনে অনুপ্রাণিত করে, যেন ভবিষ্যতে তারা বৈজ্ঞানিকের মত আচরণ করতে পারে। শিক্ষকরা নিজেদের হালনাগাদ রাখতে পারেন এবং একই সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও নিজস্ব গবেষণার ফলাফল প্রকাশের সুযোগ পান। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং লক্ষ্যাভিমুখী যাত্রা নিশ্চিত হয়। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সংক্রান্ত কর্মকান্ড সবাইকে জানানো এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে জ্ঞান বিনিময় করা। গবেষণাভিত্তিক জার্নালে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা, একদল বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক দ্বারা চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের জন্য এ গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জার্নাল দ্বারা বিশ্ববাসী নব আবিষ্কারের সাথে পরিচত হয় এবং বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী নব চিন্তায় উজ্জীবিত হয়। নতুন গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারনে গবেষণাভিত্তিক জার্নাল পথনির্দেশনা দেয়। তেমনিভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক জার্নাল শিক্ষাপদ্ধতিকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে গড়তে পারে।

বিজ্ঞানে ফিল্ড ট্রিপ

বিজ্ঞান শিক্ষা শ্রেণি কক্ষের চারদেয়ালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় না । শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান খুবই অল্প সময়ের। এই সীমিত সময় এ পরিবেশে বিজ্ঞানের খুটিনাটি অনেক বিষয় শেখা সম্ভব হয় না, তা ছাড়া শ্রেণিশিক্ষা শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক সময় বিরক্তি ও অনীহা বয়ে আনে। এই বিরক্তি ও অনীহা ভাব কাটানোর জন্য এবং বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের জন্য পরিকল্পিতভাবে শ্রেণিকক্ষের বাহিরে দূরবর্তি কোন পরিবেশে কিংবা স্থানীয় কোন উল্লেখযোগ্য স্থানে ভ্রমনের ব্যবস্থা করা হয়। এটাকে বিজ্ঞানে শিক্ষামূলক ভ্রমন বা ফিল্ড ট্রিপ (Fild Trip) বলা হয়। ফিল্ড ট্রিপে শিক্ষার্থীগণ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং শিক্ষা তার নিকট চিত্তাকর্ষক, সঠিক ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় ফিল্ড ট্রিপের গুরুত্ব-

- শিক্ষামূলক ভ্রমন (ফিল্ড ট্রিপ) পুঁথিগত বিষয়শিক্ষার পরিপূরক।
- ফিল্ড ট্রিপ শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা দান করে, যা শ্রেণি শিক্ষায় পরিপূর্ণতা আনে।
- এই ট্রিপের মাধ্যমে বাইরের জগতের সহিত বিদ্যালয়ের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে এবং প্রকৃতির নানা বস্তু পর্যবেক্ষণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সক্রিয় সহযোগিতা, সমবেদনা মনোভাব, দায়িত্ববোধ, আত্মনির্ভরতা, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ ঘটে।
- প্রজেক্টধর্মী কাজের জন্য ফিল্ড ট্রিপ বিশেষ ভাবে উপযোগী।
- তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের জন্য ফিল্ড ট্রিপ বিশেষ সহায়তা দান করে।
- ফিল্ড ট্রিপ শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্য পুস্তক সহজে আতস্থ করতে এবং পাঠগ্রহনে সাবলীল হতে সহায়তা করে।
- এর মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষার একঘেয়েমী দূর হয়, হৃদয় প্রসারিত হয়, কাজে আনন্দ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।
- ফিল্ড ট্রিপকে কার্যকর করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ঃ ফিল্ড ট্রিপের পূর্বে বাৎসরিক পবিকল্পনায় ফিল্ড ট্রিপের বিষয়টি উল্লেখ থাকলে যথা সময় ফিল্ড ট্রিপ সম্পন্ন করা সহজসাধ্য হয়। ফিল্ড ট্রিপের পূর্বে ফিল্ড ট্রিপের উদ্দেশ্য এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল লিখিত রূপে থাকতে হবে। ফিল্ড ট্রিপের স্থান, বিষয় এবং শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণির উপর উদ্দেশ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ফিল্ড ট্রিপের সাধারণ কিছু উদ্দেশ্য-

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা
- শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা
- বাস্তব পরিবেশে বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে তার অভিজ্ঞতা লাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র আনায়ন করা
- শিক্ষার্থীদের নতুন ধারণায় সমৃদ্ধ করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রিটিক্যাল চিন্তনের সুযোগ তৈরি করা
- শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করতে সাহায্য করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রশ্নের উদ্রেক তৈরি করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করা
- শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়ানোর সুযোগ তৈরি করা
- মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে যুক্তি সঙ্গত ভাবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগ সৃষ্টি করা
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য ক্ষেত্র তৈরি করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ তৈরি করা
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করা
- অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত/ উৎসাহী করা
- পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন করা

পরিকল্পনা ঃ জীববিজ্ঞান শিক্ষকের সভাপতিত্বে কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে ফিল্ড ট্রিপের একটি সাব কমিটি গঠিত হবে। তারা ফিল্ড ট্রিপের যথাযথ পরিকল্পনা করবে। কমিটির দায়িত্ব -

- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ;
- শিক্ষার্থীর অবিভাভকের লিখিত সম্মতি লাভ;
- যানবাহন সম্পর্কিত ব্যবস্থা;
- প্রয়োজনে নানা স্থানে যোগাযোগ;
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- নিয়ম শৃঙ্খলা ও আচরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা;
- কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে তার নির্দেশনা;
- খাবার গ্রহনের নীতিমালা তৈরি;
- প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত নির্দেশনা;
- সময়সূচি তৈরি;
- ফিল্ড ট্রিপ উত্তর করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা;

কর্ম সম্পাদন

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা মোতাবেক ফিল্ড ট্রিপ সম্পন্ন করতে হবে। ফিল্ড ট্রিপে শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষ ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহ করবে।

ফিল্ড ট্রিপের ফিডব্যাক

উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা মোতাবেক শিক্ষার্থীরা একক বা দলীয়ভাবে সংগ্রহীত মডেল, নমুনা এবং ছবি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ উত্তর ফলাফল নির্ধারিত ফরম্যাটে লিখে জমা দেবে এবং নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী ফিল্ড ট্রিপের বিবরণ শ্রেণিতে উপস্থাপন উত্তর মূল্যায়নের জন্য জমা দেবে। বিবরণীতে গ্রাফ, চার্ট, ছবি এবং ভিডিও (ছবি ও ভিডিও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে) সংযুক্ত করতে উৎসাহিত করতে হবে। প্রশ্নোত্তর এবং বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উচ্চচিন্তন ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, দূরদর্শি চিন্তা ইত্যাদির রেকর্ড রাখতে হবে যেন পরবর্তি ফিল্ড ট্রিপের সাথে তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। ফিডব্যাক ছাড়া ফিল্ড ট্রিপ অর্থহীন হয়ে যাবে। সুতরাং ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য শিক্ষককে পূর্বেই কৌশল নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন যেন শিক্ষার্থীরা ফিডব্যাকে মানসিক চাপের মুখে না পড়ে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে ফিল্ড ট্রিপের উপর দেয়ালিকা তৈরি করা যেতে পারে। একই সাথে শিক্ষাপতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ছবি সহ ফিল্ড ট্রিপের উপর তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে। সম্মানিত সভাপতি তার নিজস্ব মতামত ও সুপারিশ সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পাদিত ফিল্ড ট্রিপের উপর একটি পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং রিপোর্টের কপি নির্দিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

বিজ্ঞান জাদুঘর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও শারিরীক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। বিজ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রাণবন্ত করতে এবং অন্তর্দৃষ্টি তৈরিতে বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন ব্যাপক কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন ফিল্ড ট্রিপের অংশ। জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থাপনা ফিল্ড ট্রিপ ব্যবস্থাপনার অর্ন্তগত।

জাদুঘর বলতে বোঝায় যেখানে প্রাচীন জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান জাদুঘরের রুপরেখা এর চেয়ে আলাদা। এখানে সাধারণত বিজ্ঞান বিষয়ক জিনিস পত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়। একই সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু কাজ হাতে কলমে করার সুযোগ থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে এটি কাজ করে । জনসাধারণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য, বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত নানা ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নেয়। নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা । দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ও জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহনের সুযোগ দিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করে । ষাটের দশকের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথম 'বিজ্ঞান কেন্দ্র আন্দোলন' শুরু হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিজ্ঞান জাদুঘরসমূহ সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

জাদুঘর শিক্ষার একটি বিশেষ ক্ষেত্র যা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের জন্য নিবেদিত। এর মূল উদ্দেশ্য হল, তাদের অবজেক্ট ও সংগ্রহের উপর কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়ানোর জন্য অভিজ্ঞতা শেখার জন্য দর্শকদের নিয়োজিত করা। শিক্ষার সম্পদ হিসাবে জাদুঘর ব্যবহার করার জন্য শিক্ষকদের পেশাদারী ক্ষমতা বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনের সুফল

- **জীবন্ত ইতিহাস:** জাদুঘরগুলি ঐতিহ্যবাহী বিষয়, নানাবিষয় বিবর্তন, পরিবর্তনের গতিপথ, পর্দার আড়ালের কাহিনীগুলো স্বযত্নে সংরক্ষণ করে। ফলে এটি রিসোর্স সমৃদ্ধ ক্লাসরুমে পরিণত হয় যা গতানুগতিক ক্লাসরুমের চেয়ে ভিন্ন কিছু। বিজ্ঞান জাদুঘরে ইতিহাস সাক্ষী দেয় উদ্ভাবনের, যা শিক্ষার্থীর উপর বিশাল প্রভাব ফেলে। মানব জাতির কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের ও বিজ্ঞানীদের কীর্তিসমূহের ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধিতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ হবে না, তবে প্রদর্শনীতে ফলকগুলি পড়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হলে বিজ্ঞানের ইতিহাস জানতে উৎসাহিত হবে এবং সেইসব ঘটনার গভীরে প্রবেশের আগ্রহ জন্মাবে।

- **গল্পের ভান্ডার :** শিক্ষার্থীদের জাদুঘর দেখার সুযোগ দিলে প্রদর্শনীর মধ্যে হেঁটে গল্প বলার গুরুত্ব শিখতে পারবে। জাদুঘরগুলি নানা গল্পে পূর্ণ, শিক্ষার্থীরা গল্প পড়তে, শুনতে, বলতে এবং গল্প থেকে আবিষ্কার করতে ভালবাসে। জাদুঘরে বলা গল্পগুলি শিক্ষার্থীদের কেবল ইতিহাসকে শিক্ষা দেয় না সহানুভূতিশীল হতেও উৎসাহীত করে।
- **তুলনা এবং প্রতিযোগিতা:** বিজ্ঞান জাদুঘরগুলিতে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় এবং ইভেন্টের মধ্যে তুলনা করতে পারে, মিল অমিল খুঁজে বের করতে পারে, আন্তঃসর্ম্পক তৈরি করতে পারে। এতে উচ্চতর সমালোচনামূলক দক্ষতা অর্জন করে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিখন কে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করে।
- **জিজ্ঞাসাকে উৎসাহিত করে:** জাদুঘর পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের মনে নানা প্রশ্ন তৈরি করে যা কৌতুহলের দরজার খুলে দেয়। কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে, কিছু প্রশ্নের উত্তর নাই, কিছু প্রশ্ন তাকে নতুন চিন্তায় উৎসাহিত করে, কিছু প্রশ্ন তার মধ্যে আগ্রহ জাগায়। শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের প্রশ্নকে উৎসাহিত করা উচিত। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর, যুক্তি, তাঁদের বিশ্বাস গুলো শোনা প্রয়োজন। এতে তাঁদের চিন্তার দুয়ার খুলবে।
- **ভাষা উন্নয়ন ও বিকাশ:** একটি জাদুঘর পরিদর্শন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ভাষা উন্নয়নে সহায়তা করে। শিক্ষক তার বক্তৃতাতেও বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত শব্দ সমূহ চমৎকার ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। নতুন শব্দ অনুসন্ধান করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। ভাষা উন্নয়নে শব্দগুলি শনাক্তকরণ এবং বস্তুর সাথে সর্ম্পক তৈরিতে শিক্ষার্থীরা মানসিক ভাবে সমর্থ হবে। নতুন ধারণা তৈরি এবং ধারণাগুলির প্রকাশে উচ্চ স্তরের শব্দভান্ডার বিষয়টিকে আনন্দদায়ক এবং সহজ করবে।
- **নতুন ধারণা তৈরিতে উৎসাহ দেয়:** পূর্ব জ্ঞানের অভাব শিক্ষার্থীদের যাদুঘরের আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাৎক্ষনিক উদ্বুদ্ধ করে না। একটি জাদুঘর দেখার জন্য মানসিকভাবে নানা বিষয়ের মধ্যে প্রবেশে কিছুটা সময় নেয় এবং কোন একটি ইভেন্ট যার কিছুটা ধারণা তার ছিল যা তাকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। যাদুঘরের তথ্যের সঙ্গে মানসিকভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। পূর্বের ধারনার সাথে নতুন ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণ নতুন ধারণা তৈরিতে উৎসাহ যোগায়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, নতুন ধারণা তৈরির প্রেক্ষাপট তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছুর সাথে পরিচিত হয় যা সে পূর্বে দেখেছে অথবা দেখেনি কিন্তু বিষয়ের গভীরে প্রবেশের সুয়োগ পায়নি। ফলে ধারণার নব জাগরণ ঘটে।
- **অনুপ্রেরণা যোগায়:**শিক্ষার্থীরা যখন যাদুঘরে বাড়ির তুলনায় লম্বা একটি প্রাণী, যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গ্রহে হেঁটেছে অথবা গভীর সমুদ্রে সাঁতরে বেড়িয়েছে তার কঙ্কাল দেখে, তখন অবাক হয়ে যায় । প্লেনেটরিয়ামে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে সৌর জগতের আলোর প্রকৃতি আর গ্রহমন্ডলীর নকশা। যাদুঘরগুলি শিক্ষার্থীদের আশ্চর্য হতে অনুপ্রাণিত করে, কল্পনার বহির্জগৎ-এর সম্ভাবনার স্বপ্নগুলি শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। আকাশ পর্যবেক্ষণ এর মত প্রোগ্রাম নক্ষত্রমন্ডলীকে জানার অনুপ্রেরণা যোগায়।
- **সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে:** জাদুঘর সময় সময় শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কিছু প্রোগ্রাম তৈরি করে, যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এ-প্রোগ্রামের সাথে মিল রেখে অথবা অনুরোধের মাধ্যমে জাদুঘর পরিদর্শনে গেলে গাইডের সাহচার্যে বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়।বিজ্ঞান যাদুঘরের কার্যক্রমগুলি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজে গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করে।
- **পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে:** শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পরিদর্শনে গেলে বাড়িতে একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবার হিসাবে জাদুঘর পরিদর্শনের ফলে প্রতিটি সদস্য অন্যদেরকে আরও ভালভাবে জানার ও অর্থপূর্ণ কথোপকথনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। যাদুঘরগুলি কেবলমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক দর্শকদের জন্যই সকল আয়োজন করে না। তারা জানে যে যাদুঘরগুলি উপভোগ করে এমন শিশুরা পরিণত হবে এবং সমাজের জন্য কাজ করবে। কিছু জাদুঘরে পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট দিনে পরিবার উপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেখানে এমন আনেকগুলো এক্টিভিটি থাকে যা পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় ও সদস্যদের বিজ্ঞানমনস্ক করতে সাহায্য করে।
- **জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী তৈরি করে:** শিক্ষার্থীর জাদুঘরের পরিদর্শন আবার ও তাকে জাদুঘরের আসার জন্য উৎসাহিত করে। পরিবর্তিত জগতের বাস্তবতা হচ্ছে যে, চাহিদাগুলি পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আমাদের নতুন কিছু জানার প্রয়োজন হয়। এটি জীবনব্যাপি শিক্ষার্থী তৈরি করছে। যদিও অধিকাংশ ব্যক্তির কর্মজীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। শিশুদের কৌতূহলকে উৎসাহিত করে, জাদুঘরগুলি শিশুদের জীবনব্যাপি শিক্ষার্থী হওয়ার প্রেরণা যোগায় । জাদুঘরগুলি পরিদর্শনে প্রতিবার নতুন আঙ্গিকে নতুন কিছু জানা যায় এবং নব ধারণায় নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। ফলে বার বার জাদুঘরে ফিরে আসতে হয়। এভাবেই জাদুঘর জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী তৈরি করে।
- **পাঠ অনুধাবন:** শিক্ষার্থী জাদুঘর পরিদর্শনে বিজ্ঞানের পাঠ সহজে আত্মস্থ করতে পারে। বিজ্ঞানপাঠে ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানাকার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখনে এবং বিজ্ঞান অনুসন্ধান মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

৩.৩ বিজ্ঞান যাদুঘর পরিদর্শন, তথ্যপ্রযুক্তির মেলা, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান ক্লাব

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান জাদুঘর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বসহ এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা। এতে বিজ্ঞানে আগ্রহী ও কৌতুহল সৃষ্টি করা বিজ্ঞান অনুসন্ধানে জনপ্রিয় করা এবং প্রযুক্তির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রধান কাজ। তাছাড়া পেশাদার বিজ্ঞানী, অপেশাদার বিজ্ঞানী এবং সাধারণ লোকজনের চাহিদা মেটাতে পারে। বিজ্ঞান জাদুঘর এক ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র। এতে-

- শিক্ষার্থীরা বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয়
- বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী করে তোলে
- শ্রেণি কক্ষের শিখনের সাথে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করার সুযোগ ঘটে
- বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক গড়ে উঠতে সহায়তা করে
- বিজ্ঞান ভালভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি করে
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সামর্থ্য করে তোলে
- বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে

বাংলাদেশে বিজ্ঞান জাদুঘর এর নাম হলো জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। একমাত্র এই জাদুঘর আগারগাও, ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে তদানিন্তন সরকারে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক জাদুঘর এর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

- জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং এ জন্য স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনি ব্যবস্থা করা।
- বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
- স্কুল ও কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন প্রদর্শনির মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ইতিহাস তুলে ধরা।
- দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্যে, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করা।
- বিজ্ঞান শিক্ষার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- প্লানেটেরিয়ামের মাধ্যমে মহাকর্ষ বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) গ্যালারী প্রদর্শন
খ) শিক্ষা কার্যক্রম
গ) প্রকাশনা

ক) গ্যালারী প্রদর্শন : এ জাদুঘরে সাতটি গ্যালারী রয়েছে। গ্যালারীগুলো হলো:

১. ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারী
২. শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারী
৩. জীব বিজ্ঞান গ্যালারী
৪. তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারী

৫. মজার বিজ্ঞান গ্যালারী-১
৬. মজার বিজ্ঞান গ্যালারী-২
৭. মহাকর্ষ বিজ্ঞান গ্যালারী

তাছাড়া রয়েছে সায়েন্স পার্ক, আকাশ পর্যবেক্ষণ, মান মন্দির এবং বিজ্ঞান গ্রন্থাগার। শক্তিশালী টেরিস্কোপের সাহায্যে প্রতি শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে টিকিটের বিনিময়ে চাঁদ, শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, শনিগ্রহ, বৃহস্পতি, এ্যান্ডোমিডা, গ্যালাক্সী, সেভেন সিস্টার, জোড়া তারা ও তারার ঝাক পর্যবেক্ষণ করা যায়। বৃহস্পতিবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে অভিজ্ঞ গাইড কর্তৃক গ্যালারী প্রদর্শনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

খ) শিক্ষা কার্যক্রম

- নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী, বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ অংশগ্রহণ করে থাকে।
- বিজ্ঞান সম্পর্কিত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনের আয়োজন করে।
- বিজ্ঞান পাঠ্যবই সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত বিষয়ের উপর অনুরোধ সাপেক্ষে বিশেষ প্রদর্শন ও আলোচনার আয়োজন করে থাকে।
- ভ্রাম্যমান জাদুঘরের মাধ্যমে (বাসের মাধ্যমে) সারাদেশে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

গ) প্রকাশনা

মিনি বিজ্ঞান জাদুঘর গড়ে তোলা

প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের বাইরে যে কোনো সুবিধা মতো স্থানে মিনি বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ জন্য বিজ্ঞানের শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সার্থক বিজ্ঞান জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য করণীয় সমূহ-

প্রথম ধাপ : মিনি বিজ্ঞান জাদুঘর গঠনের উদ্দেশ্য কী হবে তা স্থির করা।

দ্বিতীয় ধাপ : বিজ্ঞান জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য কোনো বস্তু রাখবে তার তালিকাসহ সংগ্রহ করার কৌশল নির্ধারণ করা। প্রদর্শনীর জন্য বস্তু ছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জন্ম ও মৃত্যু, তার বিশেষ অবদান সম্বলিত ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং বিজ্ঞানমেলার প্রদর্শনির বিভিন্ন প্রজেক্ট রাখা যতে পারে।

তৃতীয় ধাপ : সংগৃহীত জিনিসপত্র ও প্রদর্শন কীভাবে সজ্জিত করবেন তার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করা।

চতুর্থ ধাপ : এ মিনি সংগ্রহশালা কীভাবে ব্যবহার এবং টেকসই করা যায় তার একটি ধারণা পত্র বা প্রতিবেদন তৈরি করা। যন্ত্রপাতি, ছবি ও মডেল তৈরিতে অর্থের প্রয়োজন হবে। বেসরকারী তহবিল গঠনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞান জাদুঘর গঠনে বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রচেষ্টা ও ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে হবে। তবে এ মিনি বিজ্ঞান জাদুঘর গঠন করা সম্ভব। এতে শ্রেণিকক্ষের বাইরে জীববিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রম দৃঢ় ও মজবুত হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির মেলা

বর্তমান যুগ হলো তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বগ্রামের ভূমিকা অতীব গুরত্বপূর্ণ। মার্শাল ম্যাকলুহানের মতে " বিশ্ব গ্রাম হল একটি ইলকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যম, যা বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করেছে এবং যেখানে মানুষ একটি সমাজে বসবাস করে অতি সহজে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।" যুগের চাহিদানুযায়ী বিশ্ববাসী উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনছে । এই পরিবর্তনের জোয়ারে সকলের অংশগ্রহণ অতীব গুরত্বপূর্ণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্য নিম্নরূপঃ "১৯. (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" সংবিধানের এই মূল্যবোধ সঞ্চারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আপামর জনসাধারণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী হলেই এর উপকারভোগী হয়ে যাবে । এটি একটি সম্বন্নিত প্রক্রিয়া, যেখানে সকল নাগরিকই এর অংশিজন। দেশের পশ্চাদপদ এলাকায় আইসিটি সুবিধা পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রশাসন সহ সকল খাতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনসেবার গুণগতমানও বহুলাংশে বেড়ে যাবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। এর বিভিন্ন সৃজনশীল প্রয়োগে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলেই প্রযুক্তি আত্মীকরণ হবে। তথ্যপ্রযুক্তি মেলা এমন একটি ফ্লাটফর্ম যেখানে সকল স্তরের জনসাধারণ জানতে, দেখতে ও বুঝতে পারেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির হালনাগাদ অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রশাসন সহ নানাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার। জনসাধারণ জানতে পারে প্রযুক্তিবিদদের চিন্তা চেতনা, দেখতে পায় তরুণদের অগ্রযাত্রা। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও শিশু-কিশোর সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক সংস্থাসহ ব্যক্তি বিশেষও তথ্যপ্রযুক্তির প্রায়োগিক দিক, উন্নয়নের ক্ষেত্র, সৃজনশীল ব্যবহার, সম্ভাব্য পরিবর্তন রুপরেখা, সেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো মেলায় নানা ভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পায়। প্রযুক্তিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রযাত্রা তুলে ধরা হয় মেলায়। ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স, মোবাইল ইনোভেশন, সফটওয়্যার, শোকেসিং এবং স্টার্টআপ জোন সংযুক্ত করে মেলার দিগন্তকে প্রসারিত করা যায়। উন্নয়ন সহযোগীদের এর সাথে সম্পৃক্ত করে আমরা বিশ্বগ্রামে ছড়িয়ে পরতে পারি। পরমুখাপেক্ষিতা হ্রাস করতে তথ্যপ্রযুক্তির জুড়ি নাই।

তথ্যপ্রযুক্তির মেলায় বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করণ

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। একবিংশ শতাব্দিতে শিক্ষকতা করতে হলে নানাবিধ নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে শিক্ষার বহুমুখী কাজে নানা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সৃজনশীল হতে হবে। এর জন্য যেমন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তেমনি ভাবে তথ্যপ্রযুক্তির নানাবিধ পরিবর্তন ও প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ করে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি মেলা শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধকরার একটি সুযোগ তৈরি করে দেয়।

মেলায় তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে কী কাজ করা হয়, কী কী পরিবর্তন এসেছে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী তা উপস্থাপন করা যায়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজ ও প্রজেক্ট দেখানো যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনাচক্র, বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে নতুন চিন্তা-চেতনায় ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। কর্মজীবনে প্রযুক্তি-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে তথ্যপ্রযুক্তি-মেলার অভিজ্ঞতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার বাৎসরিক ক্যালেন্ডারে তথ্যপ্রযুক্তি মেলার জন্য সময় নির্ধারণ করে মেলার আয়োজন করতে পারে ।

বিজ্ঞান মেলা

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী বা মেলার আয়োজন করা হয়। একুশে বই মেলা, বাণিজ্য মেলা, কর মেলা, শিল্প মেলা ইত্যাদি। কিছু কিছু মেলা যেমন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু মেলা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের পথে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এরূপ একাট মেলা হল 'বিজ্ঞান মেলা' বা 'বিজ্ঞান প্রদর্শনী'। বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয় নির্দিষ্ট কতকগুলো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তির প্রয়োগ, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের কাজ, চিন্তা-চেতনা ও উদ্ভাবনী শক্তি জনসাধারণকে ও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করাই বিজ্ঞান মেলার প্রধান লক্ষ্য। পরস্পর সহযোগিতা, ভাব-বিনিময় ও মানুষের সার্বিক মঙ্গল আকাঙ্খায় বিজ্ঞানের অবদান কাজে লাগাতেই বিজ্ঞান প্রদর্শনী বা মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান মেলা

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি কৌতুহলী, অনুসন্ধিৎসু ও বিজ্ঞান মনস্ক করে গড়ে তোলার উৎকৃষ্ট উপায় বিজ্ঞান মেলা। বিজ্ঞান মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরীদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও বৈজ্ঞানিক কাজে উৎসাহিত করা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা, ধারণার প্রয়োগ এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মেলায় দেখানো হয়। মেলায় শিক্ষার্থীদের নিজেদের করা বৈজ্ঞানিক কাজ কর্ম প্রর্দশন ও উপস্থাপন করার সুযোগ পায়, ফলে তারা আত্মতৃপ্তি এবং কর্ম সম্পাদনের তৃপ্তি অনুভব করে। মেলায় অন্য শিক্ষার্থীদের কাজ দেখে বিশেষজ্ঞ বিচারক এবং অন্যান্য বয়স্ক বিজ্ঞানীদের সাথে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় আলাপ-আলোচনা করে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের মনে কৌতুহল সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান মেলায় যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পুরুষ্কার পায় তাদের এই প্রেরণা পরবর্তী জীবনে সফল শিক্ষার্থী হতে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের কার্যক্রম প্রর্দশন ও উপস্থাপনের জন্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে, ফলে ক্রিটিক্যাল চিন্তন ক্ষমতা বাড়ে এবং বিষয়ের গভীরে উপলব্দি বিস্তৃত হয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রতি বছরে অন্তত একবার বিজ্ঞান মেলার ব্যবস্থা করা দরকার। সম্ভব হলে কাছাকাছি কয়েকটি বিদ্যালয়ে যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করলে মেলাটি আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়। অন্যান্য বিজ্ঞান মেলার তুলনায় বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলার শিক্ষাগত মূল্য অধিক। যে কোন বিজ্ঞান মেলা আয়োজনের পূর্বে বিজ্ঞান মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে এবং আয়োজক কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। মেলাকে অর্থবহ করার জন্য এবং বৈচিত্র আনার জন্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে। বিজ্ঞান মেলাটি বিদ্যালয় পর্যায় সংগঠিত হলে একটি অংশে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রজেক্ট উপস্থাপন করতে হবে, যেন শিক্ষার্থীদের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ধারণা স্পষ্ট হয়। এতে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ভীতি কমবে, পাঠ মনোযোগী হবে, আগ্রহ বাড়বে। অন্য দিকে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারকে প্রত্যক্ষণ করবে ফলে বিজ্ঞান পাঠ অর্থহীন মনে হবে না। শিক্ষার্থী কর্তৃক কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ধর্মী কাজ, গবেষণা কিংবা সমস্যা সমাধানের ধারণার বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আকারে (আয়োজক কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত রুপরেখানুযায়ী) লিখতে হবে। এ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ধর্মী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরি করবে। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরি হবে। বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে গল্প, কবিতা, ছড়া,কৌতুক, ধাঁধাঁ, বিজ্ঞানের চমকপদ কাহিনী, বিজ্ঞানের কল্প কথা, ছবিতে বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ম্যাগাজিন, পত্রিকা অথবা দেয়ালিকা প্রকাশ করা যায়। মেলাকে ঘিরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, পোষ্টার-ব্যানার প্রস্তুত প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, আমন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতে পারে।

বিজ্ঞান মেলার উদ্দেশ্য

- বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুর সাথে জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা।
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দেয়া।
- বিজ্ঞানের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ও বৈজ্ঞানিক কাজে উৎসাহিত করা।
- বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞান চর্চায় শখ সৃষ্টি করা।
- হাতে-কলমে কাজ করার ও যৌক্তিক ভাবে উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি করা।
- প্রতিভা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণের বিকাশ করা।
- মানসিক চাপের মধ্যে দলীয়ভাবে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজের সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ করা।
- সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড একটি আন্তর্জাতিক/জাতীয় অলাভজনক সংস্থা যা বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও টেকনোলোজি শিক্ষায় অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নিবেদিত। এই লক্ষ্য অর্জিত হয় শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম, গবেষণা, প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে এবং উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রতিযোগিতাকে (বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্ট) উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড জটিল ও কঠিন একাডেমিক আন্তসম্পর্কীয় দলীয় ইভেন্টগুলির একটি ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা, যার জন্য শিক্ষার্থীরা বছরব্যাপী প্রস্তুতি নেয়। সমস্ত ইভেন্টে দলবদ্ধতা, গ্রুপ পরিকল্পনা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। যেখানে শেখা, অংশগ্রহণ, মিথস্ক্রিয়া এবং মজাদার দলীয় কাজের উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণা ব্যবহার করে সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তাদের নিয়োজিত করে। এই চ্যালেঞ্জিং এবং প্রেরণাদায়ী ইভেন্টগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে (জীববিজ্ঞান, ভূ- বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি) সুষম অবস্থা তৈরি করে। উপরন্তু, কর্ম-সূচির মধ্যে অনেক মজার কার্যক্রম সংযোজিত হয় যেখানে হোস্ট প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকে, আলোচনা ও প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানীদের বৈচিত্রময় জীবনী ও কর্ম উপস্থাপিত হয়। পৃথক ভাবে বিষয় ভিত্তিক অলিম্পিয়াড হতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞানের মত ভাষা, সাহিত্য, ব্যবসা ইত্যাদি বিষয় অলিম্পিয়াডের সূচনা হয়েছে। এখন জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বিস্তৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্টে যে দেশগুলো অংশগ্রহণ করে তাদের শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে যায়। ফলে তাদের দক্ষতা অসামান্য উৎকৃষ্টতায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অলিম্পিয়াড ধারাবাহিক ভাবে জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ মানব দল তৈরি করে, তেমনি ভাবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বিশ্ব ব্যাপি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কার্যকরভাবে প্রজ্জ্বোলীত করে। ভবিষৎতে পরিবর্তনশীল পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য অনির্ধারিত সমস্যার সমাধানে একদল দক্ষ লোকের যোগান দেয়ার জন্য বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড অনন্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশেও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্টে শ্রেষ্ঠ দলসমূহ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি বাড়ানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একধরনের সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি করে। আমাদের সকলকেই বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের প্রচার এবং প্রসারের জন্য সক্রিয় ভাবে কাজ করতে হবে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড শিক্ষায় পরিবর্তন ঘটতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয় এবং প্রকল্প, কার্যক্রম এবং সমস্যার সমাধান সহ শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টার উপর আরো বেশি গুরুত্ব দিতে উৎসাহীত করে।

পৃথিবীর নানা দেশে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড তৃণমূল থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমস্যা সমাধানের জন্য নানা দল তৈরি করে। দলকে কঠিন সমস্যার মোকাবেলায় , মান-ভিত্তিক চ্যালেঞ্জ এর প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। যেখানে বিজ্ঞান, কারিগরী, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) এর মত পরিবর্তনশীল বিষয়ে নানা ধরনের ইভেন্ট থাকে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড শিক্ষার্থীদের সামনে এ বিষয়গুলো নিয়ে আসে যেন তারা বৈজ্ঞানিকের মত আচরণ করে এবং নিজের ক্যারিয়ার নির্বাচনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভবিষৎ কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিষয়গুলো নির্বাচন, দলের আকার আকৃতি নির্ধারণ, বিশেষ ইভেন্ট সংযোজন, অপ্রতিযোগীতামূলক টুর্নামেন্টের আয়োজন, মজার দিন (Fun day), হাতে কলমে বিজ্ঞান, মজার রাত (Fun night) বা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রদর্শন ইত্যাদি এক-এক দেশে এক-এক রকম হয়ে থাকে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, বাবা-মা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও ব্যবসায়ী নেতারা একসঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে যৌথ লক্ষ্যের দিকে কাজ করে। জিনতত্ত্ব, রসায়ন, শরীরবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তির সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির প্রতিফলন আনতে ও চিন্তনকে উৎসাহ দিতে প্রতিবছর কার্যক্রমে একটি অংশ রাখা হয়। নানা প্রকৃতির ইভেন্টের মিশ্রনের মাধ্যমে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞান সম্পৃক্ত ক্যারিয়ারে টিম ওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বৈজ্ঞানিক পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য দলগত ভাবে সক্রিয় হয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ এবং নানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেয়। এটি একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে যা জীবনকাল স্থায়ী হয়।

বিজ্ঞান ক্লাব

নটরডেম বিজ্ঞান ক্লাব বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব। ফাদার আর. ডব্লিউ. টিম, সি.এস.সি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। " মানুষের সেবায় বিজ্ঞান" এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য। ২০০৫ সালে এর ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ৩টি কুইজ টিম - এনডিসি গোল্ড, এনডিসি ব্লু ও এনডিসি গ্রিন নটরডেম বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুলে 'অগ্রণী বিজ্ঞান সঙ্ঘ" নামে বিজ্ঞান ক্লাব গঠিত হয়। বর্তমানে দেশের নানা স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, পাড়ায়-মহল্লায় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গ এ সকল ক্লাবের সদস্য।

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সাল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জাতীয়ভাবে প্রতিবছর জেলা পর্যায় এবং কেন্দ্রিয় পর্যায় বিজ্ঞান সপ্তাহের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে এটি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর খুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্প সমূহ বিজ্ঞান সপ্তাহে প্রদর্শিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ক্লাব পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি থাকে। কার্যকরী কমিটিতে যে-সব পদ থাকে সেগুলো হলো:

- সভাপতি
- সহ-সভাপতি
- সম্পাদক
- কোষাধক্ষ্য
- অনুষ্ঠান প্রধান

এসব পদ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে পূরণ করা হয়। কার্যকরী কমিটিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বিজ্ঞান শিক্ষক উপদেষ্টা হিসাবে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষক সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তাঁরা বিজ্ঞান ক্লাবের জন্য একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করেন।

বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য: কার্যকরী কমিটি নানা দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে। বিষয় ভিত্তিক বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সকল বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য এক রকম না হলেও কাছাকাছি হয়। সাধারণত নিচের উদ্দেশ্য গুলো সামনে রেখে বিজ্ঞান ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়।

- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা
- আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ তৈরি করা
- সারা দেশের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা
- অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহনের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা
- শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানো
- বিজ্ঞান শিক্ষাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া

বিজ্ঞান ক্লাবের কাজ :

- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ, বিজ্ঞান বিষয়ক বুলেটিন বোর্ড, বিজ্ঞান বক্তৃতামালা, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান বিষয়ক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা।
- শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ তৈরি জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নানা রকম সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধানের জন্য গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া।
- সারা দেশের ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ইন্টারনেট, ফোন এবং চিঠি-পত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা বিনিময় করা এবং সামষ্টিকভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা।
- শিক্ষার্থীদের অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহনের জন্য অলিম্পিয়াডের নানা ইভেন্টের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির সুযোগ তৈরি করা।
- অতিথি এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালা, আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করা।
- বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ,পরিবেশগত পরিবর্তন এবং ইকোলজি পর্যবেক্ষণের জন্য ফিল্ড-ট্রিপ এর ব্যবস্থা করা।
- স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-উপকরণ তৈরি করা।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড জানানোর জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডকুমেন্টারী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
- বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।
- বিজ্ঞান বিষয়কে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা।
- বিজ্ঞান ক্লাব সংক্রান্ত খবরাখবর নোটিশ বোর্ডে হালনাগাদ রাখা।
- দেশী-বিদেশী সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।
- ক্লাবের বিজ্ঞান বিষয়ক কার্যক্রম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

বিজ্ঞান ক্লাবের গুরুত্ব :

- বিজ্ঞান ক্লাবের শিক্ষার্থীদেরকে কাজের প্রতি আগ্রহী ও পাঠে মনোযোগী করা যায়।
- বিজ্ঞান বিষয় বিভিন্ন উপকরণ ও প্রজেক্ট তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্মাণ-কৌশল ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
- তাদের মধ্যে কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব গড়ে উঠবে।
- বিজ্ঞান বিষয়ক লেখায় আগ্রহী হয়ে উঠবে।
- সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১) 'অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি জিজ্ঞাসার দ্বার খুলে দেয়'-ব্যাখ্যা করুন।

২) প্রদর্শন পদ্ধতি ও হাতে কলমে শিখনের পার্থক্য লিখুন।

৩) প্রচলিত প্রবাদ 'I hear- I forget, I see – I remember, but I do – I learn' এর আলোকে বিজ্ঞান শিক্ষায় কোন পদ্ধতিগুলো কার্যকর তা উল্লেখ করুন।

৪) শিক্ষার্থীর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা কীভাবে জীববিজ্ঞান শিখনে প্রভাব বিস্তার করে কার দুটো উদাহরন দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১) বিতার্কিকের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিজ্ঞান চর্চায় বিতর্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন ?

২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, তথ্যপ্রযুক্তি-মেলার লক্ষ্য ও সার্বিক উদ্দেশ্য উল্লেখ করে, তথ্যপ্রযুক্তি-মেলা উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা তৈরি করুন ।

৩) "বিজ্ঞান জাদুঘর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসার দ্বার খুলে দেয়"-তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৪) বিজ্ঞান মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মেলার ব্যাপকতা, স্থান, সময়, স্থিতিকাল, বাজেট, ইভেন্ট, কর্মবন্টন, মূল্যায়ন, নিরাপত্তা, সৌচাগার ব্যবস্থাপনা, বিচারক, অতিথি, উদ্বোধন,সমাপনী, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

References:

১.দ্বন্দ্বসূত্র, বিরূপাক্ষ পাল, পড়ুয়া, ৪৫ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, প্রকাশকাল:২০০২ খ্রি:

২.বির্তকের সরল পাঠ, শামীম আল আমিন সম্পাদিত, সময় প্রকাশন, ৩৮/২ বাংলাবাজার,ঢাকা, প্রকাশকাল:২০০৬ খ্রি:

৩.শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা (মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, বিজ্ঞান), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল:এপ্রিল ২০১৭ খ্রি:

৪.জীববিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন,ঢাকা, প্রকাশকাল:জুন ২০০০ খ্রি:

৫.নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষকগণের ২৪ দিদের বিষয়ভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- জীববিজ্ঞান, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন পজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, প্রকাশকাল:জুন ২০১৬ খ্রি:

৬.মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি এড) বিজ্ঞান শিক্ষণ(মডিউল ১ ও ৩), টিচিং সেকেন্ডারী এডুকেশন পজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিকাদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৮ খ্রি:

7.Becoming a secondary School Science Teacher, Leslie W. Trowbridge & Rodger W. Bybee, Merrill Publising Company, A bell & Howell Compay, Columbus, Ohio 43216, Published 1986.

9.www.soinc.org/history.

১০.হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬ খ্রি:

ইউনিট ৪ : জীবকোষ, কোষেরগঠন, কোষ বিভাজন

কোষ (Cell) হল সকল জীবের গাঠনিক এবং কার্যকরী একক। এটি জীবের ক্ষুদ্রতম জীবিত একক, অর্থাৎ একটি কোষকে পৃথকভাবে জীবিত বলা যেতে পারে। এজন্যই একে জীবের নির্মাণ একক নামে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ জীবই বহুকোষী। মানব দেহে প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ রয়েছে। একটি কোষের আদর্শ আকার হচ্ছে ১০ মাইক্রোমিটার এবং ভর হচ্ছে ১ ন্যানোগ্রাম। চূড়ান্ত কোষ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ১৮৩৭ সালে চেক বিজ্ঞানী Jan Evangelista Purkyňe অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদ কোষ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ছোট ছোট দানা লক্ষ্য করেন। ১৮৩৯ সালে বিজ্ঞানী Mathias Jakob Schleiden এবং Theodor Schwann কোষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তাদের তত্ত্বে বলা হয়, সকল জীবিত বস্তুই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত এবং সব কোষই পূর্বে অস্তিত্বশীল অন্য কোন কোষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। জীবের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ সব ক্রিয়াই কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। সকল কোষের মধ্যে কার্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বংশগতীয় তথ্য এবং পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে। কোষ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ সেল (cell)। সেল শব্দটি লাতিন শব্দ সেলুলা থেকে এসেছে যার অর্থ একটি ছোট্ট কক্ষ। এই নামটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক। ১৬৬৫ সালে তার প্রকাশিত একটি গ্রন্থে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণকৃত কর্ক কোষের কথা উল্লেখ করেন। এই কোষের সাথে তিনি ধর্মীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘরের তুলনা করেছিলেন। এ থেকেই জীবের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক ও কার্যকরি এককের নাম দিয়ে দেন সেল।

প্রতিটি জীবদেহ কোষ দিয়ে গঠিত । একটি মাত্র কোষ দিয়ে প্রতিটি জীবন শুরু হয় । যে সকল জীবের দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত এদের বলা হয় এককোষী (unicellular) জীব। যেমন ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, অ্যামিবা, প্রভৃতি। এসব জীব বিভাজনের মাধ্যমেই একটি কোষ থেকে অসংখ্য এককোষী জীবে পরিণত হয়। আবার অনেক জীব একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। এদের বলা হয় বহুকোষী (multicellular) জীব। মানুষ, আম গাছ, বট গাছ ইত্যাদি জীব কোটি কোটি কোষ দিয়ে গঠিত।

জীব দেহের গঠন ও কাজের একক কে কোষ বলে। **কোষ হলো জীবদেহের এমন একটি আবরনীবদ্ধ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে জীব তার সামগ্রিক কাজ সম্পাদন করে, নতুন কোষ সৃষ্টি করে এবং জীবের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশে অংশগ্রহন করে জীবজগতকে পরিনতি লাভের মাধ্যমে ক্রম বিবর্তনে সহায়তা করে**। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

৪.১ জীবকোষ, কোষ অঙ্গানু, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম
৪.২ মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজন: প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

৪.১ জীবকোষ, কোষ অঙ্গানু, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে কোষ বিদ্যা বা সাইটোলোজি বলা হয়। Cytology শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের Kytos (cell, ফাঁপা) এবং logos(discourse, আলোচনা) সমন্বয়ে গঠিত। A.G Loewy এবং p. Siekevitz (1963)এর মতে কোষ হল একটি অধ্যভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত জীবের সকল জৈবিক কার্যাবলীর একক এবং যা অন্যকোন জীবন্ত মাধ্যম ছাড়াই স্ব-প্রজননে সক্ষম। তবে এ সংগা দ্বারা ভাইরাসকে কোষের অন্তর্ভূক্ত করা যায় না কারণ ভাইরাস কোন অধ্যভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত নয় এবং কোন জীবন্ত মাধ্যম ছাড়া এরা বংশবৃদ্ধিতেও সক্ষম নয়।

কোষের বৈশিষ্ট্য

- জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় গাঠনিক ও আনবিক উপাদান কোষে থাকে।
- প্রয়োজনীয় কাঁচামাল গ্রহন করতে পারে।
- কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারে ।
- নিজের প্রয়োজনীয় অনুগুলোকে সংশ্লেষন করতে পারে।
- সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে উঠতে পারে।
- চারপাশের যে কোন উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে পারে।
- এটি হোমিয়স্ট্যাটিক অবস্থা বজায় রাখতে পারে।
- এটি কাল পরিক্রমায় অভিযোজিত হতে পারে।

কোষতত্ত্ব : জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী M.J. Schleiden এবং প্রাণিবিজ্ঞানী Theodor Schwann (১৮৩৯) খ্রি. মতবাদ ব্যক্ত করেন যে কোষ হল জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। তারা কোষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেন যা কোষ মতবাদ বা কোষ তত্ত্ব নামে পরিচিত। পরবর্তিতে এই মতবাদের কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সাধিত হয়েছে। কোষ মতবাদের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হল-

১. কোষ হল জীবের গাঠনিক, কার্যগত ও শারীরবৃত্তীয় একক।
২. সকল কোষ পূর্বতন কোষ হতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।
৩. জীবের সকল বিপাকীয় কার্যাবলী কোষের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়।
৪. কোষ বিভাজনের সময় এক কোষের বৈশিষ্ট্য অন্য কোষে সঞ্চারিত হয়।
৫. সকল জীবই এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত।

যাহোক জীব কোষ বলতে শুধু উদ্ভিদ বা শুধুই প্রাণী কোষকে বুঝায় না বরং উভয় কোষকেই বুঝায়। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই এ আণুবিক্ষণীক একক দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষে তাদের গঠনগত যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি তাদের কাজের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। এমনকি উচ্চ (প্লান্টি গোত্র) শ্রেণির উদ্ভিদের কোষের গঠন ও নিম্ন শ্রেণির (মনেরা গোত্র) কোষের মধ্যে গঠনগত বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এ গঠনগত পার্থক্যের কারণে উদ্ভিদ কোষকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আদি কোষ।
২. প্রকৃত কোষ।

যে কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না তাকে **আদি কোষ** বলে। যে কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে তাকে **প্রকৃত কোষ** বলে। এখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বলতে সেই নিউক্লিয়াসকে বুঝায় যে নিউক্লিয়াসের চারটি গঠনগত উপাদানই যথাঃ নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয়প্লাজম ও ক্রোমাটিন তন্তু রয়েছে। এ ছাড়া প্রকৃত কোষে পর্দা আবৃত কোষ অঙ্গানু যেমন মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাষ্টিড, বাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি রয়েছে। আদিকোষে নিউক্লিয়ার বস্তু হিসেবে ডিএনএ অথবা আরএনএ থাকে। রাইবোসোম বাদে অন্যান্য কোষ অঙ্গানু থাকেনা। **আদি কোষ অনেকটা স্বাধীন কিন্তু প্রকৃত কোষ বহুকোষী জীবের মধ্যে থেকে অন্যের সাথে মিলে কাজ করে।**

জীব কোষ শুধু একটি মাত্র অঙ্গানুই নয় বরং এ কোষের ভিতরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গানু। এ অঙ্গানুগুলোর কাজগুলো ভিন্ন ভিন্ন। অর্থ্যাৎ এ অঙ্গানুগুলোও এক একটি স্বতন্ত্র কাজের একক। উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের এ কোষীয় অঙ্গানুগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই জীবদেহের কোষকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. উদ্ভিদ কোষ ও
২. প্রাণী কোষ।

প্রতিটি জীবের সকল অংশই কোষ দ্বারা গঠিত। তবে বিভিন্ন অংশের গঠনগত ও কার্যগত বিভিন্নতার কারণে কোষের মাঝে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. দেহ কোষ ও
২. জনন কোষ।

জীবের দেহ যে সকল কোষ দ্বারা গঠিত সেসব কোষসমূহকে দেহ কোষ বলে। দেহের এই কোষগুলো পরস্পর একত্রিত হয়ে কলা গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে প্রজনন কাজে সহায়তাকারী কোষ সমূহকে জনন কোষ বলে। এ কোষ সমূহ মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম নিয়ে বিভাজিত হয়ে জীবের প্রজননে সহায়তা করে।

উদ্ভিদ কোষের গঠন

পৃথিবীতে নানা ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের গঠনগত ভিন্নতার পাশাপাশি তাদেরও কোষের গঠনেরও পার্থক্য রয়েছে। এমনকি বহুকোষী উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ গুলোতে কোষগুলো কলা গঠন করে। এ বিভিন্ন রকম কলার কোষের গঠনগুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সব ধরনের কোষের মধ্যে সবসময় একই ধরনের কোষীয় অঙ্গানু নাও থাকতে পারে। যেমন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার কোষে নিউক্লিয়াস থাকলেও তা সুগঠিত নয়। অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ গুলোতে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান থাকে। আদর্শ উদ্ভিদ কোষের বাইরের দিকে একটি আবরণ থাকে একে কোষপ্রাচীর বলে। এটি মৃত আবরণ। কোষপ্রাচীরগুলোর

কিছু অংশ পরস্পর হতে উন্মুক্ত থাকে একে কূপ বলা হয়। কোষপ্রাচীরের নিচে একটি সজীব পাতলা আবরণ থাকে একে প্লাজমা মেমব্রেন বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের নিচে বিভিন্ন ধরনের কোষীয় অঙ্গানু সাইটোপ্লাজমে ভাসমান থাকে। কোষের সমস্ত কোষীয় অঙ্গানুসহ এ সাইটোপ্লাজমকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একটি ... গঠিত।

১. **কোষ প্রাচীর**
২. **প্লাজমা মেমব্রেন**
৩. **নিউক্লিয়াস**
৪. **মাইটোকন্ড্রিয়া**
৫. **প্লাষ্টিড**
৬. **গলজিবস্তু**
৭. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম**
৮. **লাইসোসোম**
৯. **মাইক্রোটিউবিউলস**
১১. রাইবোসোম
১২. কোষ গহবর

চিত্রঃ একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ

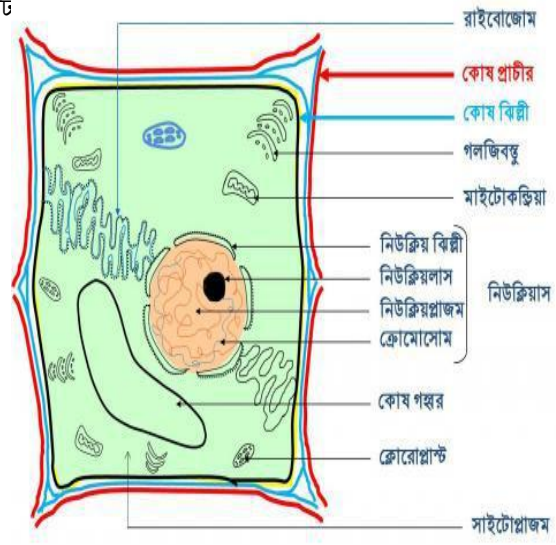

প্রাণিকোষের গঠন

প্রত্যেক প্রাণী অসংখ্য আণুবীক্ষণিক একক দ্বারা গঠিত। এই আণুবীক্ষণিক একক গুলোকে কোষ বলা হয়। এই কোষগুলো একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কলা গঠন করে। কলা হল একই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একাধিক কোষের সমষ্টি। তাই বলা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন কলার কোষের কাজ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এজন্য এক প্রাণী হতে অন্য প্রাণীতে যেমন কোষের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি কলা ও অঙ্গতন্ত্র গঠনকারী একটি প্রাণীতেও কোষ সমূহের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আদর্শ উদ্ভিদ কোষের ন্যায় প্রাণী কোষেরও বাইরের দিকে একটি আবরণ লক্ষ্য করা যায় একে প্লাজমা মেমব্রেন বলা হয়। প্লাজমা মেমব্রেন লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা তৈরি। এটি কোষের ভিতরে ও বাইরে খনিজ, পানি ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের আদান- প্রদান নিয়ন্ত্রন করে এবং কোষের আকার প্রদান করে। প্রাণিকোষের মেমব্রেন বাইরের আঘাত থেকে কোষকে রক্ষা করে। প্রাণী কোষের প্লাজমা মেমব্রেন বাইরের দিকে বিভিন্নভাবে প্রবর্ধিত হয়ে মাইক্রোভিলাই গঠন করে। তবে প্রাণী কোষে উদ্ভিদ কোষের ন্যায় প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরের দিকে কোন আবরণ বা কোষপ্রাচীর থাকে না। প্লাজমা মেমব্রেনের নিচে কোষীয় অঙ্গানুগুলো সাইটোপ্লাজমে বিন্যস্ত থাকে। সজীব সাইটোপ্লাজমসহ সমস্ত কোষীয় অঙ্গানুগুলোকে একসাথে প্রোটপ্লাজম বলে। একটি আদর্শ প্রাণীকোষে নিম্লোক্ত অঙ্গানুসমুহ লক্ষ্য করা যায়।

কোষীয় অঙ্গানু সমূহ

১. **নিউক্লিয়াস**
২. **মাইটোকন্ড্রিয়া**
৩. **মাইক্রোটিউবিউলস**
৪. **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম(মসৃন/ অমসৃন)**
৫. **রাইবোসোম**
৬. **গলজিবডি**
৭. **লাইসোসোম**
৮. কোষীয় কঙ্কাল।

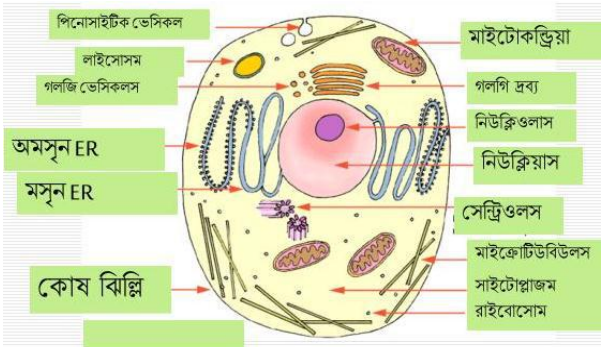

চিত্রঃ প্রাণিকোষ

কোষীয় অঙ্গানুসমুহের বর্ণনা

১.নিউক্লিয়াস

নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ অঙ্গ। একে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় কারণ বংশগতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এতে বিদ্যমান থাকে। নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিক এসিডের আধারও বলা যায়। নিউক্লিয়াসের প্রতিটি উপাদান মূলত নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত। এ সকল নিউক্লিক এসিড জনিত উপাদান সমূহ বংশগতি বৈশিষ্ট্য সমূহ এক বংশ হতে তার পরবর্তী বংশধরে নিয়ে যায়।

ইউক্যারিওটিক কোষের প্রোটপ্লাজমে বিদ্যমান গোলাকার বা ডিম্বাকার অথবা চাকতি সদৃশ, আবরণী বেষ্ঠিত যে অঙ্গানু কোষের যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে এবং জীবের জেনেটিক বস্তু ধারণ করে তাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা বলে। অধিকাংশ কোষের কেন্দ্রের দিকে একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে, তবে কোন কোন কোষ একাধিক (*Paramecium*) নিউক্লিয়াস দেখা যায়। বিজ্ঞানী Robert Brown, ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নিউক্লিয়াস আবিস্কার করেন।

ভৌত গঠন

কোষ বিভাজনের প্রস্তুতির সময় (ইন্টারফেজ দশায়) নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। নিউক্লিয়াসের বাইরের দিকে দ্বিস্তরী ছিদ্র যুক্ত একটি আবরণ থাকে একে **নিউক্লিয়ার মেমব্রেন** বলে। এ আবরণ নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর যাতায়তে সহায়তা করে এবং নিউক্লিয়াসকে নানা প্রতিকূলতার হাত হতে রক্ষা করে। তবে এ নিউক্লিয়ার মেমব্রেনগুলো নিরবিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে **নিউক্লিয়ার রন্ধ্র** বলে। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের নিচে জেলির ন্যায় আঠালো থকথকে পদার্থ লক্ষ্য করা যায় একে **নিউক্লিয়প্লাজম** বলে। এ নিউক্লিয়প্লাজমে জালিকাকারে সুতার ন্যায় তন্তু লক্ষ্য করা যায় একে ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয়। কোষ বিভাজনের সময় এ তন্তু গুলো মোটা ও স্পষ্ট হয় তখন একে ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়। নিউক্লিওপ্লাজমের কেন্দ্রের দিকের একটি অংশ অধিক ঘন, উজ্জ্বল ও গোলাকার একে **নিউক্লিওলাস** বলা হয়।

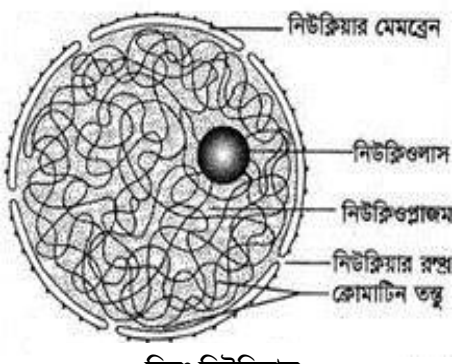

চিত্রঃ নিউক্লিয়াস

রাসায়নিক গঠন

রাসায়নিকভাবে এটি মূলত নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন নিয়ে গঠিত। এতে সাধারণত পানি, লিপিড, এনজাইম, DNA ও সামান্য RNA কিছু পরিমান কো-এজাইম ও অন্যান্য উপাদান থাকে।

কাজ

১. জীবদেহের প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা।
২. Replication প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা।
৩. DNA হতে ট্রান্সক্রিপসন পদ্ধতিতে RNA তৈরিতে সহায়তা করা।
৪. ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করা।
৫. উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যাবলী পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করা।

২.মাইটোকন্ড্রিয়া–মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের গুরূত্বপূর্ণ অঙ্গানু। কোষের শক্তি উৎপাদনের সাথে এটি জড়িত। এটি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের সহায়তায় ATP উৎপাদন করে থাকে। কোষের শক্তি উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত বলে একে কোষের পাওয়ার হাউস বলে। Walter Flemming (১৮৮২) কোষে সুতাকৃতির মাইটোকন্ড্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং ফিলা নামকরন করেন। Altaman (১৮৯০) এদের বায়োপ্লাস্ট নামকরণ করেন। বেন্ডা (১৮৯৭) এদের মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন।

কোষের যাবতীয় জৈবিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য শক্তি উৎপাদনকারী, দ্বিস্তরী আবরণী বিশিষ্ট, অতি ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন আকৃতির সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গানুকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে। কোষ আয়তনের প্রায় ২০% মাইটোকন্ড্রিয়া। প্রতি কোষে এর সংখ্যা ২০০-৩০০ পর্যন্ত হতে পারে। যকৃত ও বৃক্কের কোষে অধিক সংখ্যক (১০০০) টি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতে পারে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ

- কোষের শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
- শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম ধারণ করে।
- শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পর্যায় যেমন- ক্রেবস চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ইত্যাদি সম্পন্ন করে কোষের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করা।

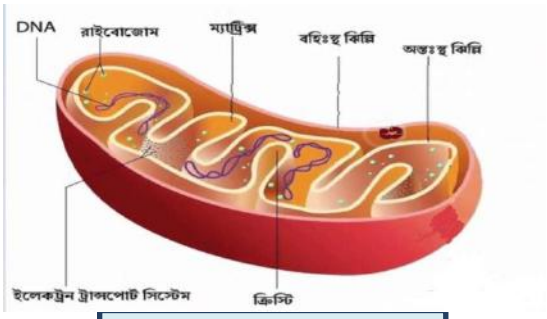

চিত্র: মাইটোকন্ড্রিয়া

৩. রাইবোজোমের গঠন–জীবের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান হল প্রোটিন। জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রায় ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন। অ্যামিনো এসিড হল প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম একক। DNA অণু ট্রান্সক্রিপসনের মাধ্যমে DNA অণু হতে পরিপূরক নাইট্রোজেনবেস সমন্বিত mRNA অণু তৈরি করে। mRNA অণুর নাইট্রোজেন বেস সমুহ ট্রিপলয়েড কোড গঠনের মাধ্যমে রাইবোজোমের মধ্য দিয়ে গমনের সময় প্রোটিন তৈরি করে।

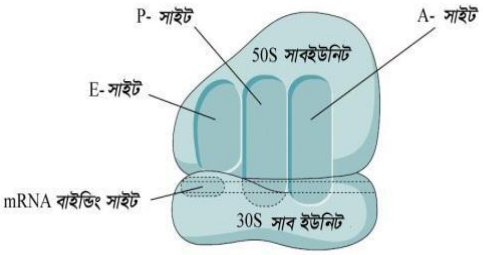

চিত্র- রাইবোসোমের গঠন

কোষের সাইটোপ্লাজমে মুক্তভাবে বিরাজমান অথবা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও নিউক্লিয়ার আবরণীর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র, গোলাকার,দানাদার ও ভারী অঙ্গানুসমূহকে রাইবোসোম বলে। বিজ্ঞানী Albert Claude ১৯৫৮ সালের দিকে কোষ থেকে রাইবোনিউক্লিয়প্রোটিন ও লিপিডযুক্ত কতগুলো ক্ষুদ্র কণিকা আবিস্কার করেন। তিনি এদের নাম দেন মাইক্রোসোম। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানী Richard B. Roberts, ১৯৫৮ এদের রাইবোজোম নাম দেন।

৪. প্লাষ্টিড:

প্লাস্টার থেকে এই প্লাস্টিড নামটা এসেছে।প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা ও উদ্ভিদ দেহকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে পরগায়নে সাহায্য করা। প্লাস্টিড তিন ধরনের যথা-ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।

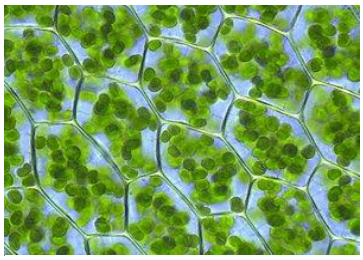
চিত্র: উদ্ভিদ দেহে প্লাষ্টিড

ক. ক্লোরোপ্লাস্ট: সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কান্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের গ্রানা অংশ সূর্যালোককে আবদ্ধ করে রাসায়নিক শক্তিতে রুপান্তরিত করে। এ আবদ্ধ সৌরশক্তি স্ট্রোমাতে অবস্থিত উৎসেচক সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কোষের পানি থেকে সরল শর্করা উৎপন্ন করে। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামক রঞ্জকও থাকে।

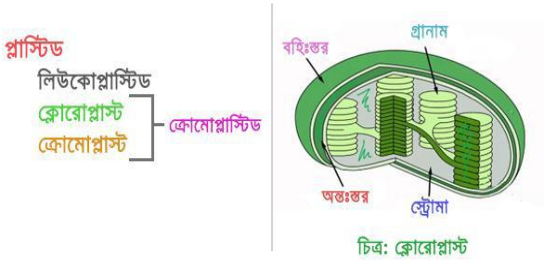

চিত্র: ক্লোরোপ্লাস্ট

খ. ক্রোমোপ্লাস্টঃ এরা রংগিন প্লাস্টিড তবে এরা সবুজ নয়। এসব প্লাস্টিড জ্যান্থফিল, ক্যারোটিন, ফাইকোএরিথ্রিন, ফাইকোসায়ানিন ইত্যাদি বর্ণের কণিকা ধারণ করে,তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল অথবা লাল দেখায়। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল,পাতা ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙিন ফুল,পাতা ও গাজরের মূলে এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন প্রকার রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ ও জমা করে।

গ. লিউকোপ্লাস্ট : যেসব প্লাস্টিড কোনো রঞ্জক পদার্থ ধারণ করেনা তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যেসব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায়না সেখানে এদের পাওয়া যায়, যেমন-মূল,ভ্রুন,জননকোষ ইত্যাদি। এদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। আলো সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট বা ক্লোরোপ্লাস্টে রুপান্তরিত হতে পারে।

৫. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (মসৃন/ অমসৃন) :

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একপ্রকার জালিকাকার অঙ্গাণু। এরা একক আবরণী ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত অসংখ্য সূক্ষ সূক্ষ নালিকা এবং পরস্পর সংযোগ স্থাপন করে একটি জালকের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালে পর্টার (PORTER) যকৃত কোষে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবিষ্কার করেন।

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম শুধু মাত্র সুকেন্দ্রিক কোষে পাওয়া যায়।এর পৃষ্ঠে রাইবোসোম দানা থাকলে তাকে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Rough endoplasmic reticulum বা সংক্ষেপে RER) বলে যা প্রোটিন সংশ্লেষে সক্ষম। এবং রাইবোসোম দানা না থাকলে তাকে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Smooth endoplasmic reticulum বা সংক্ষেপে SER) বলে যা লিপিড (lipid) সংশ্লেষে সক্ষম। প্রাণী কোষে SER লিপিড সদৃশ স্টেরয়েড হরমোনগুলি সংশ্লেষ করে।

অবস্থান: এরা সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

উৎপত্তি: সাইটোপ্লাজমীয় ঝিল্লি, নিউক্লীয় ঝিল্লি অথবা কোষঝিল্লি হতে এদের উৎপত্তি হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

আকার ও গঠন: গঠনগতভাবে এরা তিন প্রকার; যথা- (ক) সিস্টারনিঃ এরা দেখতে চেপ্টা,শাখাহীন ও লম্বা চৌবাচ্চার মতো। সাইটোপ্লাজমে পরস্পর সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে। এগুলো ৪০-৫০ মিলি মাইক্রন পুরু। এদের গায়ে অনেক সময় রাইবোসোম যুক্ত থাকে। (খ) ভেসিকলঃ এগুলো বর্তুলাকার ফোস্কার মতো। ২৫-৫০ মিলি মাইক্রন ব্যাস যুক্ত। (গ) টিউবিউলঃ এগুলো নালিকার মতো,শাখান্বিত বা অশাখ। এদের **ব্যাস ৩-১৯০ মিলি মাইক্রন।**

কাজ:

- সাইটোপ্লাজমকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে।
- প্রোটিন সংশ্লেষণে ভূমিকা পালন করে।
- মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম স্নেহপদার্থ উৎপাদন করে।
- ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য কণাদের সঞ্চয় ও দরকারমত নিঃসরণ (যেমন পেশী সঞ্চালনে)।
- কিছু রেচনপদার্থের পরিশোধন.
- এটি প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসেবে কাজ করে ।
- এটি লিপিড ও প্রোটিন এর অন্তঃবাহক হিসেবে কাজ করে।
- রাইবোসোম, গ্লাইঅক্সিসোমের ধারক হিসেবে কাজ করে।

৬.ক্রোমোজোম:

কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়প্লাজমে সুতার ন্যায় এক ধরনের পদার্থ লক্ষ্য করা যায় এদেরকে ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয়। কোষ বিভাজনের সময় এগুলো মোটা ও স্পষ্ট হয় তখন এদেরকে ক্রোমোজোম নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতিটি জীবে ও উদ্ভিদ দেহে এর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন মানুষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৬ টি। এ সংখ্যা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

ইউক্যারিওটিক কোষের নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত কোষ বিভাজনের সময় দৃশ্যমান সূত্রাকার অঙ্গানুকে ক্রোমোজোম বলে। E. Strasburger (১৮৭৫) খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষের নিউক্লিয়াসে এটি প্রত্যক্ষ করেন। Walter Flemming (১৮৭৮) সালে সুতার মত গঠনগুলোকে ক্রোমাটিন নামকরণ করেন। বর্ণধারণ ক্ষমতার জন্য W. Waldeyer (১৮৮৮) সালে এদের ক্রোমোজোম নামকরণ করেন। গ্রিক chroma= বর্ণ, soma= দেহ। প্রজাতিভেদে ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য সাধারণত ০.২৫-৫০ মাইক্রোমিটার এবং প্রস্থ ০.২-২ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় মানবদেহের ক্রোমোসোমের গড় দৈর্ঘ ৪-৬ মাইক্রোমিটার, ড্রোসোফিলা মাছির ৩ এবং ভুট্রার ৮-১২ মাইক্রোমিটার।

ভৌত গঠন

উদ্ভিদ দেহের বাইরের দিকে একটি পাতলা আবরণী থাকে একে **পেলিকল** বলে। পেলিকলের পাতলা আবরণের নিচে সমস্ত অংশ দানাদার ম্যাট্রিক্সে পূর্ণ থাকে। ক্রোমোসোমের সমস্ত দৈর্ঘ্য বরাবর পরস্পর প্যাঁচানো সুতার ন্যায় দুটি অংশ থাকে একে ক্রোমাটিড বলে। ক্রোমাটিডের সুতার ন্যায় প্রত্যেকটি অংশকে **ক্রোমমিয়ার** বলা হয়। ক্রোমোসোমের দৈর্ঘ্য বরাবর বাহুতে কুঞ্চন লক্ষ্য করা যায় একে **প্রাইমারী কুঞ্চন** কলে। প্রাইমারী কুঞ্চন ব্যতিত ক্রোমোজোমের বাহুতে এক বা একাধিক কুঞ্চন লক্ষ্য করা যায় একে গৌণ কুঞ্চন বলে। মূখ্য কুঞ্চনের স্থানে ক্রোমাটিডগুলো একত্রিত হয়ে **সেন্ট্রোমিয়ার** গঠন করে। একটি ক্রোমোজোমে সাধারণত একটিমাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। ক্রোমোসোমের প্রান্তীয় অংশগুলো কিছুটা গোলাকার এবং ফুলানো থাকে একে **টেলোমিয়ার** বলে।

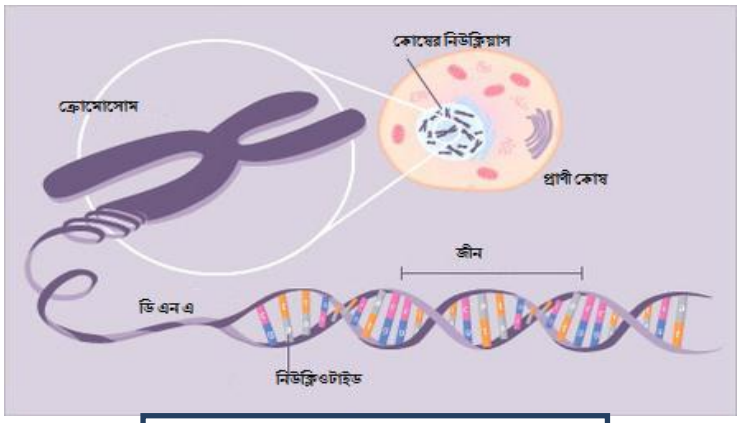

চিত্র: ক্রোমোজোম

রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোসোমের প্রধান রাসায়নিক উপাদান DNA বা Deoxyribo Nucleic Acid. এটি সাধারনত পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন।একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। এতে ৫ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন) ও অজৈব ফসফেট থাকে। এ তিনটি উপাদানকে একত্রে নিউক্লিওটাইড বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ।

উদ্ভিদ দেহকাজ

১. কোষ বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করে।

২. বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ রক্ষা করে।

৩. এর সামান্যতম পরিবর্তনের (ক্রসিংওভার) মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করতে পারে।

৪. এছাড়াও বংশগতীয় গবেষণায় গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. প্রোটিন সংশ্লেষণ সহায়তা করে।

৪.২ কোষ বিভাজনঃ প্রক্রিয়া ও গুরুত্ব

যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের বিভক্তির মাধ্যমে একটি থেকে দুটি বা চারটি কোষের সৃষ্টি হয় তাকে কোষ বিভাজন বলে। Walter Flemming ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সামুদ্রিক সালামান্ডার কোষে সর্বপ্রথম কোষ বিভাজন লক্ষ্য করেন।

কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ (Types of cell division)

জীবদেহে তিন প্রকার কোষবিভাজন দেখা যায়, যথা-

১। অ্যামাইটোসিস (Amitosis)

২। মাইটোসিস (Mitosis)

৩। মিয়োসিস (Meiosis)

অ্যামাইটোসিস

এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াসটি প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি দুটি অংশে ভাগ হয়। বিভাজনের শুরুতে নিউক্লিয়াসটি ধীরে ধীরে লম্বা হতে থাকে এবং পরে দুইপ্রান্তে মোটা ও মাঝের অংশটি সরু হতে থাকে। মাঝের সরু অংশটি ক্রমশ আরও সরু হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দুটি অপত্য (daughter) নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে কোষ প্রাচীরটির মধ্যভাগ ভিতরের দিকে প্রবেশ করে সাইটোপ্লাজমকেও দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং দুটি অপত্য কোষের (daughter cell) সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল, ঈস্ট প্রভৃতি জীবকোষে এ ধরনের কোষ বিভাজন ঘটে।

চিত্রঃ অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন

মাইটোসিস কোষ বিভাজন

প্রত্যেক জীবের দেহ কোষ মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। এ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় দুটি নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। এ বিভাজনে নতুন সৃষ্ট কোষ সমূহ তার মাতৃ কোষের ন্যায় সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম নিয়ে বিভক্ত হয়। ফলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোষ সমূহের বৈশিষ্ট্য মাতৃগুণাগুন সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমীকরণিক বা ইকুয়েশনাল কোষ বিভাজন বলে। মাইটোসিস কোষ বিভাজন দুইটি স্তরে ঘটে ১. ক্যারিওকাইনেসিস, ২. সাইটোকাইনেসিস। নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে ক্যারিওকাইনেসিস বলে। নিউক্লিয়াসের বিভাজনের পাশাপাশি সমস্ত কোষ সাইটোপ্লাজমসহ দুটিভাগে বিভক্ত হয়। কোষ বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজমের বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে। দেহ কোষ বিভাজনের সময় কোষাভ্যন্তরে বিভিন্ন পরিবতর্ন লক্ষ্য করা যায়। এ বিভিন্ন অবস্থার উপর ভিত্তি করে ক্যারিওকাইনেসিসকে নিম্নোক্ত দশায় ভাগ করা যায়। যথা:

১. **প্রোফেজ বা আদ্য পর্যায়**
২. **প্রো-মেটাফেজ বা প্রাক মধ্যপর্যায়**
৩. **মেটাফেজ বা মধ্যপর্যায়**
৪. **অ্যানাফেজ বা গতিপর্যায়**
৫. **টেলোফেজ বা অন্তপর্যায়**

প্রোফেজ

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রথম ধাপ এটি তাই এটিকে প্রারম্ভিক পর্যায় বা আদ্য পর্যায় বলা হয়। এ পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের আকার বড় হয়। ক্রোমোজোমগুলিতে জল বিয়োজন আরাম্ভ হয়।ফলে ক্রোমোসোমগুলি সংকুচিত হয়ে খাটো ও মোটা হতে থাকে। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলির রং ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রোমোসোমগুলো স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

চিত্রঃ প্রোফেজ

প্রো-মেটাফেজ

মাইটোসিস কোষ বিভাজনের এ ধাপটি হল কোষ বিভাজনের মধ্যবর্তী ধাপটির পূর্ববর্তী ধাপ তাই একে প্রাক-মধ্যপর্যায় বা প্রো-মেটাফেজ বলে। মাইটোসিস বিভাজনের এধাপে স্পিন্ডল যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এ ধাপে নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটে। স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যবর্তী অংশকে বিষুবীয় অঞ্চল এবং দু প্রান্তকে মেরু অঞ্চল বলে। এধাপে ক্রোমোসোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করতে থাকে।

চিত্রঃ প্রো-মেটাফেজ

মেটাফেজ

এটি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মধ্যবর্তী পর্যায়। এ পর্যায়ে স্পিন্ডলযন্ত্র স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ক্রোমোজোমগুলো মেরু হতে বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে। ক্রোমোসোমের বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হওয়াকে মেটাকাইনেসিস বলে।এ পর্যায়ে ক্রোমাজোমগুলো সবচেয়ে বেশি মোটা, খাটো ও স্পষ্ট হতে দেখা যায়। ক্রোমোজোমগুলো দৈর্ঘ্য বরাবর ভাগ হতে শুরু করে, শুধুমাত্র সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত থকে। এ পর্যায়ের শেষভাগে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার সম্পূর্নভাবে বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য ক্রোমাটিড সৃষ্টি করে।

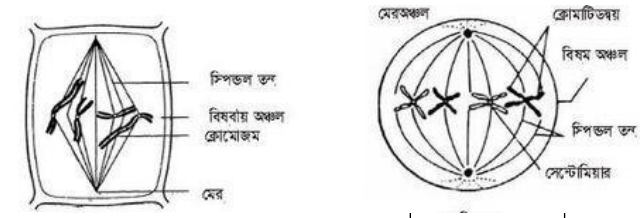

উদ্ভিদ কোষ | চিত্রঃ মেটাফেজ | প্রাণি কোষ

অ্যানাফেজ

এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলের দিকে গমন লক্ষ্য করা যায় তাই এ পর্যায়কে গতি পর্যায় বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের পূর্ণ বিভক্তির ফলে প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি অপত্য ক্রোমোসোমে পরিণত হয় এবং এ অপত্য ক্রোমোসোমগুলো নিকটস্থ মেরুর দিকে ধাবিত হয়। অপত্য ক্রোমোসোমের মেরুমুখী চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়। এ সময় সেন্ট্রমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলো ইংরেজী V(মেটাসেন্ট্রিক), L(সাব-মেটাসেন্ট্রিক), J(অ্যাক্রোসেন্ট্রিক) ও I (টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মত দেখায়। ক্রোমোজোমগুলো মেরুর কাছাকাছি পৌছালেই অ্যানাফেজ তথা গতিপর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

টেলোফেজ

কোষ বিভাজনের এ পর্যায়ে অপত্য ক্রামোজোমসমূহ দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়। এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলোতে আবার জলযোজন ঘটে। ফলে ক্রোমোজোমগুলো ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে সরু, লম্বা এবং অদৃশ্য হতে থাকে। এ পর্যায়ের শেষদিকে দুই মেরুতে ক্রোমোজোমগুলোর চারদিকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের পূনঃআবির্ভাব ঘটে। স্পিন্ডল যন্ত্রগুলোর ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটে।

সাইটোকাইনেসিস

টেলোফেজ পর্যায়ের শেষদিকে কোষের বিষুবীয় অঞ্চলের সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। সাইটোপ্লাজমের এ বিভাজনকে সাইটোকাইনেসিস বলে।

চিত্র: টেলোফেজ dR

মিয়োসিস কোষ বিভাজন

জীবের জনন কোষে মিয়োসিস কোষ বিভাজন সংঘটিত হয়। এ বিভাজনে নতুন সৃষ্ট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয় তাই এ কোষ বিভাজনকে হ্রাস মূলক বিভাজন বলা হয়। এ বিভাজনে হ্যাপ্লয়েড কোষ উৎপন্ন হয়।

যে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস দুবার এবং ক্রোমোজোম একবার বিভাজিত হয়ে একটি মাতৃকোষ হতে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং অপত্য কোষে নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যা মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক হয় তাকে মিয়োসিস কোষ বিভাজন বলে। Strasburgar ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে এ কোষ বিভাজন আবিস্কার করেন এবং J.B. Farmar ও Moore মিয়োসিস শব্দটি প্রয়োগ করেন ।

মিয়োসিস একটি অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় একটি কোষ পরপর দুবার বিভক্ত হয়। নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোসোমের উপর ভিত্তি করে মিয়োসিস কোষ বিভাজনকে দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করা যায়; যথাঃ **মায়োসিস-১** ও **মিয়োসিস-২**

১. মিয়োসিস-১

মায়োসিস কোষ বিভাজনে এ পর্যায়টি সবচেয়ে তাৎপর্য পূর্ণ। কারণ এ পর্যায়েই ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় এবং ক্রোমোসোমের অংশের বিনিময় বা ক্রসিংওভার ঘটে। মিয়োসিস-১ কে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। পর্যায়গুলো নিম্নরূপ:

১. প্রোফেজ-১
   - **১. লেপ্টোটিন**
   - **২. জাইগোটিন**

৩. প্যাকাইটিন
৪. ডিপ্লোটিন
৫. ডায়াকাইনেসিস

২. মেটাফেজ-১
৩. অ্যানাফেজ-১
৪. টেলোফেজ-১

মিয়োসিস-১ বা প্রথম মিয়োসিস বিভাজন

প্রোফেজ-১: মায়োসিস-১ এর প্রথম পর্যায় হল প্রফেজ-১। এটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী পর্যায়। মানুষের শুক্রাশয়ে মিয়োটিক প্রোফেজ-১ যেতে সময় লাগে এক সপ্তাহ, বিভাজনটি সম্পন্ন হতে সময় লাগে প্রায় এক মাস।

- **লেপ্টোটিন**

  নিউক্লিয়াসের জল বিয়োজনের মাধ্যমে এ দশা শুরু হয়। ক্রমাগত জল বিয়োজনের ফলে ক্রোমোজোমগুলো সুংকুচিত ও পুরু হয় । এ অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো আলোক অনুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয়।

- **জাইগোটিন**

  এ উপ-পর্যায়ে হোমলোগাস ক্রোমোজোম একটি জোড়ার সৃষ্টি করে। দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে জোড় সৃষ্টি হওয়াকে সিন্যাপসিস বলে। প্রতিটি ক্রোমোজোম জোড়কে বাইভ্যালেন্ট বলে। নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়ার আবরণ তখনও দেখা যায়।

- **প্যাকাইটিন**

  এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাইভ্যালেন্টর প্রতিটি ক্রোমোজোমকে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতিত অনুদৈর্ঘ্যে হতে দুটি ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায় অর্থ্যাৎ প্রতিটি বাইভ্যালেন্টে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার ও চারটি ক্রোমাটিড থাকে। এ অবস্থায় একে টেট্রাড বলে। একই ক্রোমোজোমের দুটি ক্রোমাটিডকে সিস্টার ক্রোমাটিড বলে এবং একই জোড়ার দুটি ভিন্ন ক্রোমোসোমের ক্রোমাটিডকে নন-সিস্টার ক্রোমাটিড বলে। দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যবর্তীস্থানে (X) আকৃতির মত অবস্থা বিরাজ করে একে কায়াজমা বলে। নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে পরস্পর অংশের বিনিময়কে ক্রসিংওভার বলে। এ পর্যায়েও নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার আবরণ দেখা যায়।

- **ডিপ্লোটিন**

  ক্রমাগত সংকোচনের ফলে এ উপপর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো আরো খাটো ও মোটা হয়। বাইভ্যালেন্টের ক্রোমোসোমের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষন শুরু হয়। ফলে বিপরীত দিকে সরে যেতে চষ্টো করে কিন্তু কায়াজমার স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ বিকর্ষন একইসাথে কয়েক স্থানে শুরু হতে পারে। বিকর্ষণের ফলে দুটি কায়াজমার মধ্যবর্তী স্থানে লুপের সৃষ্টি হয়।

- **ডায়াকাইনেসিস**

  এ ধাপে বাইভ্যালেন্টের প্রতিটি ক্রোমোজোমের উপর ম্যাট্রিক্স পদার্থ জমা হয় তখন আর ক্রোমাটিডে বিভক্ত দেখা যায় না। এ সময় বাইভ্যালেন্টগুলো নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রস্থল হতে পরিধির দিকে চলে আসে। এ উপ পর্যায়ের শেষ দিকে নিউক্লিওলাস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিউক্লিয়ার আবরণের অবলুপ্তি ঘটে।

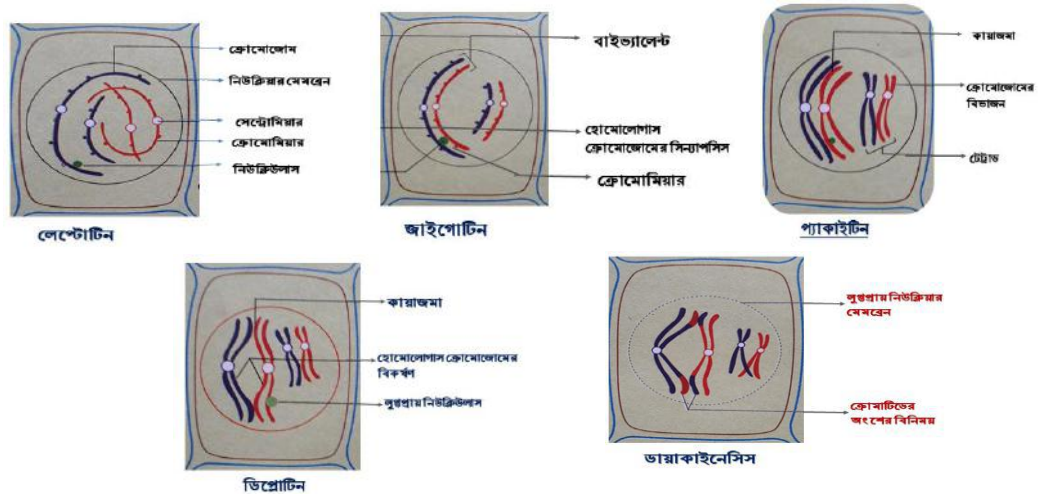

চিত্র : প্রফেজ-১

মেটাফেজ-১

বাইভ্যালেন্টের প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার স্ব স্ব মেরুরদিকে এবং বিষুবীয় রেখা হতে সমদূরে অবস্থান করে। মাইটোসিসের মেটাফেজের মত এ পর্যায়ে সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না। ক্রোমোজোমের মধ্যে লুপের সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোমগুলো আরো খাটো ও মোটা হয়।

অ্যানাফেজ-১

এ পর্যায়ে এসে হোমলোগাস ক্রোমোজোম পৃথক হয়ে যায় এবং বাইভ্যালেন্টের দুটি ক্রমোজোম বিপরীত মেরুরদিকে ধাবিত হয়। এরুপ চলনে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী হয় এবং বাহুদয় অনুগামী হয়। এ সময় সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো ইংরেজী V(মেটাসেন্ট্রিক), L(সাব-মেটাসেন্ট্রিক), J(অ্যাক্রোসেন্ট্রিক) ও I(টেলোসেন্ট্রিক) অক্ষরের মত দেখায়।

টেলোফেজ-১

এটি মিয়োসিস-১ এর শেষ পর্যায়। এধাপের শেষে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে (n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। তবে অনেক প্রজাতিতে টেলোফেজ-১ ঘটে না।

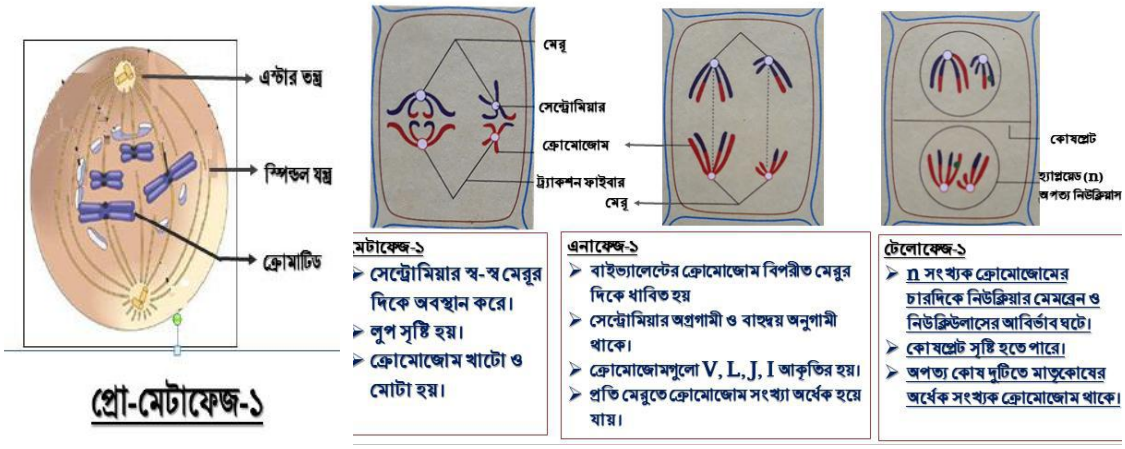

ইন্টারকাইনেসিস: মিয়োসিস কোষবিভাজন প্রক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভক্তির মধ্যবর্তী সময়কে ইন্টারকাইনেসিস বলা হয়। এ সময়ে অত্যাবশ্যকীয় DNA, প্রোটিন প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয়। DNA- এর অনুলিপন সৃষ্টি হয় না।

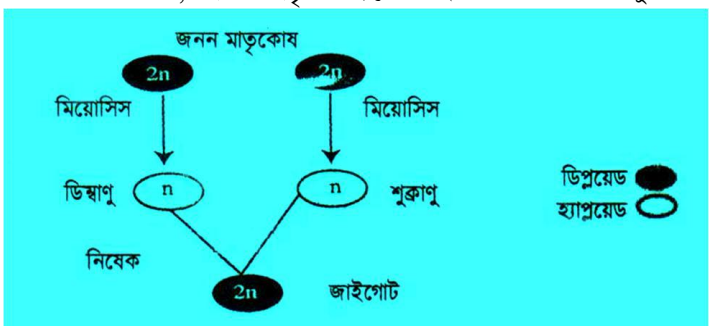

চিত্র-মিয়োসিস কোষ বিভাজন

মিয়োসিস-২: মিয়োসিস-১ এ সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস দুটি যে পদ্ধতিতে ৪টি হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ বা নিউক্লিয়াস গঠন করে, তাকে মিয়োসিস-২ বলে। এ বিভাজনকেও চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

- **প্রোফেজ-২**
- **মেটাফেজ-২**
- **অ্যানাফেজ-২**
- **টেলোফেজ-২**

চিত্র : মিউসিস-২

মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য

(১) মাইটোসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে মিয়োসিস কোষ বিভাজনে মাতৃকোষটি বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে।

(২) মাইটোসিস কোষ বিভাজন জীবের দেহকোষে সংঘটিত হয় বলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে মিয়োসিস কোষ বিভাজন জীবের জনন মাতৃকোষে সংঘটিত হয় বলে গ্যামেট তৈরি হয়।

কোষ বিভাজনের তাৎপর্য বা গুরুত্বঃ কোষ বিভাজনের মাধ্যমেই পুং ও স্ত্রী গ্যামেট সৃষ্টি হয়ে নতুন প্রজন্মের জন্ম হয়। জীবের বৃদ্ধি ও প্রজননের উদ্দেশ্যে কোষ বিভাজনের (cell division) মাধ্যমে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে থাকে। জীবদেহে কোষ বিভাজন একটি মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমেই জীবের দৈহিক ও বংশবৃদ্ধি ঘটে।

মাইটোসিসঃ বৃদ্ধি ও অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য। বিশাল একটি বটগাছের সূচনা ঘটে একটি মাত্র কোষ (জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বক) থেকে। এককোষী নিষিক্ত ডিম্বক থেকে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একসময় কোটি কোটি কোষের একটি পরিণত মানুষের সৃষ্টি হয়। প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা ও দেহের ক্ষত পুরণে মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মিয়োসিস : যৌন জননে মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহ কোষের সমান থেকে যায় তা হলে জাইগোট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জীবটির দেহ কোষের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মিয়োসিসের মাধ্যমে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক হওয়াতে জাইগোট গঠনে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে। মিয়োসিসে জিনের আদান-প্রদানের ফলে নতুন প্রকরণ তৈরি হয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. **কোষ বিভাজন কী?**
২. **অ্যামাইটোসিস কী ?**
৩. **প্রোফেজ বা আদ্য পর্যায় বর্ণনা করুন।**
৪. **কোষ বিভাজনের গুরুত্ব লিখ।**

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মাইটোসিস কোষ বিভাজন ব্যাখ্যা করুন।
২. মাইটোসিস কোষ বিভাজন ও **মিয়োসিস** কোষ বিভাজন **এর** তুলনা করুন।

References:

১. জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), গাজী আজমল ও সফিউর রহমান, গাজী পাবণিশার্স, প্রকাশকাল: জুন ২০১৮ খ্রি:

২. উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র :উদ্ভিদবিজ্ঞান), ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০১৮ খ্রি:

৩. জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), প্রফেসর জিতেন্দ্র নাথ রায় এবং অন্যান্য, কবির পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল:জুন ২০১৮।

ইউনিট ৫ : উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব

জীবিত উদ্ভিদ দেহে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক ক্রিয়া সংঘটিত হয় যা জীবনকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন ধরনের জৈবনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অলোচনা করা হয় তকে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বলে। একাধিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া মিলিতভাবে এক একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদ দেহে গুরূত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া হলো পানি ও খনিজ লবণ শোষণ, ব্যাপন, আভিস্রবন, প্রস্বেদন, সালোকসংশ্লেষণ,শ্বসন ইত্যাদি। সকল গঠনমূলক প্রক্রিয়াসমূহকে উপচিতি (Anabolism) এবং ভাঙ্গন বা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াসমূহকে অপচিতি (Catabolism) বলে। উপচিতি ও অপচিতিকে একসাথে বিপাক (Metabolism) বলে। উদ্ভিদ দেহ গঠন ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন খাদ্য ও শক্তি। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে। তৈরিকৃত খাদ্য থেকে শ্বসনের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হয় যা দৈহিক বৃদ্ধি ও বিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া মানব কল্যাণে শিল্পক্ষেত্রে অবাত শ্বসনের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

৫.১ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া
৫.২ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া: ক্যালভিন চক্র,হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র ও প্রভাবকের (ক্লোরেফিল, আলো ইত্যাদি) ভূমিকা
৫.৩ সবাত ও অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া

৫.১ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও প্রভাবকের ভূমিকা

জীব কর্তৃক তার দেহে শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের মৌলিক কৌশলই হচ্ছে জীবনীশক্তি। শক্তির মূল উৎস সূর্য । সবুজ সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়ার সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে প্রথমে ATP ও NADPH+ নামক জৈব যৌগে আবদ্ধ করে । এগুলোই হলো জীবনীশক্তি বা বায়োএনার্জি। পরবর্তীতে সালোকসংশ্লেষণের কার্বন বিজারণ পর্যায়ে এ শক্তি শর্করা ও অন্যান্য জৈব যৌগের অণুর রাসায়নিক বন্ধনীতে সঞ্চিত বা আবদ্ধ হয়। জীবন পরিচালনার জন্য জীবকোষে তথা জীবদেহে প্রতিনিয়ত হাজারো রকমের জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে । এসব বিক্রিয়া পরিচালিত হয় বায়োএনার্জি দ্বারা ।

কিছু শক্তিসমৃদ্ধ যৌগ উচ্চশক্তি ধারণ এবং প্রয়োজনে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি যোগায় যেমন ATP, GTP, NAD, NADP+, $FADH_2$ ইত্যাদি। ATP শক্তি জমা করে রাখে এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করে। এজন্য ATP কে

$$ATP \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সৌরশক্তি}} ADP$$

'জৈবমুদ্রা' বা শক্তি মুদ্রা' (Biological coin or energy coin) বলা হয়।

এ প্রক্রিয়ার ATP- এর তৃতীয় ফসসেট বন্ধনীতে প্রায় ৭৩০০ ক্যালরি সৌরশক্তি আবদ্ধ হয় । ATP হলো মুক্তশক্তির বাহক, এর ফসফেট বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। জৈব সংশ্লেষণ, পরিবহন ও অন্যান্য বিপাকীয় কাজে শক্তির প্রয়োজন হলে ATP (Adenosine Triphosphate) ভেঙ্গে ADP (Adenosine diphosphate) ও AMP (Adenosine Monophosphate) তৈরি হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয় ।

সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

সবুজ উদ্ভিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন (Co_2) ও পানি থেকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। সবুজ উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হওয়ায় এ প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সবুজ উদ্ভিদে প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ নিজে বেচেঁ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিপাকীয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে ব্যবহার করে এবং অবশিষ্ট খাদ্য ফল, মূল, কান্ড অথবা পাতায় সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ দ্বারা সঞ্চিত খাদ্যের উপরেই মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে ।

সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো : (১) ক্লোরোফিল, (২) আলো, (৩) পানি এবং (৪) কার্বন ডাইক্সাইড । সালোকসংশ্লেষণ একটি জৈব রাসায়নিক (Biochemical) বিক্রিয়া যা নিম্নরুপ-

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সৌরশক্তি}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

পাতার মেসোফিল টিসু সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রধান স্থান । স্থলজ সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূল দিয়ে পানি শোষণ করে পাতার মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপোস্টে পৌঁছায় এবং পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে CO_2 গ্রহন করে যা মেসোফিল টিস্যুর ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। জলজ উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত CO_2 গ্রহন করে। বায়ুমন্ডলে ০.০৩% এবং পানিতে ০.০০৩% CO_2 আছে । জলজ উদ্ভিদে সালেকসংশ্লেষণের হার স্থলজ উদ্ভিদ থেকে বেশি। অক্সিজেন ও পানি সালেকসংশ্লেষণের উপজাত দ্রব্য (by-product)। এটি একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া (oxidation-reduction process)। এ প্রক্রিয়ায় H_2O জারিত হয় ও CO_2 বিজারিত হয়।

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া : সালোকসংশ্লেষণ একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ১৯০৫ সালে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান (Blackman) এ প্রক্রিয়াকে দুই ভাগ করেন। পর্যায় দুটি হলো -
(১) আলোক নির্ভর পর্যায় এবং (২) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়

(১) আলোকনির্ভর পর্যায় (light dependent phase)

আলোকনির্ভর পর্যায়ে জন্য আলো অপরিহার্য । এ পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট ইলকট্রন গ্রহীতাসমূহ যে ইউনিট হিসাবে কাজ করে তাকে পিগমেন্ট সিস্টেম বা ফটোসিস্টেম বলে। ফটোসিস্টেম দুই প্রকার। যথা :

- ফটোসিস্টেম-১ (PS-1) : PS-1 যথাক্রমে Chl 'a'683 Chl 'a'700, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল, ইলেকট্রন বাহক, কো-এনজাইম ও কো-ফেক্টর দ্বারা গঠিত।
- ফটোসিস্টেম-২ (PS-2) : PS-2 যথাক্রমে Chl 'a'673, Chl 'a'680, Chl 'b', বিটাক্যারোটিন, ইলেকট্রন বাহক, কো-এনজাইম ও কোফেক্টর দ্বারা গঠিত।

আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যায়ে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ATP (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট) এবং $NADPH+H^+$ (বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড হাইড্রোজেন ফসফেট) উৎপন্ন হয় । আলোক শক্তিকে ব্যবহার করে ATP তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে। $NADPH+H^+$ পরে ATP তে রূপান্তরিত হয়। ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি শোষণ করে ক্লোরোফিল। ফটোফসফোরাইলেশন দুই প্রকার (ক) চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (খ) অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন

(ক) চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (Cyclic Photophosphorylation)

এই চক্রে ফটোসিস্টেম-১ অংশগ্রহণ করে। এই চক্রে ফটোসিস্টেম-১ থেকে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুরে পুনরায় ফটোসিস্টেম-১-এ ফিরে আসে। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।

পদ্ধতি

১. এ প্রক্রিয়ায় কেবল ফটোসিস্টেম-১ অংশগ্রহণ করে।
২. ফটোসিস্টেম-১ এর ক্লোরোফিল অণু 680 nm- এর বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক শোষণ করে।
৩. ক্লোরোফিল অণু আলোক ফোটন শোষণ করে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই শক্তি পরে বিক্রিয়ার কেন্দ্র P700-তে স্থানান্তরিত হয়।
৪. পরে P700 থেকে ২ টি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফেরাডক্সিনে (FD) গমন করে।

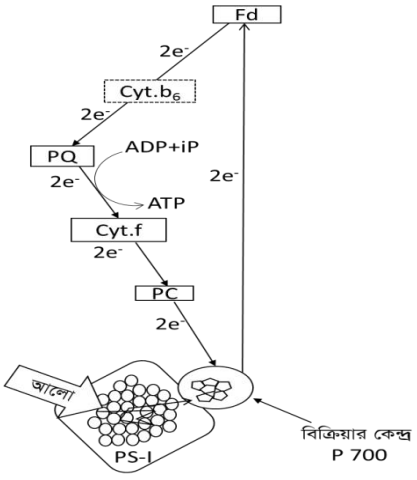

চিত্র : চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন

৫. পরে উত্তেজিত ২ টি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেকট্রন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফেরাডক্সিনে (FD) থেকে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম বি-৬ ($Cyt.b_6$) এর মাধ্যমে প্লাষ্টোকুইনন (PQ)-এ স্থানান্তরিত হয়।

৬. প্লাষ্টোকুইনন থেকে ইলেকট্রন সাইটক্রোম এফ (Cyt.f) -এ আসে। এ সময় ইলেকট্রন মুক্ত শক্তি দিয়ে ADP ও Pi সহযোগে একটি ATP তৈরি হয়।

৭. সাইটোক্রোম এফ($Cyt.b_6$) থেকে ইলেকট্রন প্লাষ্টোসায়ানিন (PC) এর মাধ্যমে পুনরায় P700-এ ফিরে আসে।

(খ) অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন (Noncyclic Photophosphorylation)

এই চক্রে ফটোসিস্টেম-১ ও ফটোসিস্টেম-২ অংশগ্রহণ করে। ফটোসিস্টেম-২ ক্লোরফিল অণু থেকে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুরে পুনরায় ফটোসিস্টেম-২-এ ফিরে না এসে ফটোসিস্টেম-১ এ চলে যায় এবং $NADPH+H^+$ তৈরি করতে খরচ হয়ে যায়। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন দেখানো হলো।

১. ফটোসিস্টেম-২ এর ক্লোরোফিল অণু 673 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক শোষণ করে।ক্লোরোফিল অণু আলোক ফোটন শোষণ করে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই শক্তি পরে বিক্রিয়ার কেন্দ্র P680-তে স্থানান্তরিত হয়।

২. P680-থেকে ২ টি ইলেকট্রন উত্তেজিত হয়ে প্লাষ্টোকুানিন (PQ)-এ প্রবাহিত হয়।

৩. প্লাষ্টোকুানিন (PQ) থেকে ইলেকট্রন সাইটোক্রোম বি-৬ ($Cyt.f_6$)-এ যায়। এ ধাপে নির্গত শক্তি দিয়ে ADP ও Pi সহযোগে একটি ATP তৈরি হয় ।

৪. ইলেকট্রন ২টি সাইটোক্রোম এফ (Cyt.f) থেকে প্লাষ্টোসায়ানিন (PC)-এ পৌঁছে।

৫. প্লাষ্টোসায়ানিন (PC) ফটোসিস্টেম-১ এরে P700 ইলেকট্রন প্রদান করে।

৬. P700 থেকে উৎক্ষিপ্ত ২টি ইলেকট্রন ফেরাডক্সিনে (FD) গ্রহণ করে।

৭. ফেরাডক্সিন (FD) থেকে ইলেকট্রন গ্রহন করে NADP রিডাকটেজ । NADP রিডাকটেজ ২ টি শক্তিপ্রাপ্ত ইলেকট্রন (বিক্রিয়ার কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত)এবং ২ টি প্রোটোন (পানির ভাঙ্গন থেকে) সহযোগে NADP কে বিজারিত করে $NADPH+H^+$ তৈরি করে।

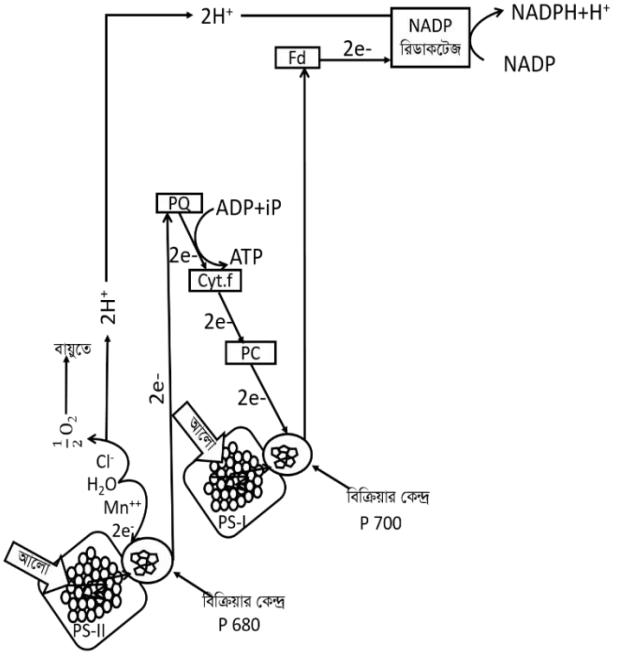

চিত্র : অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন

আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় (light independent phase)

আলোকনিরপেক্ষ পর্যায়ে উৎপন্ন ATP ও NADPH2 বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 হতে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কার্বন বিজারিত হয়ে শর্করা উৎপাদন করে বলে একে কার্বন বিজারণ অধ্যায়ও বলা হয়। কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পড়ে না বলে একে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় বা অন্ধকার পর্যায় বলা হয়। অবার একে কার্বন আত্তীকরণ পর্যায়ও বলা হয়। আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় দিনে বা রাত্রের যে কোন সময় সংঘটিত হয় তবে দিনে অপেক্ষাকৃত বেশি সক্রিয় থাকে। CO_2 হতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির তিনটি স্বীকৃত পথ আছে। স্বীকৃত পথগুলো হলো- (১) ক্যালভিন চক্র (২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (৩) CMC (Crussulacean Acid Metabolism) প্রক্রিয়া। (৫.২-এ ক্যালভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র নিয়ে আলোচনা করা হবে।)

৫.২ : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া: ক্যালভিন চক্র, হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র

ক্যালভিন চক্র (Calvin cycle): যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেলভিন ক্যালভিন (Melvinnn Calvin, 1911-1979) তাঁর দুজন সহকর্মী জে. ব্যাশম ও এন্ড্রু বেনসনের সহযোগিতায় তেজস্ক্রিয় C^{14} অণু ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে (tracer technique) ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে *Chlorella* নামক এককোষী শৈবালে কার্বন বিজারণের চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক মেলভিন ক্যালভিন এর নামানুসারে একে ক্যালভিন চক্র বলা হয়। আবার এ পথের প্রথম স্থায়ী জৈব পদার্থ তিন কার্বনবিশিষ্ট ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড। তাই একে C_3-চক্র নামেও ডাকা হয়। অধ্যাপক মেলভিন ক্যালভিন কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৬১ সালে নোবেল পুরুস্কার পান। ক্যালভিন চক্রের বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. বায়ু থেকে CO_2পাতার পত্ররন্ধ্র দিয়ে কোষে এরং পরে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করে ৫-কার্বনবিশিষ্ট রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেটের (RuBP) সাথে যুক্ত হয়ে একটি ৬- কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড সৃষ্টি করে। রুবিস্কো এনজাইম (rubisco)কে ১, ৫- বিসফসফেটের সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করে। ক্যালভিন চক্রে CO_2গ্রাহক হলো রাইবুলোজ ১, ৫- বিসফসফেট। [৬ অণু CO_2 অংশগ্রহণের ফলে ৬ অণু কিটো এসিড তৈরি হয়।]

২. ৬- কার্বন বিশিষ্ট কিটো এসিড সাথে সাথেই ভেঙ্গে গিয়ে ৩- কার্বন বিশিষ্ট দুই অণু ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড সৃষ্টি করে। ক্যালভিন চক্রে ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড হলো প্রথম স্থায়ী পদার্থ। [৬ চক্রে ১২ অনু3PGA তৈরি হয়।]

৩. ATP হতে একটি ফসফেট, এক অণু ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে ১, ৩- বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড (BPGA)সৃষ্টি করে। এখানে একটি ATP খরচ হয় এবং একটি ADP ও P_i সৃষ্টি হয়। [১২ অণু 3PGA হতে ১২ অণু BPGA তৈরি হয়। ১২ টি ATP খরচ হয় এবং ১২ টি ADP মুক্ত হয়]

৪. ১, ৩- বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড(BPGA) কে $NADPH_2$ বিজারিত করে ৩- ফসফো গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড সৃষ্টি করে। এখানে প্রতি অণু BPGA-এর একটি ফসফেট হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং NADP মুক্ত হয়। গ্লিসার‍্যালডিহাইড ৩- ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। [১২ অণু BPGA হতে ১২ 3PGA অণু তৈরি হয়। ১২ টি $NADPH_2$ অংশ গ্রহণ করে এবং ১২ টি NADP ও P_i মুক্ত হয়]

৫. এক অণু ৩- PGALD ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ এনজাইমের সহায়তায় এক অণু DHAP-এ পরিণত হয়।

৬. এক অণু ৩- PGALD ও এক অণু DHAP পরস্পর যুক্ত হয়ে অ্যালডোলেজ এনজাইমের সহায়তায় -এ ফ্রুক্টোজ ১, ৬- বিসফসফেট উৎপন্ন করে।

৭. ফ্রুক্টোজ ১, ৬- বিসফসফেট, ফ্রুক্টোজ ১, ৬- বিসফসফাটেজ এনজাইমের সহায়তায় এক অণু ফসফেট মুক্ত করে ফ্রুক্টোজ -৬-ফসফেটে পরিণত হয়।

৮. ফ্রুক্টোজ -৬-ফসফেটে ও এক অণু ৩- ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড যুক্ত হয়ে একটি ৪ কার্বন যুক্ত শর্করা (এরিথ্রোজ-৪-ফসফেট) ও একটি ৫ কার্বন যুক্ত শর্করা (জাইলুলোজ-৫- ফসফেট)। ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।

৯. এরিথ্রোজ-৪- ফসফেট যৌগটি ডাই-হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যালডোলেজ এনজাইমের সহায়তায় সেডোহেপ্টুলোজ- ১, ৭- বিসফসফেট উৎপন্ন করে।

১০. সেডোহেপ্টুলোজ- ১, ৭- বিসফসফেট পরবর্তী পর্যায় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে সেডোহেপ্টুলোজ -৭- ফসফেট পরিণত হয়।

১১. সেডোহেপ্টুলোজ -৭- ফসফেট যৌগটি এক অণু ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমের সহায়তায় এক অণু রাইবোজ-৫- ফসফেট ও এক অণু জাইলুলোজ-৫-ফসফেট উৎপন্ন করে।

১২. রাইবোজ-৫- ফসফেট আইসোমারেজ এনজাইমের সহায়তায় রাইবুরোজ-৫-ফসফেটে পরিণত হয় এবং জাইলুলোজ-৫- ফসফেট এপিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় রাইবুরোজ-৫- ফসফেটে পরিণত হয়।

১৩. এক অণু ৩- PGALD ও এক অণু DHAP পরস্পর যুক্ত হয়ে অ্যালডোলেজ এনজাইমের সহায়তায় ফ্রুক্টোজ ১, ৩- বিসফসফেট উৎপন্ন করে।

১৪. ক্যালভিন চক্রের শেষ পর্যায় রাইবুলোজ-৫- ফসফেটে যৌগটি ফসফোরাইবুলোজ কাইনেজ এনজাইমের সহায়তায় ATP যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রাইবুলোজ ১, ৫- বিসফসফেটের (RuBP) গঠন করে। এই রাইবুলোজ ১, ৫- বিসফসফেট পুনরায় CO_2 গ্রহণ করে এই চক্র চালু রাখে।

১৫. ৩- ফসফো গ্লিসার‍্যালডিহাইড, আইসোমারেজ এনজাইমের সহায়তা ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট-এ রূপান্তরিত হয় এবং পরে এক অণু ৩- ফসফো গ্লিসার‍্যাল্ডিহাইড ও ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট মিলিত ভাবে সৃষ্টি করে এক অণু ফ্রুক্টোজ ১, ৬ বিসফসফেট। ফ্রুক্টোজ ১, ৬ বিসফসফেট পরে ফ্রুক্টোজ-৬ ফসফেটে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায় গ্লুকোজ অনুতে পরিণত হয়। গ্লুকোজ বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করায় পরিণত হয়।

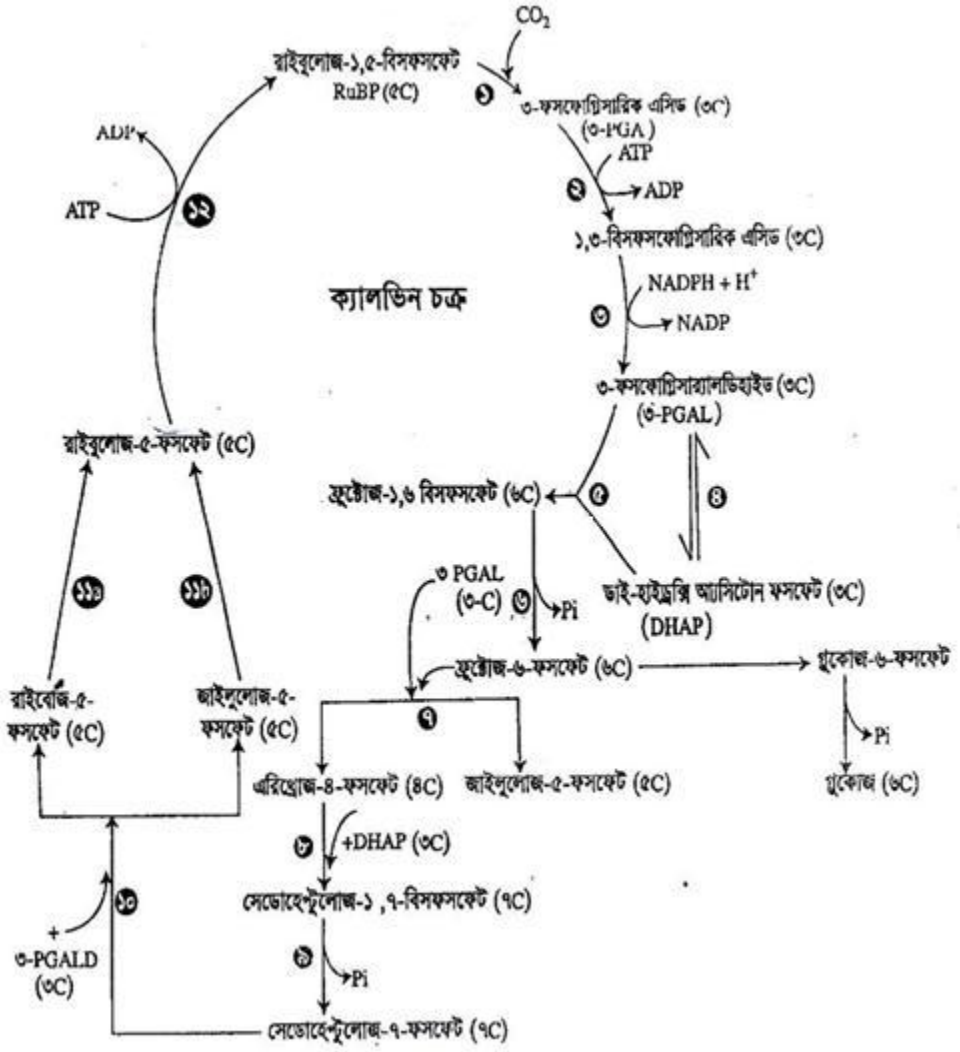

চিত্র: ক্যালভিন চক্র

হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র (Hatch and Slack cycle)

১৯৬৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানী M.D Hatch এবং C.R. Slack লক্ষ করেন যে, কোন কোন উদ্ভিদে ফসফোইনল পাইরুভিক এসিড প্রথমে CO_2 গ্রহণ করে এবং ৪-কার্বন বিশিষ্ট জৈব এসিড অক্সালো এসিটিক এসিড উৎপন্ন হয়। CO_2 আত্তীকরণের এ নতুন পথকে হ্যাচ ও স্ল্যাক গতিপথ বা C_4 চক্র বা ডাই-কার্বোক্সিলিক চক্র বা বিটা কার্বোক্সিলেশন পথ বা কো-অপারেটিভ ফটোসিনথেসিস বলে। যে সকল উদ্ভিদে এ চক্র সংগঠিত হয় তাদের কে C_4 উদ্ভিদ বলে । ১৯৭০ সালে CO_2 আত্তীকরণের নতুন পথ হ্যাচ ও স্ল্যাক গতিপথ বা C_4 চক্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। C_4 উদ্ভিদগুলো অন্তর্গঠনের দিক দিয়ে বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ। এদের পত্রের পরিবহন কলার চতুর্দিকে বান্ডেলসীথ থাকে। বান্ডেলসীথকে ঘিরে এক বা একাধিক স্তর যুক্ত মেসোফিল কোষ থাকে। এ ধরনের অন্তর্গঠনকে 'Kranz anatomy' বলে। অর্থাৎ এদের দু'প্রকার ক্লোরোপ্লাষ্ট থাকে- ১) মেসোফিল ক্লোরোপ্লাষ্ট এবং ২) বান্ডেলসীথ ক্লোরোপ্লাষ্ট। ডাঁটা, ভূটা, ইক্ষু, বাজরা, মুথাঘাস এবং কয়েকটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে এ চক্র সম্পন্ন হয়।

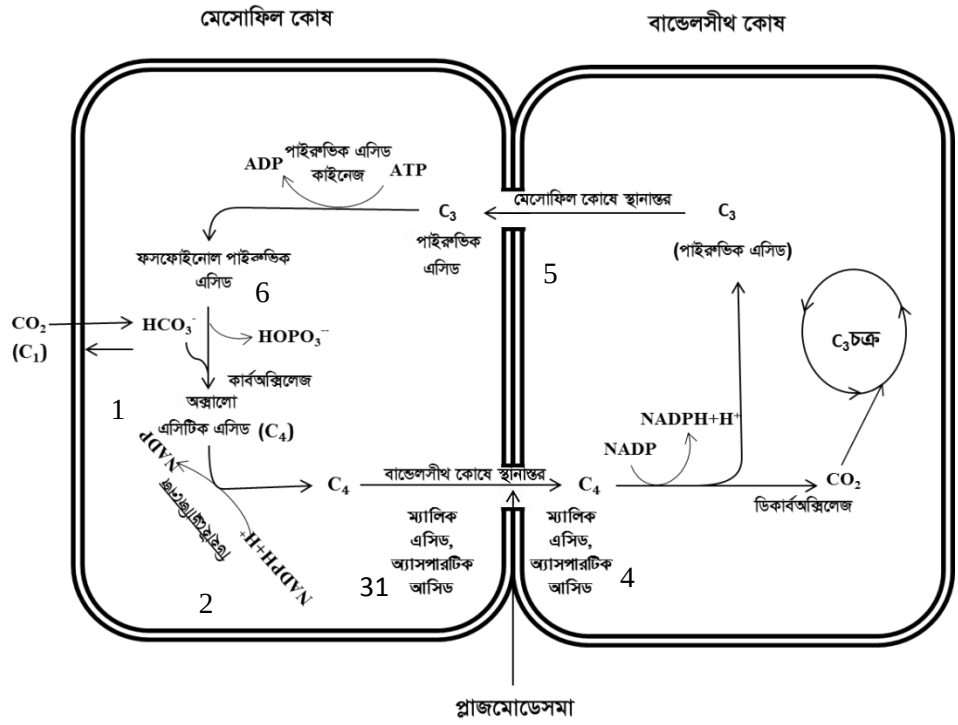

চিত্র : হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র

পাতার মেসোফিল কোষ এবং বান্ডেলসীথ কোষ সম্মিলিত ভাবে এই গতি পথ সম্পন্ন করে। ফসফোইনোল পাইরুভেট কার্বঅক্সিলেজ ও অর্থফসফেট ডাইকাইনেজ এনজাইম মেসোফিল কোষে এবং ডিকার্বঅক্সিলেজসমূহ ও ক্যালভিন চক্রের সকল এনজাইম বান্ডেলসীথ কোষে সীমাবদ্ধ থাকে।

১. মেসোফিল কোষে বায়ুস্থ CO_2 (হিসেবে অংশগ্রহণ করে) ফসফোনাইল পাইরুভিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড সৃষ্টি হয়। কার্বঅক্সিলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।

২. অক্সালো এসিটিক এসিড পরে ৪-কার্বন বিশিষ্ট ম্যালিক এসিড অথবা অ্যাসপারটিক এসিডে পরিণত হয়। ডিহাইড্রোজিজে এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। আবার এ পথের প্রথম স্থায়ী জৈব পদার্থ চার কাবর্নবিশিষ্ট বলে একে C_4-চক্র নামেও ডাকা হয়।

৩. ম্যালিক এসিড বা অ্যাসপারটিক এসিড মেসোফিল কোষ থেকে বান্ডেলসীথ কোষে প্রবেশ করে।

৪. বান্ডেলসীথ কোষে ম্যালিক এসিড বা অ্যাসপারটিক এসিড এক অণু CO_2 উৎপন্ন করে ৩ কার্বন বিশিষ্ট পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়। NADP থেকে $NADPH_2$ উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় সৃষ্ট CO_2 তখন বান্ডেলসীথ ক্লোরোপ্লাষ্টে রাইবুলোজ ১, ৫- বিসফসফেটের সাথে মিলিত হয়ে ক্যালভিন চক্রে অংশগ্রহণ করে। ডিকার্বঅক্সিলেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।

৫. অন্যদিকে পাইরুভিক এসিড প্লাসমোডেসমাটা দিয়ে মেসোফিল ক্লোরোপ্লাষ্টে স্থানান্তরিত হয়।

৬. পাইরুভিক এসিড মেসোফিল কোষে ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়। কাইনেজ এনজাইম এ বিক্রিয়ায় সহযোগিতা করে। একটি ATP থেকে একটি ADP তৈরি হয়।
ফসফোইনোল পাইরুভিক এসিড পুনরায় CO_2 গ্রহণ করে অক্সালো এসিটিক এসিড তৈরি করে এবং চক্রটি চালু রাখে। দেখাযাচ্ছে C_4 উদ্ভিদে একই সাথে হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র এবং ক্যালভিন চক্র পরিচালিত হয়। C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ হার বেশি এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বেশি।

সালোক সংশ্লেষণের প্রভাবকের ভূমিকা

সালোকসংশ্লেষণ কতগুলো প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রভাবকগুলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ।

(ক) বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ :

১। **আলো** - সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য প্রস্তুতকরণে যে শক্তির প্রয়োজন তা সূর্যালোক হতে এসে থাকে । সূর্যালোক ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। আলোর প্রভাবে পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত হয়, CO_2 পাতায় প্রবেশ করে এবং শর্করা প্রস্তুত করে। তাই একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অলো বাড়ালে সালোকসংশ্লেষণের হার বাড়ে। আলোর বর্ণালির সাতটি রঙের মধ্যে লাল,কমলা,নীল ও বেগুনি অংশই সালোকসংশ্লেষণে বেশি ব্যবহৃত হয়। আলোর পরিমাণ বেড়ে গেলে পাতার অভ্যন্তরীণ অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়, তাই সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

২। **কার্বন ডাই অক্সাইড** - কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া চলতে পারে না । কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারনের ফলেই হয়ে থাকে । উদ্ভিদ বায়ুমন্ডল থেকে CO_2গ্রহণ করে থাকে। বায়ুমন্ডলে CO_2 এর পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ শতকরা এক ভাগ পর্যন্ত CO_2 ব্যবহার করতে পারে, তাই বায়ুমন্ডলে CO_2এর পরিমাণ ১% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালোকসংশ্লেষণের পরিমানও বেড়ে যায়।

৩। **পানি** - কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো পানিও এ প্রক্রিয়ার একটি কাঁচামাল। CO_2 বিজারণের প্রয়োজনীয় H^+ পানি থেকে আসে পানির পরিমান হ্রাস পেলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারও কমে যায়। তাই সালোকসংশ্লেষণ কমে যেতে পারে। অপরপক্ষে পানির উপস্থিতিই রক্ষীকোষকে স্ফীত করে এবং পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। ফলে CO_2অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কাজেই পানির পরিমান কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে আসে।

৪।**তাপমাত্রা** - সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে । সাধারণত অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (0^0C এর কাছাকাছি) এবং অতি উচ্চ তাপমাত্রায় (৪৫^0C এর উপরে) এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না। তবে ৪৫^0C এর উপরে উঠলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। উদ্ভিদের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে কাঙ্খিত তাপমাত্রা ২২^0C - ৩৫^0C পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৫। **অক্সিজেন** - বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেড়ে গেলে অধিকাংশ উদ্ভিদেই সালোকসংশ্লেষণের হার কিছুটা কমে যায়। আর ঘনত্ব কমে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায়।

৬। **খনিজ পদার্থ** - ক্লোরোফিল তৈরির জন্য লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। মাটিতে এসব খনিজ পদার্থের অভাব হলে ক্লোরোফিল তৈরী কমে যায়, ফলে সালোকসংশ্লেষণ হারও কমে যায়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

১। **পাতার বয়স** - পাতার বয়সও সালোকসংশ্লেষণে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কচি পাতা ও বৃদ্ধ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কম থাকে বলে সালোকসংশ্লেষণ কম হয়। মাঝারি বয়সের পাতাই অধিক পরিমাণে সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

২। **পাতার অন্তর্গঠন** - পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতি বিশেষ করে মেসোফিল কোষের বিন্যাস ও প্রকৃতি, পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করে।

৩। **ক্লোরোফিল** - ক্লোরোফিলই সূর্যালোকের শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রুপান্তরিত করে কার্বন বিজারণে সাহায্য করে। কাজেই ক্লোরোফিল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান । ক্লোরোফিলের অনুপস্থিতিতে কিছুতেই এ প্রক্রিয়া চলতে পারে না।

৪। **শর্করার পরিমাণ** - পাতার অভ্যন্তরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

৫। **পটাসিয়াম** - পটাসিয়ামের অভাবে সালোকসংশ্লেষণের পরিমাণ কমে যেতে দেখা যায়। কারণ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অণুঘটক হিসেবে পটাসিয়াম কাজ করে।

৬। **এনজাইম** - বহু ধারাবাহিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কাজেই বিক্রিয়া সম্পন্নকারী প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপস্থিতি ও পরিমাণ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৫.৩ : শ্বসন প্রক্রিয়া

প্রতিটি জীবের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন । শক্তির মূল উৎস সূর্য । সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসাবে শর্করা ও অন্যান্য জৈব যৌগে সঞ্চয় করে রাখে। শ্বসন প্রাক্রিয়ায় এ সমস্ত স্থৈতিক শক্তি গতি শক্তি রুপে মুক্ত হয় এবং ATP-এর মধ্যে আবদ্ধ হয়। এছাড়াও আরও কিছু উচ্চ শক্তিধর যৌগের (NADPH, NADPH) সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত শক্তিধারণকারী যৌগ জীবের বিপাক কাজের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়।

যে শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জটিল জৈব যৌগ জারিত হয়ে সরল যৌগে পরিণত হয় এবং স্থৈতিক শক্তি গতি শক্তিতে রুপান্তরিত হয় সে প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলে। শর্করা হল প্রধান শ্বাসনিক বস্তু। এ ছাড়া ফ্যাট, প্রোটিন এবং জৈব এসিড সমূহ শ্বসনিক বস্তু হিসেবে কাজ করে।

শ্বসনের প্রকার ভেদ : অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে শ্বসনকে দুভাগে ভাগ তরা যায়। যথা : (ক) সবাত শ্বসন এরং (খ) অবাত শ্বসন

(ক) **সবাত শ্বসন (Aerobic Respiration):** যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোন শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণরুপে জারিত হয়ে পানি ও বিপুল পরিমাণ শক্তি ইৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে।

সবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণটি নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O + 673 \text{ কিলোক্যালরি শক্তি}$$

সবাত শ্বসনের প্রক্রিয়াকে চার পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা : (১) গ্লাইকোলাইসিস, (২) অ্যাসিটাইল কো এনজাইম তৈরি, (৩) ক্রেব্‌স চক্র, (৪) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম

(১) গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis)

গ্লাইকো অর্থ চিনি এবং লাইসিস অর্থ ভাঙ্গন। যে প্রক্রিয়ায় এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। গ্লাইকোলাইসিস বিক্রিয়াগুলো আবিস্কারের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীরা হলেন Embden, Meyerhof এবং Parnas । তাদের নামানুযায়ী গ্লাইকোলাইসিকে সংক্ষেপে EMP পথও বলা হয়। এসব বিক্রিয়ার জন্য মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন নাই তবে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ায় কোন বাধাঁ সৃষ্টি করে না। গ্লাইকোলাইসিসে অংশ গ্রহণ করার জন্য সকল শ্বসনিক বস্তুকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হতে হয়। গ্লুকোজে থেকে গ্লাইকোলাইসিস আরম্ভ হয়ে পাইরুভিক এসিড তৈরির মাধ্যমে শেষ হয়। গ্লাইকোলাইসিস সবাত এবং অবাত শ্বসনের প্রথম ধাপ। গ্লাইকোলাইসিসের ধাপগুলো ধারাবাহিক ভাবে নিম্নরুপ:

(i) গ্লুকোজ, ATP হতে একটি ফসফেট গ্রহণ করে গ্লুকোজ-৬-ফসফেট যৌগ ও ADP প্রস্তুত করে। এ বিক্রিয়ায় হেক্সোকাইনেজ এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী।

(ii) গ্লুকোজ-৬-ফসফেট, ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ এনজাইমের প্রভাবে ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট-এ পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(iii) ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট, ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে ATP উপস্থিতিতে ফ্রুক্টোজ-১, ৬-বিসফসফেট-এ রূপান্তরিত হয় এবং একটি ADP তৈরি করে। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(iv) ফ্রুক্টোজ-১, ৬-বিসফসফেট ভেঙ্গে এক অণু ৩- ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে-এ পরিণত হয়।। এ বিক্রিয়ায় অ্যালডোলেজ এনজাইম ক্রিয়াশীল হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী। আইসোমারেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় ৩- ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে পরস্পর একটি অন্যটিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

(v) ৩ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড এক অণু জৈব ফসফেট গ্রহণ করে ফসফোগ্লিসার‍্যালডিহাইড ডিহাইড্রজিনেজ এনজাইমের প্রভাবে ১, ৩- বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড- এ পরিণত হয়। অজৈব ফসফেট ও NAD অংশগ্রহণ করে এবং $NADH+H^+$ সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(vi) ১, ৩- বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড, ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড-এ পরিণত হয়। ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

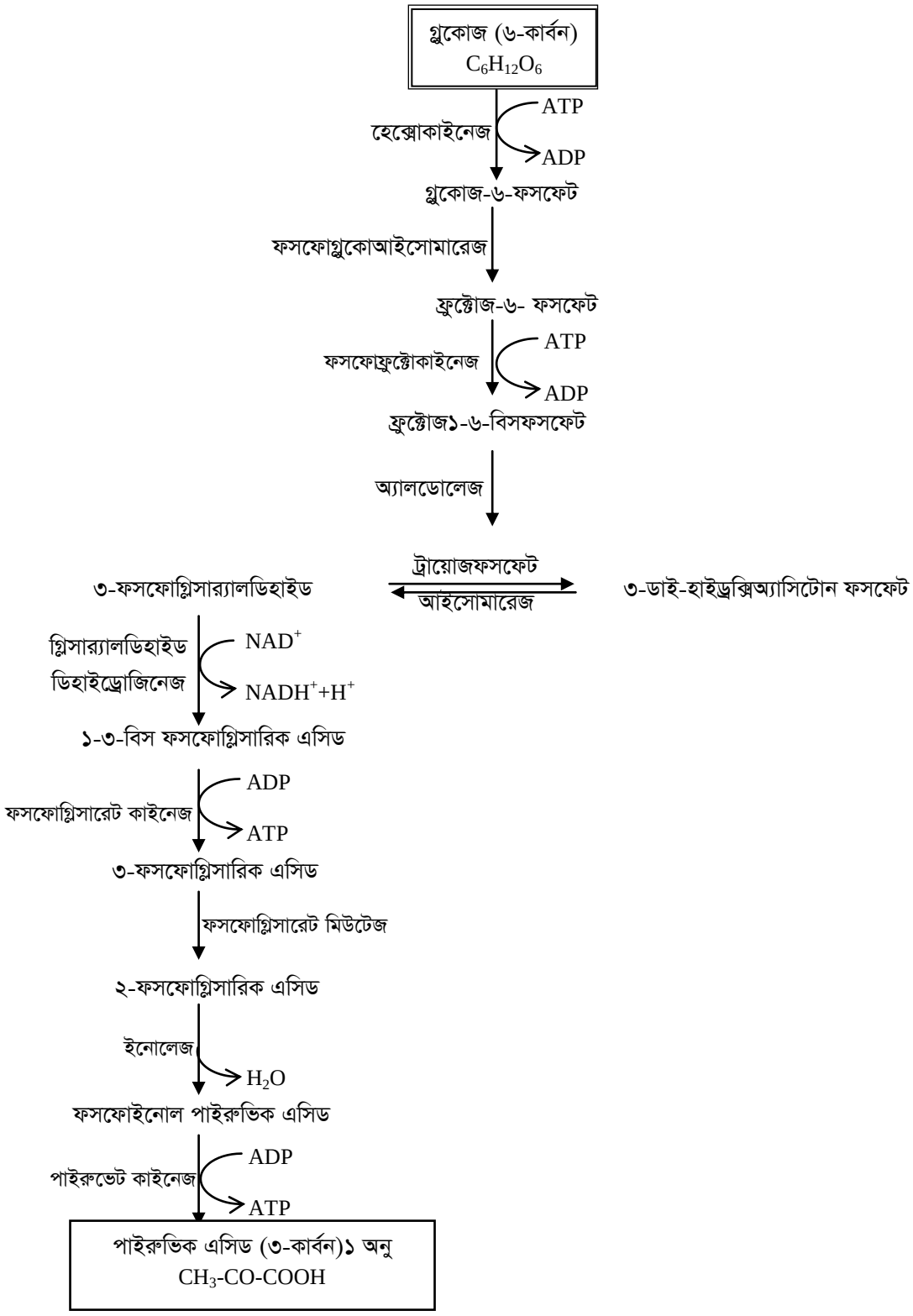

চিত্র : গ্লাইকোলাইসিসের রেখাচিত্র

(vii) ১, ৩- বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড, ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড-এ পরিণত হয়। ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(viii) ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড, ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ এনজাইমের প্রভাবে ২- ফসফোগ্লিসারিক এসিডে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(ix) ২- ফসফোগ্লিসারিক এসিডে, ইনলেজ এনজাইমের প্রভাবে ২- ফসফোইনল পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি দ্বিমুখী।

(x) ফসফোনাইল পাইরুভিক এসিডে, পাইরুভিক এসিডে কাইনেজ এনজাইমের প্রভাবে পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়। ADP হতে একটি ATP তৈরি হয়। বিক্রিয়াটি একমুখী। গ্লুকোজে থেকে হয় পাইরুভিক এসিডে তৈরির মাধ্যমে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার শেষ হয়।

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় প্রতি অণু গ্লুকোজে জারিত হয়ে ২ অণু পাইরুভিক এসিডে তৈরি হয়। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় মোট ৪ অণু ATP উৎপন্ন হয় এবং ২ অণু ব্যয় হয় ফলে নিট ২ অণু ATP জমা হয়। এছাড়াও ২ অণু $NADH+H^+$ পাওয়া যায়।

(২) অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ তৈরি (Formation of Acetyl Co-A)

গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেবস চক্রর মধ্যে সেতুবন্ধন রচনাকারী বস্তুর নাম অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ। গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পাইরুভিক এসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে 'কো এনজাইম-এ'-এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ তৈরি হয়। অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ ক্রেবস চক্রর অংশ নেয়। মাইটোকন্ড্রিয়ায় অ্যাসিটাইল কো এনজাইম সৃষ্টি হয়। এ চক্রে নিট উৎপাদন দুই অণু $NADH_2$ ।

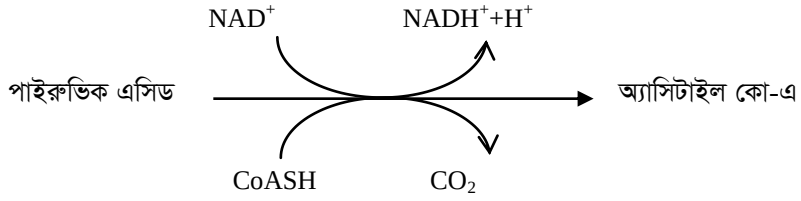

চিত্র : অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ তৈরি

(৩) ক্রেবস চক্র (Krebs cycle) :

অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ-এর অক্সিজেন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জারণের ফলে CO_2 পানি ও শক্তি উৎপাদনকারী চক্রটিকে ক্রেবস চক্র বলে। ১৯৭৩ সালে প্রাণ রসায়নবিদ হ্যান্স এ. ক্রেবস এ চক্রটি আবিস্কার করেন বলে একে ক্রেবস চক্র বলা হয়। এ চক্রের প্রথম উৎপাদিত বস্ত সাইট্রিক এসিড। এ কারণে চক্রটিকে সাইট্রিক এসিড চক্র (Citric acid cycle) বলে। এ চক্রে উৎপন্ন কয়েকটি এসিডে তিনটি কার্বক্সিল গ্রুপ (COOH) থাকে তাই একে ট্রাইকার্বক্সিল এসিড চক্র বা TCA চক্র বলে। চক্রটি মাইটোকন্ড্রিয়ায় অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ:

১. সাইট্রিক সিন্থেটেজ এনজাইমের প্রভাবে অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ এক অণু পানি ও অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডের সাথে মিলিত হয়ে সাইট্রিক এসিড ও কো এনজাইম-এ তৈরি করে।

২. অ্যাকোনাইটেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় Fe^{2+} এর উপস্থিতিতে সাইট্রিক এসিড থেকে এক অণু পানি রিয়োজিত হয়ে সিস-অ্যাকোনাইটিক এসিড উৎপন্ন হয়।

৩. অ্যাকোনাইটেজ এনজাইমের প্রভাবে সিস-অ্যাকোনাইটিক এসিড এক অণু পানি গ্রহণ করে। ফলে আইসোসাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হয়।

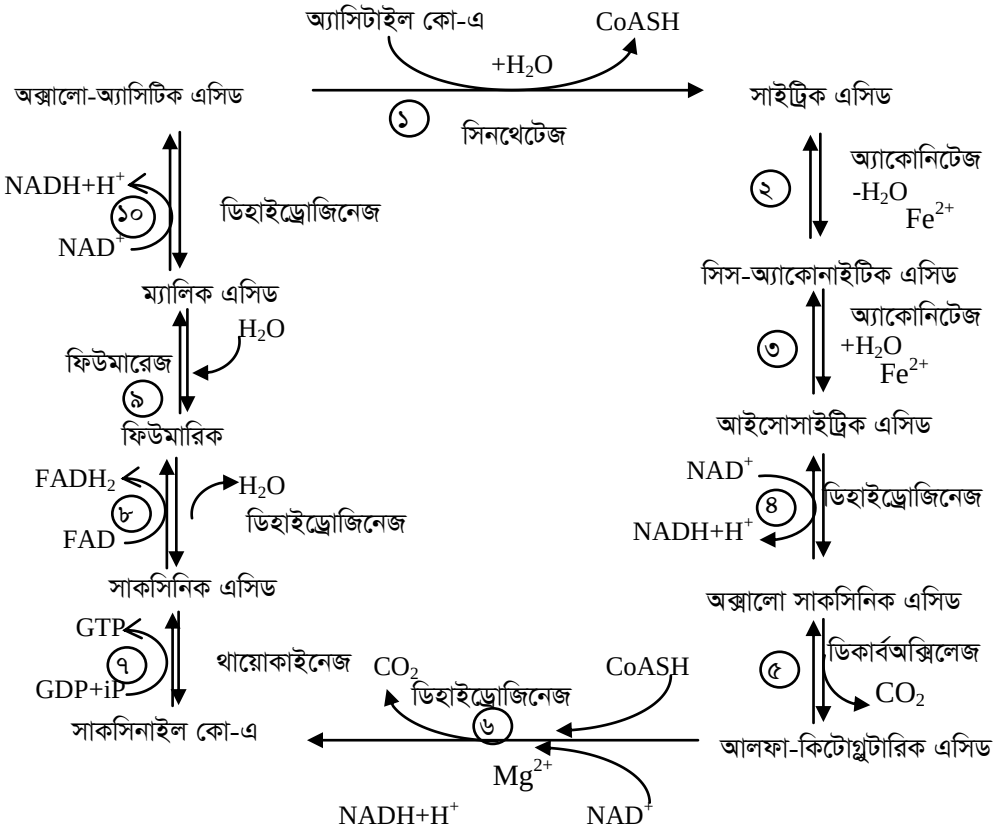

চিত্র: ক্রেবস চক্রের রেখাচিত্র

৪. আইসোসাইট্রিক ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম এবং NAD এর প্রভাবে জারিত হয়ে অক্সালো সাকসিনিক এসিড উৎপন্ন করে । NAD বিজারিত হয়ে $NADH+H^+$-তে পরিণত হয়।

৫. ডিকার্বঅক্সিলেজ এনজাইমের প্রভাবে অক্সালো সাকসিনিক এসিড থেকে এক অণু CO_2 এবং এক অণু আলফা-কিটোগ্লুটারিক এসিড উৎপন্ন হয়।

৬. ডিহাইড্রোজিনেজ আলফাকিটোগ্লুটারিক এসিড, কো এনজাইম এবং NAD বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ফলে এক অণ CO_2, $NADH+H^+$ এবং সাকসিনাইল কো-এ উৎপন্ন হয়।

৭. সাকসিনাইল থায়োকাইনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় সাকসিনাইল কো-এ, GDP এবং একটি অজৈব ফসফেট বিক্রিয়ায় অংশগ্রহল করে। ফলে কো এনজাইম-এ, GTP এবং সাকসিনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

৮. FAD এর উপস্থিতিতে এবং সাকসিনিক এসিড ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় সাকসিনিক এসিড ফিউমারিক এসিডে পরিণত হয় এবং $FADH_2$ উৎপন্ন হয়।

৯. ফিউমারেজ এনজাইমের প্রভাবে ফিউমারিক এসিড এক অণু পানি গ্রহণ করে ম্যালিক এসিড উৎপন্ন হয়।

১০. ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতায় এবং NAD এর উপস্থিতিতে ম্যালিক এসিড অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিডে পরিণত হয় এবং $NADH+H^+$ উৎপন্ন হয়। অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড পুনরায় ক্রেবস চক্রর অংশ নেয়।

ক্রেবস চক্রের ফলে নিট উৎপাদন- ৪ অণু CO_2,৬ অণু $NADH+H^+$, ২ অণু $FADH_2$ এবং ২ অণু GTP ।

(৪) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (Eloctron Transport System, ETS)

সবাত শ্বসনের যে অংশ $NADH+H^{+,}$ $NADPH+H^{+}$ এবং $FADH_2$ হতে ইলেকট্রন কতগুলো বাহকের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয় এবং ইলেকট্রনের এই স্থানান্তর কালে ATP তৈরি ও সবশেষ পানি উৎপন্ন করে তাকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (ETS) বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃআবরণীতে NAD, FAD কো-এনজাইম Q এবং সাইটোক্রোম এনজাইমসমূহ (Cyt.b, Cyt.c, Cyt.a এবং $Cyt.a_3$) নিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম গঠিত। এরা শক্তিমাত্রার ক্রমধারায় (উচ্চ শক্তি মাত্রা থেকে নিম্নশক্তি মাত্রা) পর পর সজ্জিত এবং একটি হতে পরবর্তীটিতে ইলেকট্রন স্থানান্তর করতে সক্ষম। এক জোড়া ইলেকট্রন ETS এরে মাধ্যমে উচ্চ শক্তি মাত্রা হতে নিম্নশক্তি মাত্রায় ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হয়। ইলেকট্রনের এই স্থানান্তরের সময় যে শক্তি নির্গত হয় তা দিয়ে ADP এর সাথে ইনঅর্গানিক ফসফেট (Pi) সংযুক্ত হয়ে ATP তৈরি করে। ETS-এ ATP তৈরি প্রকিয়াকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফারাইলেশন । ETS মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে ঘটে।

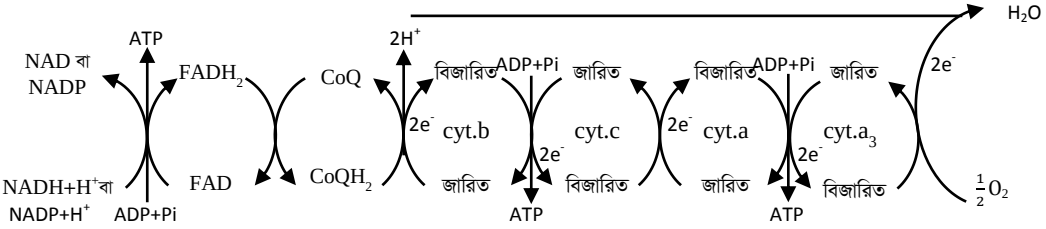

চিত্র: ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম

গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো এনজাইম-এ তৈরি এবং ক্রেবস চক্রে উৎপন্ন $NADH+H^{+}$, $NADPH+H^{+}$ এবং $FADH_2$, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত হয় এবং NAD, NADP, FAD ইত্যাদিতে পরিণত হয়। ETS-এ ইলেকট্রন প্রবাহকালে প্রতি $NADH+H^{+}$ (বা $NADPH+H^{+}$) হতে তিনটি এবং $FADH_2$ হতে দুটি ATP উৎপন্ন হয়। ATP উৎপন্ন হয় যথাক্রমে $NADH+H^{+}$ (বা $NADPH+H^{+}$) জারণের সময়, Cyt.b জারণের সময় এবং Cyt.a জারণের সময়।

সর্বনিম্ন শক্তি বলয়ে ইলেকট্রন $Cyt.a_3$ থেকে অক্সিজেনে স্থানান্তরিত হয়। বিজারিত কো-এনজাইম থেকে হাইড্রোজেন আয়ন ($2H^{+}$) FAD এর মাধ্যমে ইলেকট্রন সাইটোক্রোমগুলোর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে $\frac{1}{2}O_2$-এর সাথে মিলিত হয়ে পানি (H_2O) তৈরি হয়। কাজেই অক্সিজেনই হল ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা। ETS সবাত শ্বসনের একটি পর্যায় মাত্র, কাজেই এটি ছাড়া সবাত শ্বসন পূর্ণ হয় না।

গ্লাইকোলাইসিস	অ্যাসিটাইল কো-এ তৈরি	ক্রেবস চক্র	ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম	মোট ATP
2ATP	----------	----------	----------	= 2 ATP
$2NADH+H^{+}$	----------	----------	6 ATP	= 6 ATP
	$2NADH+H^{+}$	----------	6 ATP	= 6 ATP
		$6NADH+H^{+}$	18 ATP	= 18 ATP
		$2FADH_2$	4 ATP	= 4 ATP
		2ATP (2GTP থেকে)	----------	= 2 ATP
			(মোট)	= 38 ATP

সবাত শ্বসনে শক্তি উৎপাদনের হিসাব নিকাশ : সবাত শ্বসনে প্রতি অণ গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে CO_2, পানি ও শক্তি উৎপাদন করে।

এক অনু গ্লুকোজ থেকে ৬৮৬ কিলোক্যালরি শক্তি নির্গত হয় কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে মাত্র ৩৮০ কিলোক্যালরি কার্যকরী শক্তি পাওয়া যায়। বাকিটা তাপশক্তি হিসেবে নষ্ট হয়। একটি থেকে ১০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং এক অনু গ্লুকোজ থেকে কার্যকরী শক্তি হিসেবে $\frac{৩৮০\times১০}{৬৮৬} = ৫৫.৪\%$ শক্তি পাওয়া যায়।

(খ) অবাত শ্বসন (Aerobic Respiration)

যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অণুপস্থিতিতে কোন শ্বাসনিক বস্তু অসম্পূর্ণ জারণের ফলে সামান্য পরিমান শক্তি ও বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগ উৎপাদন হয় তাকে অবাত শ্বসন রলে। অবাত শ্বসনের প্রক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা :(১) গ্লাইকোলাইসিস ও (২) পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

(১) গ্লাইকোলাইসিস (Aerobic Respiration): যে প্রক্রিয়ায় এক অণ গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। অবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস সবাত শ্বসনের মত।

(২) পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণ(Aerobic Respiration): গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাইরুভিক এসিড অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল কিংবা ল্যাকটিকএসিড উৎপন্ন হয়।

ইথাইল অ্যালকোহল সৃষ্টি (Aerobic Respiration): ব্যাকটেরিয়া এবং ঈষ্ট কোষে এ প্রক্রিয়া দেখা যায়। কার্বঅক্সিলেজ এনজাইমের প্রভাবে পাইরুভিক এসিড CO_2 ত্যাগ করে দুই কাবর্নবিশিষ্ট অ্যাসিটালডিহাইড উৎপন্ন করে। এর পর ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের প্রভাবে থেকে দুটি হাইড্রোজেন স্থানান্তরিত হয়ে অ্যাসিটালডিহাইডকে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত করে।

ল্যাকটিক এসিড সৃষ্টি (Aerobic Respiration): প্রাণীর পেশিকোষে এবং কিছু ব্যাকটেরিয়ায় এ প্রক্রিয়া দেখা যায়। ল্যাকটিক ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের প্রভাবে পাইরুভিক এসিড গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন $NADH+H^+$ থেকে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয় কিন্তু কোন CO_2 তৈরি হয়না।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সালোকসংশ্লেষণ কী? 'সৌরশক্তিকে প্রাণিদেহে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম সালোকসংশ্লেষণ'- ব্যাখ্যা করুণ।

২. সালোকসংশ্লেষণের দুইটি বাহ্যিক ও দুইটি অভ্যন্তরীণ প্রভাবকের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৩. গ্লাইকোলাইসিস কী? সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইসিসে নীট উৎপন ATP এর হিসেব ছকে দেখান।

৪. ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম কী ?

৫. পাইরুভিক এসিডের অসম্পূর্ণ জারণে কি উৎপন্ন হয় বিক্রিয়া সহ লিখুন।

৬. এক অনু গ্লুকোজ থেকে ৫৫.৪% কার্যকরী শক্তি কীভাবে পাওয়া যায় ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

৩. অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন কীভাবে চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাখ্যা করুন।

৪. অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনর ধাপসমূহ চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

৫. ক্যালভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের পার্থক্য লিখুন।

৬. ক্রেবস চক্রটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখান।

৭. হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখান।

৮. এক অনু গ্লুকোজ থেকে কিভাবে ৫৫.৪% শক্তি পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

References:

- জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), গাজী আজমল ও সফিউর রহমান, গাজী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল: জুন ২০১৫ খ্রি:
- উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র :উদ্ভিদবিজ্ঞান), ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১০১৬খ্রি:
- জীববিজ্ঞান (প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), প্রফেসর জিতেন্দ্র নাথ রায় এবং অন্যান্য, কবির পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল:জুন ২০১৫ খ্রি:
- Becoming a secondary School Science Teacher, Leslie W. Trowbridge & Rodger W. Bybee, Merrill Publising Company, A bell & Howell Compay, Columbus, Ohio 43216, Published 1986.

ইউনিট ৬ : জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে গঠিত হয় পরিবেশ। এ পরিবেশ শুধু একটি বা দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয় না। পরিবেশ তার বিভিন্ন উপাদান নিয়ে স্ব মহিমায় বিবর্তিত হতে থাকে। এ উপাদান গুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- আলো, পানি, মাটি, বায়ু অন্যতম। প্রাকৃতিক এ উপাদান গুলো ছাড়া ও পরিবেশে জীব ও জড় পদার্থের উপস্থিতি অন্যতম। উপাদান সমূহের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে। প্রাণিকূলের মধ্যে যেমন- অনুজীব (প্লাংকটন) হতে- স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে তেমনি গুল্ম জাতীয় উদ্ভদ হতে কাস্টল উদ্ভিদ রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো পরস্পরের সাথে বিভিন্ন উপাদান বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্ক সরল বা জটিল হতে পারে। সম্পর্ক যত জটিল হবে জীব কুলের মধ্যে আন্ত: সম্পর্ক ততো গভীর হবে। পরিবেশও ততটাই উন্নত হবে। তাই বলা যায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল যে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তাকে বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) বলে। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

৬.১ বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের আন্ত:সম্পর্ক , জীববৈচিত্র্য ও এর প্রকারভের্দ

৬.২ অনুসন্ধানমূলক কাজ: একটি নির্বাচিত পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান

৬.৩ বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব ,স্থলজ, জলজ ও মরুজ পরিবেশে জীবের অভিযোজন

৬.১ বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমূহের আন্ত:সম্পর্ক

বাস্তুতন্ত্র (Ecology) শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে অনেকের মতে জার্মান প্রাণিবিজ্ঞানী Ernst Haeckel, ১৮৬৬ খ্রি. পরিবেশ এবং তার জীবজ উপাদান সমূহের মধ্যে আন্ত: সম্পর্ককে Oekologie বলে অ্যাখায়িত করেন। বস্তুত ১৮৫৭ সালে Henry David Thoreau জীববিজ্ঞান ও পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনায় Ecology শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি এর সংজ্ঞা প্রদান করেননি। পরিবেশবিদ্যা (ecology) এর বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকেই বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ecosystem। **বৃটিশ পরিবেশবিদ A.G. Tensely ১৯৩৫ খ্রি. ইকোসিস্টেম শব্দটি ব্যবহার করেন।**

বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা

বিভিন্ন জড় ও জৈব বস্তু সমূহের কার্যকারিতায় উদ্ভিদ, প্রাণী, আর অণুজীবকুল পরস্পরের মধ্যে যে ভৌত রাসায়নিক পরিবেশ তৈরি হয় তাকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

পরিবেশ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বাস্তবিদ্যাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. প্রাণিবাস্তুবিদ্যা
২. উদ্ভিদবাস্তুবিদ্যা

ইকোসিস্টেম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। জীবজগত (Biosphere) কে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইকোসিস্টেম। এর পরবর্তী বড় ইকোসিস্টেম হল সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম। [Environmental Biology. P.S. Verma P-107] এছাড়াও অন্যান্য ইকোসিস্টেম গুলো হল-

১. স্বাদু পানির ইকোসিস্টেম (limnic)।
২. অর্ধ পার্থিব (Semiterrestial) ইকোসিস্টেম।
৩. পার্থিব (Terrestrial) ইকোসিস্টেম।
৪. শিল্প নগর (Urban industrial) ইকো সিস্টেম।
৫. বৃহৎ (Macro) ইকোসিস্টেম।
৬. মাঝারি (Meso) ইকোসিস্টেম।
৭. ছোট (Micro) ইকোসিস্টেম।
৮. অতি ছোট (Nano) ইকোসিস্টেম।

ইকোসিস্টেমের উপাদান সমূহ

ইকোসিস্টেমের উপাদান সমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. জড় (Abiotic) উপাদান।
২. সজীব (Biotic) উপাদান।

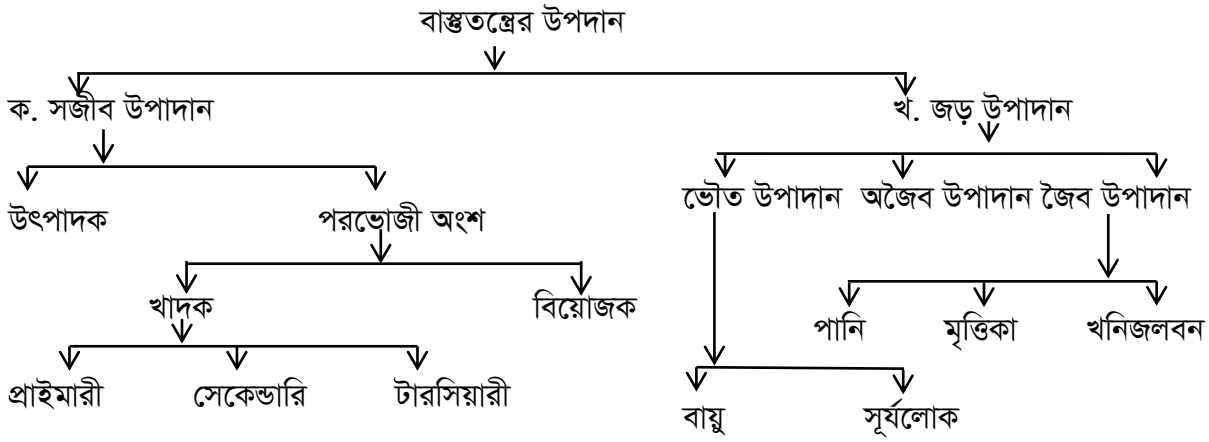

বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

সজীব উপাদান

বাস্তুতন্ত্রের প্রধান দুটি উপাদানের মধ্যে একটি হল সজীব উপাদান। এ সজীব উপাদান গুলো মূলত বাস্তুতন্ত্রকে বিভিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদকুল সর্বদাই প্রাণীকুলের খাদ্য সরবারহের প্রধান উৎস। এরা উৎপাদক হিসেবে কাজ করে।

উৎপাদককে ভক্ষণ করে প্রাণিকুল। এদেরকে খাদক বলা হয়। খাদক খাবার গ্রহণের ভিত্তিতে তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তৃতীয় স্তরের খাদক। একটি পুকুরের ইকোসিস্টেমে ছোট মাছ/ ব্যাঙ হল ১ম স্তরের খাদক। বড় মাছ হল ২য় স্তরের খাদক এবং হাসঁ/অন্যান্য পাখি ৩য় স্তরের খাদক। তবে ইকোসিস্টেমের পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদক ও খাদকেরও পরিবর্তন ঘটে।

সমস্ত উৎপাদক এবং খাদকের মৃত্যুর পরে দেহ মাটিতে পড়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সহায়তায় এদের পঁচন সংঘটিত হয়। এদেরকে বিয়োজক বলে। এ বিয়োজকের কারণে ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ অব্যাহত থাকে। তাই বিয়োজক (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) ইকোসিস্টেমের উপাদান সমূহের মধ্যে শক্তি প্রবাহ বজায় রাখার মাধ্যমে আন্তঃ সম্পর্ক বজায় রাখে।

বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমূহের আর একটি অন্যতম অংশ হল জড় উপাদান। এর জড় উপাদানের অন্যতম হল বায়ু ও সূর্যালোক। বাস্তুতন্ত্রের এ দুটি উপাদান ছাড়া বাস্তুতন্ত্র প্রায় অচল। সকল সজীব উপাদান তাদের কার্যক্রমের জন্য এ দুটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আলো ও বায়ু এর তারতম্যের জন্য সজীব উপাদানেরও পার্থক্য হয়।

পানি, মৃত্তিকা ও খনিজ লবণ বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের জন্য মাতৃতুল্য বলা যায়। কারণ এ উপাদানগুলো না থাকলে সজীব উপাদান সমূহের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। এ উপাদান গুলোর পরিমানের কম বেশি হলে ঐ বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদানের পরিমান, সংখ্যা ও গুণগত পার্থক্য ঘটে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাস্তুতন্ত্রের একটি উপাদানের উপর অন্য একটি উপাদান নির্ভরশীল। কোন বাস্তুতন্ত্রের কোন একটি উপাদানের ঘাটতি বা বাড়তি অন্য উপাদানের উপর প্রভাব ফেলে। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, সজীব ও জড় বস্তু সমূহের মধ্যে আন্ত: সম্পর্কই ইকোসিস্টেমকে সচল রাখে।

জীববৈচিত্র্য এর প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বলতে জীবের বৈচিত্র্যকে (Biological diversily) বুঝায়। জীবজগত অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সমন্বয়ে গঠিত। এ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের মধ্যে ব্যাপক বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি একই প্রজাতির মধ্যেও (মানুষ বা বিড়াল বা বানর) রয়েছে বিচিত্রতা। এ বিচিত্রতা তাদের বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের উপযোগী করে তোলে অর্থাৎ তারা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের সিংহ ও আফ্রিকান সিংহ একই প্রজাতির হলেও এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষা করা যায়। এ পার্থক্যগুলো তাদের স্ব-স্ব পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত।

Hamilton এর সংজ্ঞানুযায়ী Biodiversity is the variety of life অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে, অন্তরীক্ষে, স্বাদুপানি ও সামুদ্রিক জলাশয়ে অবস্থানরত সকল প্রকার জীবের মধ্যে বিয়োজিত (জীনগত, বাসস্থানগত, প্রজাতিগত) বিভিন্নতাকে Biological Biodiversity বা জীববৈচিত্র্য বলে। সহজভাবে বলা যায়, পৃথিবীর বুকে বিরাজমান জীবের মধ্যে বিরাজিত সকল ধরনের বৈচিত্রময়তাকেই জীব বৈচিত্র বলে। Biodiversity শব্দ সর্বপ্রথম ব্যবহার করে E.O Wilson ১৯৮৫ খ্রি.।

জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

জীবের বিচিত্রতার কারণ তিন ধরনের বলে ধারণা করা হয়।

ক. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity)

খ. প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity)

গ. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Eco-system Diversity)

ক. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) ঃ একই বা ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে জিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাই জিনগত বৈচিত্র্য। এটি বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি গঠনে সহায়তা করে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে জীনগত পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। এ জীনকে কাজে লাগিয়ে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্যারাইটি বা জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

খ. প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity) ঃ একই বা ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পরিবেশের তারতম্যের কারণে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে। এ বৈচিত্র্য একই প্রজাতির মধ্যে হলে তাকে অন্তঃ প্রজাতিক বৈচিত্র্য এবং ভিন্ন প্রজাতির হলে তাকে অন্তঃ প্রজাতিক বৈচিত্র্য বলে।

গ. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Eco-system Diversity) ঃ পরিবেশের তারতম্যের (যেমন– সমভূমি, সুউচ্চভূমি, মরুভূমি) কারণে জীবের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে।

৬.২ অনুসন্ধানমূলক কাজঃ একটি নির্বাচিত পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান

অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান দক্ষতা এবং চিন্তন দক্ষতা যাচাই করা হয়। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিনের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষক বিষয়টি নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের পর্যবেক্ষণ টুলস/সিডিউল /প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষক করে দিবেন। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তথ্য সংগ্রহ যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থী ও পরিবার, প্রতিবেশী এবং নিকট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থী যেন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। বিজ্ঞান বিষয়সমূহের জন্য তথ্যসংগ্রহ গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে হতে পারে। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দিবেন। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থী তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফলের উপর মতামত দিবেন। সমগ্র কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পন্ন কাজের বর্ণনা থাকবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দিবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন। নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। শিক্ষক যে কোন নম্বরের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ দিতে পারেন। তবে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন করার ধাপসমূহ

১)সমস্যা নির্বাচনঃ সমস্যা নির্বাচন বা সমস্যা চিহ্নিত করা হচ্ছে অনুসন্ধানমূলক কাজের প্রথম ধাপ। শিখনফল ও বিষয়বস্তুর আলোকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়কে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

২) উদ্দেশ্য নির্ধারণ: সমস্যা নির্বাচন করার পর অনুসন্ধানমূলক কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। এ কাজ শুরু করার পূর্বে কাজটি কেন করা হবে এবং কাজের ফলাফল থেকে কী জানা যাবে তা নির্বাচন করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কোনো গবেষণা শুরু করার পূর্বে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে।

৩)অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: অনুমিত সিদ্ধান্ত হল সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনুমান নির্ভর ধারণা। এটিও গবেষণা শুরু করার পূর্বে নির্ধারণ করতে হয় এবং ধারণা প্রমাণ করার লক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৪) পরিকল্পনা প্রনয়ন: অনুসন্ধানমূলক কাজের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রনয়ন করা। পরিকল্পনায় থাকবে-- তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রকাশিত দলীল পত্র কীভাবে পর্যালোচনা করা হবে তার বর্ণনা। যেমন-তথ্য সংগ্রহ বা সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য প্রশ্নমালা ইত্যাদি।

- তথ্য সংগ্রহের পরিধি- কোথায় বা কতজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে বা কোন দলিলপত্র পরীক্ষণ করা ইত্যাদি।
- সময় নির্ধারণ:
- কী উপকরণ ব্যবহার হবে:
- প্রতিবেদনটি কীভাবে রচনা করা হবে : প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দিবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন।

৫)TOOLS তৈরি

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা, চেকলিষ্ট, পর্যবেক্ষণ সিডিউল ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। এ ধরনের টুলস এমন ভাবে তৈরি করতে হয় যাতে

---প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ না পড়ে।

অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হয়।

সকলের নিকট সহজ বোধগম্য হয়।

৬) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ : সাধারণত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স ,শ্রেণি ও নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

৭) তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধকরণ : বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও চাহিদা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধ করতে হয়। প্রয়োজন অনুসারে চার্ট, গ্রাফ কিংবা সারণী ব্যবহার করতে হবে।

৮)তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রস্তুত : অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যর আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর মন্তব্যই হচ্ছে বিশ্লেষণ। গড়, শতকরা হার, তুলনা, আকার, আকৃতি, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির সাহায্যে মন্তব্য করতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়।

৯)সুপারিশ প্রনয়ন : তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ও উদ্দেশ্যের আলোকে সুপারিশ প্রনয়ন করতে হয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

১০) প্রতিবেদন প্রনয়ন : অনুসন্ধানমূলক কাজে সংগঠিত সকল কার্যক্রমের আলোকে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদনের শুরুতে অনুসন্ধানমূলক কাজের শিরোনাম শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি, রোল নং তত্বাবধানকারী শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকা ,উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা বিন্যস্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

নবম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ের একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ

১) সমস্যা নির্বাচন : পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান

২) উদ্দেশ্য নির্ধারণ : একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে জড় ও সজীব উপাদান থাকে। এগুলো একটির উপর অপরটি নির্ভরশীল। কোন কারণে একটির সমস্যা হলে অপরটিরও সমস্যা হবে। কারণ এ উপাদানগুলো মূলত বাস্তুতন্ত্রকে বিভিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমূহের আর একটি অন্যতম অংশ হল জড় উপাদান। এর জড় উপাদানের অন্যতম হল পানি, মৃত্তিকা, খনিজ লবন, বায়ু ও সূর্যালোক। সকল সজীব উপাদান তাদের কার্যক্রমের জন্য এ উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান গুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমন্বয়ে গঠিত। উদ্ভিদকুল সর্বদাই প্রাণীকুলের খাদ্য সরবারহের প্রধান উৎস। এরা উৎপাদক হিসেবে কাজ করে। উৎপাদককে ভক্ষণ করে প্রাণিকুল। এদেরকে খাদক বলা হয়। খাদক খাবার গ্রহণের ভিত্তিতে তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- একটি পুকুরের ইকোসিস্টেমে ছোট মাছ/ ব্যঙ হল ১ম স্তরের খাদক। বড় মাছ হল ২য় স্তরের খাদক এবং হাসঁ/অন্যান্য পাখি ৩য় স্তরের খাদক। সমস্ত উৎপাদক এবং খাদকের মৃতহদেহ মৃত্যুর পরে মাটিতে পড়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সহায়তায় এদের পচন সংঘটিত হয়। এদেরকে বিয়োজক বলে। এ বিয়োজকের কারণে ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ অব্যাহত থাকে। এ ভাবে পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপাদান সমূহের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক বজায় থাকে।

৩) অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ : নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুমিত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহন করা যেতে পারে-

ক) পানি, মৃত্তিকা, খনিজ লবন বায়ু ও সূর্যালোক এর তারতম্যের জন্য সজীব উপাদানের পার্থক্য হয়।

খ) এ উপাদান গুলোর পরিমানের কম বা বেশি হলে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদানের পরিমান, সংখ্যা ও গুণগত কম বা বেশি হয়।

গ) পুকুরের পানি দূষনের কারণে পুকুরের মাছ মরে যায়।

৪) পরিকল্পনা প্রনয়ন

তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি-

- তথ্য সংগ্রহের পরিধি : শিক্ষার্থীর এলাকার একটি পুকুরের পাশের দশজন পুরুষ ও পাঁচ জন নারী যাদের পুকুর ও মাছ চাষ সম্পর্কে জ্ঞান আছে। । যেখানে পুকুর না থাকবে সেখানে যে কোন জলাশয়ের পাশে জরীপ করতে হবে।
- সময় নির্ধারণ : যে কোন মাসের দুইটি শুক্রবার। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে শিক্ষকের সহায়তায় মাসের যে কোন একদিন।
- উপকরণ ব্যবহার : উপকরণ হবে প্রশ্নমালা। প্রশ্নমালা হবে অবশ্যই বদ্ধপ্রশ্ন। দুই বা পাঁচ মাত্রা স্কেলে প্রনয়ন করতে হবে। এ ছাড়া ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থাকবে।
- প্রতিবেদনটি কীভাবে রচনা করা হবে : প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দিবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন।

৫)TOOLS তৈরি : দুই মাত্রা স্কেলে প্রশ্নমালা প্রনয়ন করা যেতে পারে এভাবে-

সঠিক উত্তরে টিক দিন।

ক) পুকুরে পানি কমে গেলে পুকুরের মাছ মরে যায়- ১) হাঁ ২)না

খ) পুকুরে পানি দূষিত হলে পুকুরের মাছ মরে যায়- - ১) হাঁ ২)না

গ) পুকুরে শেওলা সহ অন্যান্য উদ্ভিদ বেশী হলে পুকুরের মাছ মরে যায়- - ১) হাঁ ২)না

ঘ) যে পুকুরে সূর্যালোক পড়েনা সে পুকুরের মাছ বড় হয়না- - ১) হাঁ ২)না

ঙ) মাছ চাষের পুকুর তৈরির সময় চুন ব্যবহার না করলে মাছ চাষের কাংখিত ফল পাওয়া যায়না- - ১)হাঁ ২)না

৬) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ : দশজন পুরুষ ও পাঁচ জন নারী যাদের পুকুর ও মাছ চাষ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাঁদের কাছে প্রশ্নমালা দেয়া হবে। উত্তর সংগ্রহের পাশাপাশি তাঁদের মতামত নেয়া হবে। কারণ তাঁরা এ অনুসন্ধানের ফোকাস গ্রুপ।

৭) তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধকরণ

প্রশ্ন	হ্যাঁ%	না%
ক)পুকুরে পানি কমে গেলে পুকুরের মাছ মরে যায়	৮৯%	১১%
খ)পুকুরে পানি দূষিত হলে পুকুরের মাছ মরে যায়	৮৬%	১৪%
গ)পুকুরে শেওলা সহ অন্যান্য উদ্ভিদ বেশী হলে পুকুরের মাছ মরে যায়	৯০%	১০%
ঘ) যে পুকুরে সূর্যালোক পড়েনা সে পুকুরের মাছ বড় হয়না	৭৮%	২২%
ঙ) মাছ চাষের পুকুর তৈরির সময় চুন ব্যবহার করলে মাছ চাষের কাংখিত ফল পাওয়া যায়	৮৭%	১৩%

৮) তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও এবং ফলাফল প্রস্তুত

ক) পুকুরে পানি কমে গেলে পুকুরের মাছ মরে যায় এর উত্তরে হাঁ বলেছেন ৮৯% এবং না বলেছেন ১১%। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পুকুরে পানি কমে গেলে অবশ্যই পুকুরের মাছ মরে যায়।

খ) পুকুরে পানি দূষিত হলে পুকুরের মাছ মরে যায় এর উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন ৮৬% এবং না বলেছেন ১৪%। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পুকুরে পানি দূষিত হলে অবশ্যই পুকুরের মাছ মরে যায় ।

গ) পুকুরে শেওলা সহ অন্যান্য উদ্ভিদ বেশী হলে পুকুরের মাছ মরে যায় এর উত্তরে হাঁ বলেছেন ৯০% এবং না বলেছেন ১০%। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পুকুরে শেওলা সহ অন্যান্য উদ্ভিদ বেশী হলে অবশ্যই পুকুরের মাছ মরে যায়।

ঘ) যে পুকুরে সূর্যালোক পড়েনা সে পুকুরের মাছ বড় হয়না এর উত্তরে হ্যাঁ বলেছেন ৭৮% এবং না বলেছেন ২২%। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে পুকুরে সূর্যালোক পড়েনা অবশ্যই সে পুকুরের মাছ বড় হয় না।

ঙ) মাছ চাষের পুকুর তৈরির সময় চুন ব্যবহার করলে মাছ চাষের কাংখিত ফল পাওয়া যায় এর উত্তরে হাঁ বলেছেন ৮৭% এবং না বলেছেন ১৩%। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মাছ চাষের পুকুর তৈরির সময় চুন ব্যবহার করলে অবশ্যই মাছ চাষের কাংখিত ফল পাওয়া যায়।

অনুমিত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল-

ক) পানি, মৃত্তিকা, খনিজ লবণ বায়ু ও সূর্যালোক এর তারতম্যের জন্য সজীব উপাদানের পার্থক্য হয়।

খ) এ উপাদান গুলোর পরিমানের কম বেশি হলে একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদানের পরিমান, সংখ্যা ও গুণগত দিক কম বেশি হয়।

গ) পুকুরের পানি দূষণের কারণে পুকুরের মাছ মরে যায়।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে উপরের অনুমিত সিদ্ধান্ত সঠিক।

৯) সুপারিশ প্রনয়ন : তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের একটি উপাদানের উপর অন্য একটি উপাদান নির্ভরশীল। কোন বাস্তুতন্ত্রের কোন একটি উপাদানের ঘাটতি বা বাড়তি অন্য উপাদানের উপর প্রভাব ফেলে। উপরিউক্ত অনুসন্ধান হতে বলা যায় যে, সজীব ও জড় বস্তু সমূহের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কই পুকুরের বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখে।

১০) প্রতিবেদন প্রনয়ন : অনুসন্ধানমূলক কাজ শেষে সাদা কাগজে অ্যাসাইনমেন্ট লেখার নিয়ম অনুসরণ করে প্রতিবেদন প্রনয়ন করতে হবে। তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের উপর মতামত প্রদান সহ অনুসন্ধানমূলক কাজের একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে।

৬.৩ বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের প্রভাব

প্রত্যেক প্রাণী অন্যান্য উদ্ভিদকূলের সাথে বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে শক্তি ও পুষ্টি প্রবাহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিবেশে একটি সিস্টেম গঠন করে যাকে ইকোসিস্টেম বলে। এ ইকোসিস্টেমের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের উপর মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল থাকে। তাই ঐ পরিবেশে যদি জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় তবে তা ঐ অঞ্চলের মানবজাতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

পরিবেশের ও জলবায়ুর পরিবর্তনে জীব বৈচিত্র্য

আজ হতে প্রায় ১০০-১৫০ বছর পূর্বে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদেশ যে বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল তেমনি প্রাণীকুলের আধার ছিল। শুধু এ দেশে নয় সারা পৃথিবীতেই এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে এ জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন। সেই সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও নানারকমের প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে জীববৈচিত্র্য যেমন ক্ষতিগ্রস্থ তেমনি প্রাকৃতিক ভারমাস্যও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ কারণে বলা যায় যে, বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

অভিযোজন : অভিযোজন হলো কোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকে থাকা। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন-

১. কোন অঙ্গের বিলুপ্তি বা অর্জনের মাধ্যমে।
২. বাসস্থানের সাথে শরীরের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে
৩. কোন অঙ্গের সুবিধাজনক রূপান্তরের মাধ্যমে।

স্থলজ পরিবেশে জীবের অভিযোজন: যে সকল উদ্ভিদকুল স্থলজ পরিবেশে বাস করে, তাদেরকে স্থলজ উদ্ভিদ বা Terrestrial plants বলে। শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্থলজ উদ্ভিদকুল দু ধরনের-

1. Mesophytes
2. xerophytes

১। Mesophytes উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদ স্বাভাবিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় জন্মায় তাদেরকে Mesophyte উদ্ভিদ বলে। যেমন: আম, গম, সয়াবিন ইত্যাদি। Mesophyte উদ্ভিদের নিম্নোক্ত অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

i) এদের মূল ও কান্ড পরিণত।
ii) সম্পূর্ণ পরিবহনতন্ত্র বিদ্যমান।
iii) পাতার উভয়দিকে পত্ররন্ধ্র অবস্থিত।
iv) এদের কোন পানি সংরক্ষণ প্রকোষ্ট নাই।
v) প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে পারে।

চিত্র: Mesophytes উদ্ভিদ

২। Xerophytes উদ্ভিদ : যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও উষ্ণ পরিবেশে জন্মায় এবং টিকে থাকে তাদেরকে xerophytes উদ্ভিদ বলে। এদেরকে মরুজ উদ্ভিদ ও বলা যায়। যেমন- Opuntia, Cactus, Aloevera। এ সকল উদ্ভিদের মরুময় পরিবেশ সহ্য করার জন্য নিম্নোক্ত অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

১. এদের মূল মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত থাকে।
২. গাছগুলো ঝোপঝাড়পূর্ণ, শাখা-প্রশাখা যুক্ত ও অনেক পুরু বাকল দ্বারা আবৃত থাকে।
৩. প্রস্বেদনের হার কমানোর জন্য এদের পাতাগুলো ছোট হয়ে থাকে।
৪. কিছু ক্ষেত্রে পাতা কাঁটায় রুপান্তরিত হয়।
৫. পাতার গভীরে স্টোমাটা বিদ্যমান থাকে, এগুলো গাছ হতে পানি বের হতে বাধা দেয়।

চিত্র: Xerophytes উদ্ভিদ উদ্ভিদ

এছাড়াও যেসকল প্রাণীকূল স্থলে/ভূমিতে বসবাস করে এবং ঐ স্থানে তাদের সকল জৈবিক কার্যাবলী সম্পন্ন করে তাদেরকে স্থলবাসী (Terrestrial) প্রাণী বলে। স্থলবাসী প্রাণীদের জীবন ধারণের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. Cursorial প্রাণীকূল	উন্মুক্ত জায়গায় বসবাস করে এবং দৌড়ানোর জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন- সিংহ।
২. Fossorial প্রাণীকূল	গর্তখুড়ে বসবাস করতে অভ্যস্ত। যেমন-ইঁদুর।
৩. Arboreal প্রাণীকূল	কোন কিছু (গাছে) আরোহনে অভ্যস্থ। যেমন-কাঁঠবিড়াল।

৪. Aerial প্রাণীকূল — শূণ্যে বা বায়ুতে উড্ডয়নে সক্ষম। যেমন-পাখি।

৫. Desert প্রাণীকূল — উষ্ণ আবহাওয়া ও মরুভূমিতে বসবাসে সক্ষম। যেমন-উট।

Cursorial প্রাণিকূল

Fossorial প্রাণিকূল

Arboreal প্রাণিকূল

Aerial প্রাণিকূল

Desert প্রাণিকূল

মরুজ পরিবেশে জীবের অভিযোজন : মরুজ পরিবেশে জীবের অভিযোজন স্থল পরিবেশে জীবের অভিযোজনের একটি অংশ মাত্র। স্থলজ পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজনে উদ্ভিদের মরুজ অভিযোজন আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল প্রাণী মরুভূমিতে বাস করে এবং তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ মরুভূমিতেই সম্পন্ন করে তাদেরকে মরুজ প্রাণী বলে। যেমন- উট।

প্রাণীদের মরুজ অভিযোজনের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল-

১. এদের শরীরের ত্বক শুষ্ক এবং ভীতিকর কাঁটা বিদ্যমান।
২. এদের উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু ক্ষমতা আছে।
৩. এদের পানি ধারণ করে রাখার জন্য বিশেষ অঙ্গ বিদ্যমান। যেমন-উট
৪. এরা আকারে বেশ বড় হয় ।

জলজ পরিবেশে জীবের অভিযোজনঃ যে সকল উদ্ভিদ জলে জন্মায় তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ (Aquatic plant) বলে। যেমন- শাপলা, কচুরি পানা ইত্যাদি। জলজ উদ্ভিদ তিন ধরনের হতে পারে। যথা-

১. পানিতে মুক্ত ভাসমান উদ্ভিদ। যেমন- Wolffia,
২. পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদ। যেমন-Hydrilla.
৩. পানিতে ভাসমান কিন্তু মূল মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদ। যেমন-Lotus, water Lilly.

জলজ উদ্ভিদের নিম্নোক্ত অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় :

১. মূল তেমন উন্নত নয়।
২. এসকল উদ্ভিদের শরীরে এক ধরনের মোমের ন্যায় আবরণ আছে যা তাদের পানিতে পঁচন হতে রোধ করে।
৩. এদের বায়ু প্রকোষ্ট রয়েছে যা পানিতে ভাসতে সহায়তা করে।
৪. পরিবহন টিস্যুতন্ত্র তেমন উন্নত নয়।
৫. এদের পর্বমধ্যগুলো, দীর্ঘ, সরু, নমনীয় ও স্পঞ্জের ন্যায়।

জলজ পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণী সমুহের মধ্যে নিম্নোক্ত অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়ঃ

১. এদের দেহ Streamlined অর্থাৎ দেহের উভয় প্রান্ত চাঁপা।
২. এদের মাথা ভোঁতা এবং লেজ লম্বা।
৩. দেহ আঁইশ দ্বারা আবৃত, বায়ুথলি বিদ্যমান।
৪. এদের যুগ্ম ও অযুগ্ম পাখনা বিদ্যমান যা পানিতে সাঁতার কাটতে সহায়তা করে।
৫. ফুলকা বিদ্যমান যা পানিতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সহায়তা করে।
৬. দেহে পার্শ্বরেখা (Lateral line) বিদ্যমান যা অনুভূতি অঙ্গের ন্যায় কাজ করে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জীববৈচিত্র্য কাকে বলে?
২। বাস্তুতন্ত্র কী?
৩। জড় ও সজীব উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করুন?

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১। জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
২। জলজ পরিবেশের জীবের অভিযোজন ব্যাখ্যা করুন।
৩। প্রাণীর মরুজ অভিযোজন ব্যাখ্যা করুন।
৪। পরিবেশের উপর জীববৈচিত্র্যের প্রভাব বর্ণনা করুন?
৫। নবম শ্রেণির জীববিজ্ঞান বিষয়ের একটি অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা করুন।
৬। স্থলজ ও জলজ পরিবেশে জীবের অভিযোজনের মধ্যে তুলনা করুন।

References :

1. Verma, P. S., Cell Biology Genetics Evolution and Ecology, 1991, twelfth
    a. edition, S.Chand & Company Ltd, Ram Nagar, New Delhi-110055.
2. Verma, P. S., Environmental Biology, 2007 (Reprint), S. Chand & Company
    a. Ltd, Ram Nagar, New Delhi-110055.
3. Odum, E. P., Fandamental of Ecology, 1991, Third edition, Press of W. B. Saunders Company library of congress Calalog card number- 76-81826.
4. Kormondy, E. J., Concept of Ecology, 1996, fourth edition, Prentice-Hall of India Private Limited, M-97, Connaught Circus, New Delhi- 110001.
5. নবী, শাহ. আহমদ., বায়োডাইভার্সিটি এন্ড কনজারভেশন, ২০১৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, কবির পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
6. নবী, শাহ. আহমদ., ইকোলোজি ও পরিবেশ দূষণ, ২০০৩, প্রথম প্রকাশ, তাজ ট্রেডার্স (প্রাঃ) লিঃ, ১১অন্দর কিল্লা,চট্রগ্রাম।
7. www.goole.com এর image থেকে সব ছবি গৃহীত।

ইউনিট ৭ : জীববিজ্ঞান শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

জ্ঞান অর্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্বকরণ ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে শিক্ষক। শিক্ষক একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব যার মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা। এই সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ পায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ এমনভাবে স্থাপন ও সাজানো উচিত যাতে শ্রেণি কক্ষটি সহজেই শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নিজ গৃহে ছেলেমেয়েরা যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ঠিক তেমনি আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা দরকার। এ জন্য শ্রেণি কক্ষ থাকবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শ্রেণি কক্ষের চার দেয়ালে সাজানো থাকবে বিভিন্ন মনীষীদের ছবি বা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চার্ট, খোলা র‍্যাক কিংবা কাঁচের আলমারীতে সাজানো থাকবে বিভিন্ন রকম মডেল ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ,পর্যাপ্ত সংখ্যক বই, পত্রিকা ও সাময়িকী যা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ ব্যবহারিক, হাতে কলমে ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। শিক্ষকগণ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবেন এটা কাম্য। পৃথিবীর উন্নত বিশ্বের স্কুল/কলেজগুলোতে শিক্ষকগণ যেভাবে পাঠদান করে আসছে তাদের সাথে সমতা রক্ষা করে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। পুরনো ধ্যান ধারণা বাদ দিয়ে যুগোপযোগী পাঠদান পরিচালনাই আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। চীন দেশের একটি প্রবাদ হলো- A Picture is worth 1000 words অর্থাৎ একটি ছবি ১০০০ শব্দের চেয়ে শক্তশালী। তাই জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষনীয় শিক্ষা উপকরণ । এ অধ্যায়টি নিম্নরুপে বিন্যাস করা হয়েছে---

৭.১ জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য,

৭.২ শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (অধিক সংখ্যক, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রে)

৭.২ জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজ ও কাজের উদ্দেশ্য, জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের ধাপ ও পরিকল্পনা. জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নৈতিক মূল্যবোধ, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সতর্কতা

৭.৩ জীববিজ্ঞান শিখন সহায়ক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ

৭.১ জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য

- শিখনবান্ধব ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরন
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সফল বা অসফল সকল প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রদান করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের কাজ নিজেকে মূল্যায়ণ করতে দিবেন, একজনের কাজ অন্যকে দিয়ে মূল্যায়ন করতে দিবেন, অধিকাংশ শিক্ষার্থী একই ভুল করলে সঠিক উত্তরটি বোর্ডে লিখে দিবেন।
- শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীর নিরাময়ে পারগ শিক্ষার্থী ব্যবহার করবেন।
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করবেন।

জড়তা ও ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করণ:

- শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক রুঢ় আচরণ পরিহার করে সব সময় হাসি খুশি থাকবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর অপরগতায় শাস্তি প্রদানের মানসিকতা পরিহার করে সব সময় শিক্ষার্থীর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক আচরণ প্রদর্শন করবেন।
- সহানুভূতিশীল থাকবেন এবং শিক্ষার্থীর যোগযোগের কোন দুর্বলতা আছে কিনা সে বিষয়ে যত্নশীল থাকবেন।
- শিক্ষক শিখন শেখানো কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে সম্পৃক্ত করবেন এবং পাঠ সংশ্লিষ্ট আনন্দদায়ক পাঠ উপকরণ ব্যবহার করবেন।
- শিক্ষক পাঠ যাচাইকালে শিক্ষার্থীর সাথে সহনশীল আচরণ করবেন,
- শিক্ষার্থী সঠিক না বলতে পারলেও প্রশংসা করবেন এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়ন হচ্ছে এমন মনোভাব পোষণ করবেন।
- সহযোগিতার মাধ্যমে শিখন কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন।

শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনায় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা (অধিক সংখ্যক, স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রে) :

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় সমস্যাসমূহ নিম্নরুপ--

- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কষ্টসাধ্য
- ভৌত অবকাঠামোর সমস্যা
- শিক্ষকের উপস্থাপনা শুনতে না পাওয়া
- সময় ব্যবস্থাপনা করতে না পারা
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে না পারা
- সুচারুরূপে শিক্ষার্থীদের মেনটরিং করা কষ্টকর
- যথাযথ মূল্যায়ন করতে না পারা
- শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন কষ্টসাধ্য
- ফলপ্রসূভাবে শ্রেণির কাজ যাচাই ও তদারকি কষ্টকর
- সকল শিক্ষার্থীর নিকট বোর্ডের লেখা দৃষ্টিগোচর না হওয়া
- প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষকের করণীয়---

- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে কাজ দেয়া
- সতর্কতার সাথে শ্রেণি নির্দেশনা তৈরি করা
- দলগত কাজের ক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়ার পূর্বে দলে বিভক্ত করা উচিত নয়। এতে শিক্ষার্থীরা নির্দেশনার পরিবর্তে নতুন দলের সদস্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠতে পারে
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা
- উপস্থাপনা সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় হওয়া প্রয়োজন
- শিক্ষাউপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহন করানো
- শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করা যায় এমন পদ্ধতিতে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা
- দলগত মূল্যায়নে জোড় দেয়া
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে বা সহজেই বুঝতে পারে এমন উদাহরণ ব্যবহার করতে হবে।

৭.২ জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজ ও কাজের উদ্দেশ্য, জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের ধাপ ও পরিকল্পনা. জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নৈতিক মূল্যবোধ, নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সতর্কতা

বিজ্ঞানে ব্যবহারিক কাজ বলতে বুঝায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমান। এক্ষেত্রে শিখন উদ্দেশ্যর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগী অর্জিত হয়। **বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্য-**

- শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান ভীতি দূর হয়
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন
- পরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনাকে বাস্তবে রূপদান করা
- ঘটনার অনুসন্ধান করা
- শিক্ষার্থীকে কাজে দক্ষ করা
- বিজ্ঞান মনস্ক দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা
- পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়ানো
- শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানে পারদর্শী করা
- ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারা।
- শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন শক্তির বিকাশ ঘটানো।
- সর্বোপরি বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য।

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজের ধাপ ও পরিকল্পনা

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়--

- ব্যবহারিক কাজটি কি হবে তার একটি পরিকল্পনা করা
- সতর্কতার সাথে যথাযথ পদ্ধতি ও নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজটি সম্পন্ন করা
- পরীক্ষণের সময় প্রাসংগিক ও সঠিক পর্যবেক্ষণ করা, পাঠগ্রহণ এবং রেকর্ড রাখা
- ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজ

জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রথমেই যেটি করতে হবে তা হলো সঠিক নির্দেশনা প্রদান। বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যবহারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এনসিটিবি/বোর্ড কর্তৃক নির্দেশনা নিম্নরুপ--

- ব্যবহারিক কাজ তথা বিভিন্ন পরীক্ষা ও অনুসন্ধানসমূহকে পাঠ্যপুস্তকে তত্ত্বীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতিটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রতিটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারিক কাজটি সে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বীয় বিষয়বস্তু পাঠদানের সঙ্গেই সম্পন্ন করতে হবে।
- ব্যবহারিক কাজ সমাপ্ত করে খাতা/শিটে প্রতিবেদন তৈরি করে পরবর্তী সপ্তাহে শিক্ষকের কাছে অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং তা শিক্ষার্থীদের নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।
- এসএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় এই খাতা/শিটসমূহ অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

- ব্যবহারিক খাতা/শিটের জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্দ ।
- এসএসসি পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।
- এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে বিষয়ভিত্তিক ১টি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে যার নম্বর পনের।
- লটারির সাহায্যে নির্বাচিত পরীক্ষাটি শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার দিন প্রদর্শন করতে হবে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পরীক্ষা/অনুসন্ধানকাজসমূহ শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- এসএসসি পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভাইভার জন্য পাঁচ নম্বর বরাদ্ধ ।

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নৈতিক মূল্যবোধ

- সমস্ত উপকরণ পূর্বেই সংরক্ষণ করতে হবে
- পরীক্ষা কার্যক্রম সঠিক নিয়মে এবং ধৈর্য্য সহকারে করতে হবে
- সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- প্রাপ্ত ফলাফল সঠিক নিয়মে লিপিবদ্ধ করতে হবে
- প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে সুক্ষ চিন্তন করতে হবে
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে
- দলগতকাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সতর্কতা

জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজে নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে ও সতর্কতার ক্ষেত্রে করণীয়--

- জীব বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাশে শিক্ষক -শিক্ষার্থীকে অবশ্যই আপ্রোন পড়তে হবে
- ব্যবহারিক কাজের নির্দেশনা ভালভাবে পড়তে হবে
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে
- রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাপ সঠিক করে নিতে হবে
- ব্যবচ্ছেদকরণের সময় হাতে গ্লোবস পরে নিতে হবে
- পরীক্ষাগারে পর্যাপ্ত আলো, বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে
- পরীক্ষাগারে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখতে হবে
- পরীক্ষা কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পরিচালনা করতে হবে
- স্পর্শকাতর ব্যবহারিক কাজগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সতর্কতাগুলো বারবার জানাতে হবে
- পরীক্ষা শেষে সকল দ্রব্যাদি পরিষ্কার করে সঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখতে হবে
- কাজ শেষে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৭.৩ জীববিজ্ঞান শিখন সহায়ক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ

শিখন সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ: শিখন সহায়ক সামগ্রী বা শিক্ষা উপকরণ বলতে বুঝায় যে সমস্ত বস্তু বা দ্রব্য শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুকে আকর্ষনীয় ও অর্থবহ করে তোলে । কোনো বস্তু বা দৃশ্যের মৌখিক বর্ণনার চেয়ে বাস্তব বস্তু বা দৃশ্য অধিকতর দীপ্যমান। মুখের ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না ছবি তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে তোলে । ইংরেজীতে শিখন উপকরণকে এভাবে সঙ্গায়িত করা হয়- An object (such as a book, picture, or map) or device (such as a dvd or computer) used by a teacher to enhance or enliven classroom instruction .

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব: শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষা উপকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।শিক্ষাবিদ এডগার ডেল (Edgar Dale) তাঁর Cone of Learning এ দেখিয়েছেন শিখন অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর। Cone of Learning-এ দেখা যায়, কোন একটি শিখন শুধু পড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার ২ সপ্তাহ পর শিক্ষার্থীরা ১০% স্মরণ করতে পারে, শোনার মাধ্যমে হলে ২০%, দেখার মাধ্যমে হলে ৩০%, একই সাথে দেখা এবং শোনা হলে ৫০%, আলোচনার মাধ্যমে হলে ৭০% অপরদিকে বলা এবং করার (দলীয় কাজ, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, ব্যবহারিক কাজ, বাস্তবে দেখানো ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে হলে ৯০% পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা স্মরণ করতে পারে। যে কোন বিষয়ে পাঠদানের বেলায় প্রথমেই খুঁজতে হবে বাস্তব উপকরণ । একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোকাবেলায় শিখন শেখানো কার্যক্রমে নতুন সংযোজন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। শ্রেণিকক্ষে অন্যান্য উপকরণের পাশাপাশি ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ইন্টারনেট কানেকটিভিটি থাকবে যাতে করে শিক্ষক পাঠদানের সময় অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিমূর্ত, কঠিন, দুর্লভ বিষয়গুলো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। যে বিষয়গুলো সাধারণত: শ্রেণি কার্যক্রমে ভিজুয়াল, সিমুলেট এবং এ্যানিমেট করা সম্ভব হয় না সেগুলো শিক্ষক প্রজেক্টর ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দেখান। ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, স্ক্রিণ হলো শিক্ষকের পাঠদানের বিষয়টিকে আরো সহজে, বোধগম্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের একটি হাতিয়ার মাত্র যা কখনই শিক্ষকের বিকল্প নয় এবং এর অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন।

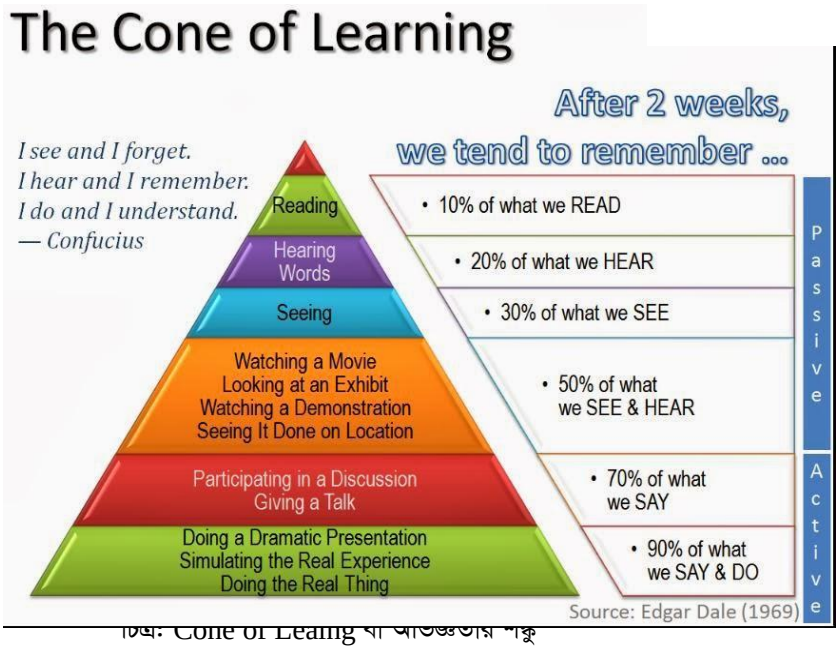

চিত্র: Cone of Learning বা অভিজ্ঞতার শঙ্কু

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে–

- পাঠকে আকর্ষণীয় করা যায় ।
- পাঠ জীবনভিত্তিক করা যায় ।
- শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন সহজ হয় ।
- পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় ।
- বিষয়বস্তু বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয় ।
- শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হয় ।
- শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক আত্মপ্রত্যায়ী হয় ।
- পাঠে গতিশীলতা রক্ষা হয়।
- শিখনফল অর্জন সহজ হয়।
- পাঠকে সকল শিক্ষার্থীর নিকট গ্রহণযোগ্য করা যায় ।
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় ।
- দলীয় কাজ করতে সহজ হয় ।
- সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয় ।

জীববিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ :

১. দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ
২. শ্রুতি নির্ভর উপকরণ
৩. শ্রবণ-দর্শন উপকরণ

(১) দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ : যে সকল উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে দৃস্টিগোচর করে পাঠের বিষয়কে সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয় করার চেস্টা করা হয় সেগুলোকে দৃশ্য বা দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষা উপকরণ আমরা জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারি । যেমন-

- **মডেল:** কোষ, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, চোখ, কান, হাইড্রা,অ্যামিবা, কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি ।
- **চার্ট:** মানব দেহের বিভিন্ন তন্ত্র, ফুল, ফল, মাছ, পাখি ইত্যাদি লেখাযুক্ত চার্ট ।
- **ছবি:** পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি,প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুল, ফল, গাছপালা ইত্যাদি ।
- **মানচিত্র:** মহাদেশ, মহাসাগর, উদ্ভিদ ও প্রাণির ভৌগোলিক অবস্থানগত মানচিত্র
- **পোষ্টার:** শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসচেতনতা তৈরি ,উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ক **পোষ্টার** ।
- **রাসায়নিক দ্রব্য: আলকোহল, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি,** ফরমালিন, লবণ ইত্যাদি।

(২) শ্রুতি নির্ভর উপকরণ : যে সব উপকরণ শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য করে তোলে সেগুলোকে শ্রাব্য উপকরণ বলা হয়। নিচের উপকরণসমূহ শ্রাব্য উপকরণের অন্তর্ভূক্ত। রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি।

(৩) শ্রবণ-দর্শন উপকরণ : যে সব উপকরণ শ্রবণ- দর্শন উভয় মাধ্যমে মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য করে তোলে সেগুলোকে দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ বলা হয়। নিচের উপকরণসমূহ দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের অন্তর্ভূক্ত। টিভি , ভিসি আর,ভিসিডি, সিডিরম, কম্পিউটার, প্রজেক্টর ইত্যাদি ।

মূল্যের দিক বিবেচনা করে জীববিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

- বিনা মূল্যের উপকরণ : মাটি দিয়ে তৈরি উদ্ভিদ ও প্রাণির মডেল, প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত বাস্তব উপকরণ ।
- স্বল্পমূল্যের উপকরণ: যেমন: প্লাষ্টিকের বোতল থেকে নিক্তি, ফুলদানী, কলমদানী, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণির মডেল এবং ফেলে দেয়া জিনিষ থেকে তৈরি শিক্ষা উপকরণ।
- মূল্যবান উপকরণ: অনুবীক্ষণ যন্ত্র, কংকাল, মাল্টিমডিয়া ইত্যাদি ।

এ ছাড়াও আমরা আরও উপকরণ ব্যবহার করি যেমন-

১।বাস্তব উপকরণ : শিক্ষক উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইলে বাস্তব উপকরণ হিসাবে লতাপাতা, ফুল, ফল ও নানা ধরনের উদ্ভিদ ব্যবহার করেন । শিক্ষক প্রাণি সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইলে বাস্তব উপকরণ হিসাবে নানা ধরনের সহজে প্রাপ্ত প্রাণী ব্যবহার করেন। এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে কল্পনায় না থেকে বাস্তবে চলে আসে।

২। অর্ধবাস্তব উপকরণ : বাস্তবের অভাব পূরণের জন্য চিত্র, ছবি, চার্ট, মানচিত্র, নকশা, মডেল ইত্যাদি বিকল্প বস্তুকে অর্ধ বাস্তব উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় । এতে শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

৩। লিখিত উপকরণ : বই, শিক্ষক সহায়িকা, মডিউল ইত্যাদি ।

৪। সহজপ্রাপ্য উপকরণ : খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ উপকরণ ও কিছু কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি ।

৫। দূর্লভ উপকরণ : মাইক্রোস্কোপ , স্নায়ু,বৃক্ক, নিউরণের মডেল ইত্যাদি ।

৬। **অনলাইন ও অফলাইন সফটওয়্যার** : বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান সফটওয়্যার রয়েছে। জীববিজ্ঞান শিখন কার্যক্রমে এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই শিক্ষার্থীকে আনন্দের মাধ্যমে আগ্রহী এবং সক্রিয় করা যায় এবং গাণিতিক চিন্তণ দক্ষতা বাড়ানো যায়। এ ছাড়া অনলাইন সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে রয়েছে Kahoot, Padlet, Hotpotato ইত্যাদি। এই সফটওয়্যারগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ করা সম্ভব।

৭। **জীববিজ্ঞান ডিজিট্যাল কনটেন্ট** : ইন্টারনেট থেকে জীববিজ্ঞান বিষয়ের ভিডিও, ছবি ইত্যাদি ডাউনলোড করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে সহজেই শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়। এতে শিক্ষার্থী আনন্দের সাথে শিখনে সক্রিয় থাকে। বর্তমান সরকার শ্রেণিকক্ষে ডিজিট্যাল কনটেন্ট ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য ব্লগ সাইট শিক্ষক বাতায়ন-এ শিক্ষকের তৈরিকৃত প্রচুর ডিজিট্যাল কনটেন্ট আপলোড করা আছে। শিক্ষক শিক্ষকবাতায়ন থেকে প্রয়োজন মত কনটেন্ট ডাউনলোড করে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন।

বিনা মূল্যের/স্বল্প মূল্যের উপকরণ তৈরি করা :

ক) পানি বা অন্যান্য ড্রিংকসের বোতল দিয়ে নিক্তি তৈরি, ফুলের টব তৈরি, উদ্ভিদ বা প্রাণীর মডেল তৈরি করা ।

খ) বাঁশের কাঠি, স্ট্র আঁটি বেঁধে ও জোড়া দিয়ে তৈরি করা যায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণির / উদ্ভিদের মডেল ।

গ) আর্ট পেপার/পুরাতন রেজিষ্টার খাতার মলাট/কার্টুন দিয়ে তৈরি করা যায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণির / উদ্ভিদের মডেল।

ঘ) বাঁশ বা মাটি দিয়ে তৈরি করা যায় প্রাণির / উদ্ভিদের মডেল

ঙ) তুলা, চকের গুড়া, বিভিন্ন বীচি, উল, চুমকি ইত্যাদি গাম বা আঠা দিয়ে কিছুতে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র ও মডেল তৈরি করা যায়

চ) নারকেল পাতার কাঠি দিয়ে, মোটা কাগজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রাণির / উদ্ভিদের আকার তৈরি করা ।

কাগজ দিয়ে ফুলের লম্বচ্ছেদ তৈরি

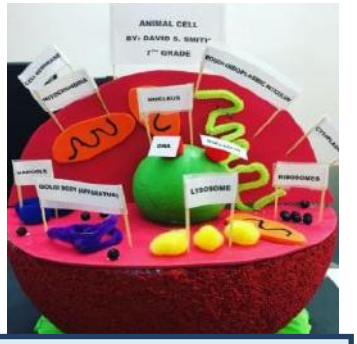

ফেলে দেয়া জিনিষ থেকে কোষের মডেল তৈরি

প্লাষ্টিকের বোতলে গাছ লাগানো

জীববিজ্ঞান শিখন সহায়ক সামগ্রী বা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহের জন্য শিক্ষকের করণীয়ঃ

- পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে ।
- পাঠ/পাঠ্যাংশের শিখনফল চিহ্নিত করতে হবে
- শিখনফল অনুযায়ী কার্যাবলি নির্ধারণ করতে হবে ।
- কার্যাবলি অনুযায়ী উপকরণ চিহ্নিত করতে হবে ।
- উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে ।
- সময় ও ধাপের কথা খেয়াল রেখে উপকরণ ব্যবহার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে ।
- শ্রেণিকক্ষের আকার, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, দলীয় কাজ ইত্যাদির প্রতি খেয়াল রেখে উপকরণের আকার, আকৃতি ও সংখ্যা নির্বাচন ও নির্ধারণ করতে হবে ।

- শিখন শেখান কার্যাবলির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে শিক্ষককে পূর্বেই বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে । তবে শ্রেণি কক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীরা কী কী কাজ করবে তার ছবি বা নমুনা শিক্ষক কর্তৃক পূর্বেই সংগ্রহ করে রাখলে ভাল হয়
- অনেক সহজ পরীক্ষণ কাজ আছে যে গুলোর উপকরণ খুব সহজেই শিক্ষার্থীর দ্বারা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা যেতে পারে । যেমন - আর্দশ পাতা, আর্দশ ফুল, ভূনিম্নস্থ কান্ড/মূল, সহজলভ্য প্রাণি-তেলাপোকা, কেঁচো, ফড়িং টিকটিকি ইত্যাদি ।
- পরীক্ষণের জন্য নানারকম উপকরণ প্রয়োজন হয় ।পরীক্ষণের জন্য এ সকল উপকরণ শিক্ষক পূর্বেই সংগ্রহ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের পূর্বে পরীক্ষাটি নিজে অনুশীলন করে নেয়া ভালো যাতে করে উপকরণের উপযুক্ততা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন ।

জীববিজ্ঞান উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল- জীববিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ তৈরি যথেষ্ঠ কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একজন আদর্শ জীববিজ্ঞান শিক্ষক প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যেও এই কষ্টসাধ্য কাজটি নিজে করে থাকেন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই তৈরিকৃত উপকরণসমূহ যদি প্রয়োজনীয় যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা না হয় তবে শিক্ষকের সমস্ত কষ্ট সহজেই নষ্ট হয়ে যাবে। জীববিজ্ঞান শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী করার জন্য জীববিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তৈরিকৃত উপকরণসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রশাসনের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের করণীয়---

- পাঠের জন্য উপকরণ তৈরি (ছবি, চার্ট) তুলনামূলকভাবে শক্ত কাগজে বা আর্ট পেপারে করতে হবে এবং সঠিকভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে যে পরবর্তীতে সহজেই ব্যবহার করা যায় ।
- শ্রেণি, বিষয় ও পাঠভিত্তিক আলাদা করে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে প্রতিটি সেটের উপর পাঠ/শ্রেণি ও বিষয় লিখে রাখতে হবে ।
- চার্ট, পোষ্টার, মানচিত্র, ছবি ইত্যাদি ঝুলিয়ে বা পেঁচিয়ে কাঠের তাকে রাখতে হবে ।
- ছোট ছোট জড়বস্তু বা মডেল,কার্টুন বা কাগজের বাক্সে অথবা শ্রেণি কক্ষে রক্ষিত আলমারিতে তালাবদ্ধভাবে রাখতে হবে
- শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর নিজ হাতে তৈরি বা সংগৃহীত উপকরণ শেলফে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ।
- মডেল বা দামি যন্ত্রপাতি শ্রেণি কক্ষের আলমারিতে অথবা শেলফে বা প্রধান শিক্ষকের অফিস রুমে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে
- উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত প্রদানের ও দলে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে
- সারা বছরের ব্যবহারের জন্য শিক্ষকরা তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং যে সব উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করা কঠিন সেগুলো সাবধানে রাখতে হবে
- উপকরণ রাখার জায়গা এমন হবে যাতে পিঁপড়া, উইঁপোকার আক্রমণ না থাকে বা অন্য কোন ভাবে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।
- শুকনো ও আর্দ্রতামুক্ত স্থানে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে ।
- মাঝে মধ্যে কীটনাশক বা ন্যাপথলিন জাতীয় ঔষধ দিতে হবে ।
- ইঁদুরের উপদ্রবমুক্ত এলাকাতে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে ।
- পরীক্ষণের কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি অনেক সময় শিক্ষার্থীদের জন্য হুমকীস্বরূপ হতে পারে, কাজেই তা বিশেষভাবে সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে ।

প্রশ্নমালা

১) জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২) জীববিজ্ঞান ব্যবহারিক কাজ এর তালিকা তৈরি করুন।
৩) মানচিত্র জীববিজ্ঞান শিখনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ- বিশ্লেষণ করুন।
৪) জীববিজ্ঞান শিখন সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহের জন্য শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করুন ।
৫) দুইটি বিনা মূল্যের/স্বল্প মূল্যের উপকরণ তৈরি করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন

জারীফ একজন জীববিজ্ঞান শিক্ষক। তিনি তার শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করেন। যে পাঠের বাস্তব উপকরণ না পান তিনি সেটির ছবি, মডেল, ভিডিও, চার্ট ইত্যাদি ব্যবহার করেন। ফলে তাঁর ক্লাসের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত উপস্থিত হয় এবং মনোযোগী থাকে।ফলে বিষয়টি বাড়িতে পড়ার প্রয়োজন হয়না। পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান বিষয়ে তারা ভাল নম্বর পায়। তিনি ক্লাশ শেষে উপকরণগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখেন পরবর্তী বৎসরের জন্য।

ক) জীববিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ কী?

খ)জীববিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে কেন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে?

গ)শ্রেণিতে বাস্তব উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উপকরণ সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

References:

১। Becoming a secondary School Science Teacher, Leslie W. Trowbridge & Rodger W. Bybee, Merrill Publising Company, A bell & Howell Compay, Columbus, Ohio 43216, Published 1986.

২। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি এড) বিজ্ঞান শিক্ষণ(মডিউল ১ ও ৩), টিচিং সেকেন্ডারী এডুকেশন পজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিকাদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৮ খ্রি:

৩। শিক্ষকবাতায়ন

ইউনিট ৮ : জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর শিখন কতটুকু অর্জিত হল তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে মূল্যায়ন। শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়ের মূল্যায়ন একইভাবে করা হয় না। পাঠ্যবিষয়ের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর ভিন্নতার কারণে শিখন শেখানো কার্যক্রমেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তেমনি মূল্যায়ন পদ্ধতিও হয় ভিন্নতর। মাধ্যমিক স্তরের জীববিজ্ঞান অত্যন্ত বৈচিত্রময় একটি বিষয়। এখানে রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর আলাদা জগত। প্রতিটি জীবের রয়েছে স্বাতন্ত্র, ভিন্ন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন, জীবনচক্র ও অভিযোজন। তাছাড়া জীব ও জীব, এবং জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে রয়েছে নানা মিতস্ক্রিয়ার ঘটনা।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যথার্থ শিখন নিশ্চিত করতে শিক্ষককে বৈচিত্যময় শিখন শেখানো প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। একইভাবে তাঁকে নানা ধরনের মূল্যায়ন পদ্বতির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই ইউনিটে মূল্যায়নের সাধারণ ধারণা, জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী উপায়ে মূল্যায়ন করা যায়, বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন কৌশল, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন টুলস তৈরিতে আইসিটিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে।

৮. ১: মূল্যায়ন ও জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ
৮. ২: জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন
৮. ৩: জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সংঘটনের ক্ষেত্র
৮. ৪: জীববিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন
৮. ৫: জীববিজ্ঞান বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উওরপত্র মূল্যায়ন
৮. ৬: জীববিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন টুলস তৈরি ও শিক্ষার্থী মুল্যায়নে আইসিটির ব্যবহার

৮.১: মূল্যায়ন ও জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

মূল্যায়ন কথাটি দ্বারা সাধারণভাবে কোনো কিছুর মান বা মূল্য নিরূপণ করাকে বুঝায়। বিদ্যালয়ের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই নানা কাজের ও ঘটনার অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন করে থাকি। এ মূল্যায়ন কাজটি নিছক কথাবার্তার মাধ্যমে হলেও এর পিছনে কিছু প্রচ্ছন্ন মানদন্ড কাজ করে যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হয়।তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পুরোটাই আনুষ্ঠানিক এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে হয়। বিদ্যালয় । বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হল শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ও সফলতা যাচাই করা। এ প্রক্রিয়ায় তিনটি ধারাবাহিক ধাপ লক্ষ্য করা যায়।

পরিমাপ (Measurement) : এটি মূল্যায়নের প্রথম ধাপ যার মাধ্যমে মূল্যায়ন কাজ শুরু হয়। পরিমাপের সাথে তথ্য সংগ্রহের বিষয় জড়িত। কোন কিছুর মূল্যায়ন করতে হলে প্রথম কাজ হল কোন ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক, পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থী অগ্রগতি বা সফলতা বা কৃতিত্বের তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য সাধারণত পরিমাণগত ও সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যায়।

ধরা যাক, একটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী জীববিজ্ঞান পরীক্ষায় ৫৫% নম্বর পেল। শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত এ নম্বর ঐ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ, গড়, নাকি সর্বনিম্ন নম্বর তা বুঝার কোনো উপায় নাই। তাই এ তথ্য থেকে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অবস্থানগত বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। মূল্যায়নের এ ক্ষেত্রে পরিমাপ শুধু তথ্য সংগ্রহের কাজ করে থাকে।

অ্যাসেসমেন্ট(Assesment): এই ধাপে পরিমাপে প্রাপ্ত তথ্য ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান, যেমন; ১ম, ২য়, ৩য় . . . . . ১০ম... ইত্যাদি নির্ধারন করা হয়। আবার নির্দিষ্ট মানদন্ডের আলোকে শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ণয় করাহয়, যেমন; 'এ+', 'বি', 'সি' কিংবা ১ম বিভাগ, ২য় বিভাগ, ৩য় বিভাগ। উপরের শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত ৫৫ নম্বরকে এসএসসি গ্রেডিং মানদন্ড অনুযায়ী 'বি' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, অ্যাসেসমেন্ট হলো মূল্যায়নের সেই ধাপ যেখানে পরিমাপে সংগৃহীত তথ্য বিন্যাস করে শিক্ষার্থীকে গ্রেড প্রদান করা হয়। এই অ্যাসেসমেন্ট থেকে শিক্ষার্থী তার গ্রেড ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাপেক্ষে শ্রেণিতে তার অবস্থান জানতে পারে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন ও পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা কৃতিত্বকে এভাবে নিরুপণ ও প্রকাশ করার নামই অ্যাসেসমেন্ট যাকে আমরা মূল্যায়ন বলে থাকি।

ইভ্যালুয়েশন(Evaluation):এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেডের সাথে শুধু ভাল, উত্তম, অতি উত্তম প্রভৃতি মন্তব্য জুড়ে দিয়ে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতিদেওয়া হয়। তবে মূল্যায়নকারীর পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করা সহজ নয় বরং কঠিন। কেননা, এ ধরনের মন্তব্য করতে হলে মূল্যায়নকারীকে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেড অর্জনের সাথে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় ও এর বাইরের পরিবেশ, এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ও বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন, উপরের শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত 'বি' গ্রেড সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কিছু বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে, যেমন: তার শ্রেণির অন্যান্য সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেডের তুলনায় সে কেমন ফলাফল করেছে। সে বাড়িতে কোন ধরনের পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধার মধ্যে পড়াশুনা করেছে, তার কি বাড়তি টিউটর ছিল ? নাকি নিজের চেষ্টায়ই এ ফলাফল অর্জন করেছে। এসব কিছু হিসাব নিকাশ করে সুচিন্তত মতামত দিতে হবে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর এভাবে মূল্যায়ন করা একজন শিক্ষকের পক্ষে দুরুহ কাজ। তাই শিক্ষার্থীর রেকর্ড কার্ডে বা সনদপত্রে সাধারণত প্রাপ্ত গ্রেডের উল্লেখ থাকে কোন মন্তব্য থাকে না।

শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যা শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত থাকে। এ উদ্দেশ্য আদৌ অর্জিত হচ্ছে কিনা বা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে মূল্যায়ন। তাই শ্রেণি কাযক্রম পরিচালনা ও নির্দেশনার অপরিহার্য অংশ হচ্ছে মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কে যা জানতে পারেন:

- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি ও চাহিদা কী?
- শিক্ষার্থী কী শিখছে ও কতটুকু শিখছে?
- আরও কী শেখাতে হবে এবং কীভাবে শেখাতে হবে?
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে দক্ষতাও কি বেড়েছে?
- নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান কি কাজে লাগাতে পারছে?
- পরবর্তী ক্লাশের জন্য সে কতটুকু উপযুক্ততা অর্জন করেছে?

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক নিজের সম্পর্কে যা জানতে পারেন:

- শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের সাথে সাথে শিক্ষক নিজেও নিজের মূল্যায়ন করে থাকেন।
- তিনি বুঝতে পারেন শিক্ষার্থীকে কী শিখিয়েছেন।
- কীভাবে শেখালে শিক্ষার্থী আরও ভাল শিখবে।
- তাঁর গৃহীত শিখন শেখানোর কোন পদ্বতি কতটুকু কার্যকরী ও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।
- পাঠ পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে কী পরিবর্তন আনতে হবে?
- পরবর্তীতে তিনি কোন পদ্ধতিতে অগ্রসর হবেন?
- কী উপকরণ ব্যবহার করবেন?

মূল্যায়ন অভিবাবক ও শিক্ষার্থীকে যেসব সুবিধা দেয়:

- শিক্ষার্থীরাপ্রাপ্ত গ্রেড থেকে তাদের ভাল মন্দ জানতে পেরে নিজেরা সচেতন হয়
- কীভাবে আরও ভালো করা যায় সে বিষয়ে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পণা নির্ধারন করতে পারে
- অভিবাবকগণ তাঁদের সন্তানদের প্রাপ্ত গ্রেড থেকে নিজেদের সন্তানের জন্য করণীয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়

জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন করা। আর শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্খিত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হলেই সার্বিক বিকাশ সাধিত হয়। এই জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যথাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিয়, মনোপিশজ ও আবেগীয় - এই তিন ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং শিক্ষার্থীদের এই তিনটি ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন জরুরী। বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। তবে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিয় ক্ষেত্রের পাশাপাশি মনোপেশীজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ অনেক বেশি।

বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রঃ এটি মস্তিষ্ক ও চিন্তার সাথে জড়িত বিষয় যাকে জ্ঞানমুলক ক্ষেত্রও বলা হয়। মানুষের কোন কিছু সম্পর্কে জানা ও স্মরণ রাখতে পারা, জানা জিনিস নিজের মত বুঝা বা বুঝতে পারা, নতুন পরিস্থিতিতে পূর্বের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কোন কিছু শনাক্ত করতে পারা বাপরিস্থিতি ও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারা, কোন বিষয় বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারা - এছয়টি স্তরই জ্ঞানমুলক ক্ষেত্রের বিষয়। এগুলো মস্তিষ্ক প্রসূত বলে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়। এ ক্ষেত্রের মূল্যায়নে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখার দরকার হয় না, ব্যক্তির উত্তরপত্র থাকলেই চলে। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার, তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র সবকিছুই বিজ্ঞানীদের গভীর চিন্তার ফসল। শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ভালভাবে বুঝতে ও কাজে লাগাতে হলে বিষয়বস্তুর সম্পর্কেজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের ছয়টি দিকেরই সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রঃ এক্ষেত্রের দক্ষতাকে মূলত পেশির দক্ষতাকে বুঝায়। জীববিজ্ঞানের হাতে কলমে কাজ ও ব্যবহারিক কাজ মনোপেশীজ ক্ষেত্রের বিষয়।কোষর এর গঠন, প্রাণীর পরিচিতি, টিস্যুতন্ত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণীর শারীরতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্থায়ী ধারণা পেতে হলে হাতে কলমে ও ব্যবহারিক কাজের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। ব্যবহারিক কর্ম সম্পাদনে মস্তিষ্কের যে ভূমিকা থাকে তা গৌণ, পেশির ভূমিকাই মূখ্য।উদাহরণস্বরুপ বলা যায় - উদ্ভিদ মূল বা কান্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্যে মূলের বা কান্ডের যে প্রস্থচ্ছেদ করা হয় সেটা আসলে পেশীর দক্ষতাকে নির্দেশ করে। একাজ যথাযথভাবে করতে মস্তিষ্কের গভীর চিন্তার দরকার হয় না, বরং এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও আঙ্গুলের পেশির দক্ষতাই প্রধান। একইভাবে,প্রাণীদেহের ব্যবচ্ছেদ করে স্নায়ুতন্ত্র বের করা কিংবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জীবকোষের স্লাইড স্থাপন ও পর্যবেক্ষন এসবই পেশির পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। আমাদের শ্রেণির বাইরে কায়িকশ্রম সংশ্লিষ্ট সকল কাজে পেশির দক্ষতাই মূখ্য। এসকল কাজে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা না হলেও চলে, দরকার শুধু পেশির চর্চা। মোট কথা শারীরিক শ্রমে নিয়োজিত সকলেই মনোপেশীজ ক্ষেত্রে দক্ষ।
জীববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনে ব্যবহারিক কাজের বিকল্প নেই। সুতরাং পাঠ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক কাজে শিক্ষার্থীর মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যায়ন ও উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

আবেগীয় ক্ষেত্রঃ কোন কিছুর প্রতি মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভুতি ও মূল্যবোধসংক্রান্তবিষয়এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত।এ বিষয়গুলো বিমূর্ত বিধায় শুধু পর্যবেক্ষণ দ্বারা এর পরিমাপ করা যায়। মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করা যায় না, যা বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রে করা যায়। যেমন- জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান খাতা কলমে মূল্যায়ন করা যাবে। কিন্তু ব্যবহারিক কাজের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক তা জানতে হলে ব্যবহারিক কাজ সংঘটনের সময় তার কর্মকান্ড ও মনোভাব পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কেননা মন থেকে কোনো কিছু গ্রহণ না করলে শিখন স্থায়ী হয় না। এ ক্ষেত্রের বিষয়গুলিসকল শিক্ষার্থীর সামর্থের মধ্যেই থাকে এবং অর্জন সম্ভব। শুধু দরকার হয় ঐকান্তিক ইচ্ছা,আন্তরিকতা ও নিয়মিত অনুশীলন বা চর্চা। তাই শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে আবেগীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর নিয়মিত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়নে পরামর্শ খুবই জরুরী।

৮.২: জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন নিয়ে দুটি ধারা প্রচলিত আছে। একটি হল ধারাবাহিক মূল্যায়ন - যা শ্রেণিকার্যক্রম চলার সাথে সাথে ঘটে । অন্যটি হল সামষ্টিক মুল্যায়ন - যা শ্রেণির কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে অর্থাৎ সাময়িক বা বছর শেষে করা হয় । আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সামষ্টিক মুল্যায়নেরই প্রাধান্য রয়েছে। মূল্যায়ন কখন সংঘটিত হচ্ছে এবং এর উদ্দেশ্যে কী? এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন। আলোচ্য পাঠে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের স্বরুপ এবং জীববিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে কোন মূল্যায়ন পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী তা উদঘাটন করার চেষ্টা করা হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

কোনোকিছু শেখানোর জন্য এবং শেখানোর সময় শিক্ষার্থীর যে মূল্যায়ন করা হয় তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থী জানতে পারে সে কতটুকু শিখেছে, তার কাছে প্রত্যাশা কী, তাকে আর আর কতদূর যেতে হবে। তখন তার কাজের মানোন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষক ফীডবেক ও উপদেশ দিতে পারেন। একে শিখনের জন্য মূল্যায়ন(assessment for learning) বলে।

প্রতিদিন শ্রেণির কাজ চলাকালীন শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীর এ মূল্যায়ন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পাঠদান ও মূল্যায়ন একই সাথে চলতে থাকে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করার ভিতর দিয়ে পাঠে এগিয়ে যান। মূল্যায়নে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ঘাটতি ধরা পড়লে সাথে সাথে তিনি তার প্রতিকার করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখনে আর ফাঁক থাকে না এবং পরবর্তী পাঠের জন্য তার ভিত্তি মজবুত হয় ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বিষবস্তুও সম্পর্কে ধারণা গঠন করার সময় এ মূল্যায়ন করা হয় বলে এর নাম গাঠনিক মূল্যায়ন (formative assessment)।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে আমাদের দৈনন্দিন বহু কাজ কর্মে এই ধারাবাহিক মূল্যায়নের ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণস্বরুপ- আমরা ভাত রান্না করতে গিয়ে রান্নার একেবারে শেষে গিয়ে দেখি না ভাত হয়েছে কি না। বরং রান্না বসানোর কিছুক্ষণ পর থেকেই চাল টিপে টিপে দেখি সিদ্ধ হতে আর কত দেরি। আমাকে কি তাপ কমাতে হবে নাকি বাড়াতে হবে, আর কী কী করা প্রয়োজন ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি যা করছি তা ধারাবাহিকভখাবে যাচাই করছি। এভাবে মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ভিতর দিয়ে এক পর্যায়ে আমার ভাত রান্না শেষ হয়। অর্থাৎ আমার মূল্যায়নও শেষ হলো যা ধারাবাহিকভাবে ঘটেছে এবং কাঙ্খিত উদ্দেশ্যও অর্জিত হলো। আর যদি আমি একটু পর পর যাচাই না করে একেবারে শেষে গিয়ে দেখতাম ভাত হয়েছে কিনা তখন কী হতো? হয়তো অনেক বিপত্তি দেখা দিত এবং আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাত রান্না হতো না। ফলে আমার সময় ও সম্পদ দুটোই বিফলে যেত।

অবার বিশাল অট্টালিকা তৈরিতেও একই রকম ঘটনা দেখা যায়। ভিত্তিস্তর থেকেই রাজমিস্ত্রির মূল্যায়ন শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ নির্মাণকর্মকান্ড ও মূল্যায়ন, এ দুটো এক সাথে চলতে থাকে। বহুতল ভবন নির্মাণ শেষে তিনি এর ভালো মন্দ বিচার করেন না। বরং ইটের পর ইট বসিয়েই তিনি লক্ষ করেন কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে কিনা। প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে সবকিছু আবার ঠিক করে নেন, যা ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সম্ভব হত না । আর এ কাজ ধারাবাহিক বা গাঠনিক মূল্যায়নেরই নামান্তর।

একইভাবে জীববিজ্ঞানের প্রতিটি পাঠের পাঠদান করার সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্বতি অনুসরণ অপরিহার্য।এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিয়, আবেগীয় ও মনোপেশীজ - এই তিন ক্ষেত্রেরই মূল্যায়ন কর যায় বলে এটি একটি পূর্নাঙ্গ মূল্যায়ন পদ্ধতি।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিশেষ দিক হলো: এটি শিক্ষক শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ামূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি যা-

- সমগ্র শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই চলতে থাকে
- শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা শনাক্ত করতে সহায়তা করে
- প্রাসঙ্গিক শিখন উপকরণ নির্বাচনে সহায়তা করে
- নতুন শিখন শেখানো কৌশল নির্বাচন ও উদ্ভাবনের তাগিদ দেয়
- তাৎক্ষণিক ফীডবেক ও নির্দেশনা দেয়
- শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করে
- চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করে

সামষ্টিক মূল্যায়ন

কোনো একটি সাময়িক বা বছর শেষে শিক্ষার্থী যা শিখল তার যে মূল্যায়ন তাই সামষ্টিক মূল্যায়ন। এর অন্য নাম শিখনের মূল্যায়ন(assessment of learning)। এটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন নামেও পরিচিত যা সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার কৃতিত্বের গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তবে এখানে ফীডবেক দেয়া বা ভুলত্রুটি সংশোধন করার কোনো সুযোগ থাকে না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা গেলেও আবেগীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা যায় না। এটি একটি অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া।

জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের উপযোগিতা

বিজ্ঞান শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীে -

- বিষয়বস্তু (Subject Content) সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান প্রদান করা
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দক্ষতা (Scince Process skill) রপ্ত করানো
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (Scientific Attitude) অর্জন করানো

একজন জীববিজ্ঞান শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীর মাঝে এ তিনটি গুণের বিকাশ ঘটানো। আর এগুলো শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা তা জানতে হলে মূল্যায়নের বিকল্প নেই।

বিষয়বস্তুর মৌলিক জ্ঞান: অনেকে মনে করেন বিজ্ঞান কিংবা জীবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়ের মত বক্তৃতা কিংবা আলোচনা পদ্ধতিতে পড়ালেই চলে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হয়তো না বুঝেই বার বার পড়ে বিষয়টি মনে রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার শিখন স্থায়ী হবে না এবং এ তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রাত্যাহিক যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবে না। মাধ্যমিক জীববিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী এ বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে হলে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে কাজের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যেমন জীববিজ্ঞানের অনুসন্ধানমূলক কাজ, সমস্যা সমাধান, জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, জৈবনিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে শিক্ষার্থীকে এ সব প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়।

- **বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দক্ষতা:** জীববিজ্ঞান শিখনকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষককে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার(scince process)অনুসরণে পঠন পাঠন কার্যক্রম চালাতে হবে। বিজ্ঞানের ঘটনা উদঘাটনে বিজ্ঞানীরা এই পথেই অগ্রসর হন। কেননা বিজ্ঞান হচ্ছে বস্তু এবং ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন ও সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে বের করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অবচেতন মনেও আমরা মূলত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারই অনুসরন করি। এ প্রক্রিয়ার মৌলিক কয়েকটি বিষয় হলো:

  পর্যবেক্ষণকরণ(observing): বিজ্ঞানে সবচেয়ে মৌলিক দক্ষতা যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটে। যেমন, মেরুদন্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ। বিজ্ঞানের অন্যান্য দক্ষতার্জনে সঠিক পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরী।

  শ্রেণিবিন্যাসকরণ(classifying): পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে কোনো কিছুকে বিন্যাস করা। যেমন, বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণীকে ভাগ করা।

  পরিমাপণ(measuring): তথ্য সংগ্রহ, তুলনা ও ব্যাখ্যা করতে পরিমাপ খুবই জরুরী। এটি শ্রেণিবিন্যাস ও অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। যেমন, কম আলোতে ও বেশি আলোতে সালোকসংশ্লেষণের হার পরিমাপ করা।

  যোগাযোগ স্থাপন(communicating): কাজের অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে বিনিময় করতে এটির দরকার হয়। গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, মানচিত্র এবং মৌখিক কথার দ্বারা তা করা যায়। যেমন, তাপমাত্রা ও প্রস্বেদনের হারের সমানুপাতিক বৃদ্ধি গ্রাফে প্রদর্শন।

  অনুমানকরণ(inferring): পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বর্তমানের অবস্থা বা ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করা। যেমন, রাসানিক সারের পরিবর্তে জৈব সার প্রদানে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ফলন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সারের চেয়ে জৈব সার উত্তম। দৌড়ের আগে ও পরে নাড়িস্পন্দনের এর হার নির্ণয়।

  ভবিষ্যতবাণীকরণ (predicting): পর্যবেক্ষনে প্রাপ্ত তথ্য ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছু সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা। যেমন, বিগত চার মাসে গাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী দুই মাসের বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা।

- **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি**(scientific attitude)**:** জীববিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষার্থী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করল কি না তার মূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। এ গুণাগুণ অর্জনের ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্পর্কে কল্পণাপ্রবণ ও কৌতুহলী হয় এবং বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা ও সমস্যা সমাধানে উৎসাহী হয়ে উঠে। তাছাড়া তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। এর ফলে তারা কোনো প্রশ্নের উত্তরের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন, তথ্য যাচাই ও পুনঃযাচাইয়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

৮. ৩: জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সংঘটনের ক্ষেত্র

পূর্বের পাঠগুলোতে আমরা দেখেছি যে, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঅর্জিত হচ্ছে কিনা তা জানতে হলে শিখনের তিনটি ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংঘটিত হবে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষায় ধারাবাহিক মূল্যায়নের কার্যক্রমসমূহ

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উল্লেখিত তিনটি ক্ষেত্রেরই মূল্যায়ন সুচারুভাবে করা যায়। যে সকল শিখন শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয় সেগুলো হচ্ছে:

- শ্রেণির কাজ
- বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ
- শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণির কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন : শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শ্রেণিতে সম্পাদিত সকল কাজ শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত। শ্রেণির কাজের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশ করা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো। শ্রেণিতে শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনায়একক, জোড়ায় বা দলগতভাবে নানা ধরনের কাজ সম্পাদন করে। এগুলো হচ্ছে কোনো প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আলোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া, ভূমিকাভিনয় ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, কোনো কিছুর চিত্র, সারণি ও মানচিত্র অংকন এবং হাতে কলমে ব্যবহারিক কাজ।
শ্রেণিতে শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া, কাজে সক্রিয় করা, কাজ সম্পাদনে সহায়কের(facilitator) ভূমিকা পালন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা । এভাবে শিক্ষক শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীর এই শ্রেণির কাজের কৃতিত্ব সাময়িক পরীক্ষায় অর্জিত কৃতিত্বের সাথে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করা হবে। তাই শিক্ষককে সকল শিক্ষার্থীর শ্রেণির কাজের মূল্যায়নের রেকর্ড রাখতে হয়।

তবে প্রতি সাময়িকে রেকর্ড বইয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর ২টি শ্রেণির কাজ ও ১টি ব্যবহারিক কাজের কৃতিত্ব সংরক্ষণ করবেন। শ্রেণির কাজ মূল্যায়নের জন্য বরাদ্ধকৃত নম্বর হল ৫। তবে ৫ এর পরিবর্তে যে কোনো নম্বর ধওে শ্রেণির কাজ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরকে ১০ এ রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরিত নম্বর ভগ্নাংশ হলেও তাই সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন, কোনো এক শ্রেণির কাজে১০ নম্বর ধরে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করা হল এবং একজন শিক্ষার্থী ৭ নম্বর পেল। প্রাাপ্ত ৭কে ৫ নম্বরে রুপান্তর করলে দাঁড়ায় ৩.৫। এ নিয়ম সকল ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্যই প্রযোজ্য।

শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন

কাজের ধরণ	মূল্যায়নের মানদন্ড
লিখিত কাজ	উত্তরের সঠিকতা বা যথার্থতা উত্তরের ধারাবাহিকতা
মৌখিক কাজ	উত্তরের সঠিকতা বক্তব্যের স্পষ্টতা
ব্যবহারিক কাজ	অনুসৃত প্রক্রিয়ার সঠিকতা উপকরণ ও যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার

বাড়ির কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন : শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে যে কাজ সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজেশিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার মূল্যায়ন ছাড়াও ব্যক্তিক আচরণ এবং মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হয়। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন।

প্রতি সাময়িকে প্রতি শিক্ষার্থীর ২টি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড রাখবেন। শিক্ষক হয়তো প্রতি সাময়িকে দুইয়ের অধিক বাড়ির কাজ দিবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ২টি কাজকে নির্বাচন করতে হবে। যে কোন নম্বরের উপর বাড়ির কাজ হতে পারে। তবে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এরূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরিত নম্বর ভগ্নাংশ হলেও তাই সংরক্ষণ করতে হবে।

বাড়ির কাজ মূল্যায়নের মানদন্ড
• সঠিক বা যথার্থ উত্তর
• নির্ধারিত সময়ে বাড়ির কাজ জমা দেওয়া

অনুসন্ধানমূলক কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন : জীববিজ্ঞানে অনুসন্ধানমূলক কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে গবেষণাধর্মী কাজের প্রক্রিয়া ও ধাপের সাথে পরিচিত করানো এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা যাচাই করা হয়। জীববিজ্ঞানে অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস সময় প্রয়োজন হতে পারে । শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে বিষয় নির্ধারণ করবেন এবং কাজের পরিকল্পনা ও ধাপ সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন।

তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তাই অনুসন্ধানক কাজটি এমন হতে হয় যেন তার তথ্য সংগ্রহর বিষয়টি শিক্ষার্থীর নাগালের মধ্যে থাকে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থী যেন বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক বুঝিয়ে দিবেন। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থী তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফলের উপর মতামত দিবে। সমগ্র কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পন্ন কাজের বর্ণনা থাকবে। শিক্ষক প্রতিবেদন প্রণয়নের দিকনির্দেশনা দিবেন।

অনুসন্ধানমূলক কাজের তথ্য সংগ্রহ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল তৈরি, ফলাফলের উপর মতামত এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে শিক্ষার্থী এককভাবে প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়নের মানদন্ড
অনুসৃত পদ্ধতির যথার্থতা
তথ্য বিশ্লেষণের সঠিকতা
সঠিকভাবে প্রতিবেদন প্রণয়ন

শ্রেণি অভীক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন : শ্রেণি অভীক্ষা শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত পূর্বঘোষিত একটি পরীক্ষা। কোনো একটি অধ্যায় পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচই এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রস্তুতির লক্ষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হয়। অভীক্ষা সর্বোচ্চ ১পিরিয়ড সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। জীববিজ্ঞানে শ্রেণি অভীক্ষা হবে লিখিত ও ব্যবহারিক। লিখিত শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যবহারিক শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ পরিমাপ করা যায়। লিখিত অভীক্ষার প্রশ্নসংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনী, সৃজনশীল ও অন্য যেকোনো ধরনের হতে পারে । তবে প্রশ্ন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থী মেধা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ থাকে। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের জন্য শ্রেণি অভীক্ষা নিতে পারেন। তবে প্রাপ্ত নম্বরকে ১০ এ রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি সাময়িকে শিক্ষক হয়তো একাধিক শ্রেণি অভীক্ষা নিবেন। তবে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত তিনটি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বরের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। তন্মধ্যে ১টি লিখিত ও ২টি ব্যবহারিক অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

জীববিজ্ঞানে শ্রেণিঅভীক্ষা মূল্যায়ন	
ক্ষেত্র	**মূল্যায়নের মানদণ্ড**
শ্রেণি অভীক্ষা (লিখিত)	উত্তরের সঠিকতা বা যথার্থতা বৈজ্ঞনিক পরিভাষা ও সংকেতের যথাযথ ব্যবহার
শ্রেণি অভীক্ষা (ব্যবহারিক)	অনুসৃত প্রক্রিয়ার সঠিকতা উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যথার্থতা

কোর্স ওয়ার্কের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ছক

শ্রেণি: নবম - দশম											বিষয়: জীববিজ্ঞান												
ক্রমিক নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা									দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা										মোট	গড়
		শ্রেণির কাজ(লিখিত/মৌখিক/ ব্যবহারিক কাজ)			বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা (লিখিত/ ব্যবহারিক) মোট গড়			শ্রেণির কাজ (লিখিত/মৌখিক/ ব্যবহারিক কাজ)			বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ			শ্রেণিঅভীক্ষা (লিখিত/ ব্যবহারিক)					

আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন : শিক্ষক সারা বছর শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করবেন। শ্রেণিকক্ষে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফলের জন্য কোন নম্বর বরাদ্দ নেই। প্রতি সাময়িক শেষে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং মতামত দিবেন।

বিদ্যালয়ের কাছে প্রত্যেক অভিভাবকের প্রত্যাশা তার সন্তান যেন জ্ঞানী, দক্ষ ও ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। রাষ্ট্রেরও লক্ষ তাই। একারণে শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একজন শিক্ষার্থী শুধু মেধাবী হলেই হবে না তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। অর্থাৎ মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। অন্যথায় তার কাছ থেকে পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ব কছুই পাবে না বরং সে তাদের ক্ষতির কারণও হতে পারে। ইতিহাসের দিকে তাকালে এরুপ বহু ঘটনা চোখে পড়ে।

একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে হবে, যা কেবল ধারাবাহিক মূল্যায়নেই সম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরএকটি-দুটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তার আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কেতাৎক্ষণিকভাবেচূড়ান্ত মূল্যায়ন করা যায় না। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে তার আচরণ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের দিকগুলো হচ্ছে- সততা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম ।

জীববিজ্ঞানের শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে এসব গুণাবলী পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন শ্রেণির কাজ, ব্যবহারিক কাজ, দলগত কাজ, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিরসযত্ন সংবেদনশীল সংগ্রহ ও ব্যবহার, কাজ শেষে যন্ত্রপাতির যথাস্থানে পুনঃস্থাপন ইত্যাদি কাজে শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ পরিমাপ করা যায় । শ্রেণির বাইরে, শিক্ষাসফরে, কিংবা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে জীবের প্রতি মমত্ববোধ ও সংবেদনশীল আচরণ নৈতিক মূল্যবোধের(Ethical Values) অন্তর্গত বিষয়। নমুনা সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য রাখবে যেন আশেপাশের অন্যান্য জীবের যথাসম্ভব কম ক্ষতি হয়।এভাবে জীবের প্রতি শিক্ষার্থীদের সহানুভূতিশীল মনোভাব গড়ে উঠবে। আর এ সকল কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে এর উন্নয়নে উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করলে শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশিত মূল্যবোধ অর্জন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত তথ্য তৎক্ষণাত রেকর্ড বইয়ে না লিখে মানোন্নয়নে পরামর্শ ক্রমাগত চলতে থাকবে। সাময়িক পরীক্ষা শেষে শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণ সংক্রান্ত মূল্যায়ন নির্ধারিত ছকে সংরক্ষণ করবেন।এ কাজটি প্রতি সাময়িকে একবার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে রিপোর্ট প্রদান করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষক তাঁকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের মানদণ্ড	**বরাদ্দকৃত নম্বর**
শিক্ষার্থী কদাচিৎ প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	১
শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	২
শিক্ষার্থী সর্বদা প্রত্যাশিত আচরণ ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে	৩

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র

সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধু বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রের চিন্তন ও সমস্যা সমাধানদক্ষতা মূল্যায়ন সম্ভব। আবেগীয় ও মনোপেশিজ দিক মূল্যায়ন করা যায় না। কেননা সামষ্টিক মূল্যায়ন হচ্ছে প্রধানত খাতা কলমের মাধ্যমে সম্পাদিত লিখিত পরীক্ষার মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণ ও হাতে কলমে কাজের পারদর্শিতা পরিমাপের সুযোগ নাই। এস এস সি পরীক্ষায় সামষ্টিক মূল্যায়নলন করা হয় ৭০% সৃজনশীল প্রশ্নে এং ৩০% বহূনির্বাচনী প্রশ্নে।

৮. ৪: জীববিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ন ও নির্দেশক ছকে উপস্থাপন

আমাদের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি হল বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন।বহুনির্বাচনী প্রশ্নে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার ৪টি স্তর পরিমাপ করার সুযোগ রয়েছে। বহুনির্বাচনীপ্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যক্তিক প্রভাব শূন্য থাকে বলে নৈর্ব্যাক্তিকতা (objectivity) শতভাগ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভাল লাগা- মন্দ লাগা প্রভৃতি ব্যক্তিক বিষয় নম্বর প্রদানকে প্রভাবিত করতে পারে না। উত্তর সঠিক হলে ১ পাবে, ভুল হলে শূন্য পাবে -এর বাইরে অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নাই।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নে কতগুলো সাধারণ নিয়মাবলি রয়েছে যা সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে একই। তবে বিষয়ভেদে কখনো কখনো ভিন্ন কিছু নির্দেশনা থাকতে পারে। এ পাঠে জীববিজ্ঞানের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নে সামগ্রিক নির্দেশনা ও নির্দেশক ছক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের গঠন : নিচে একটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নমুনা দেখানো হল :

প্রশ্ন: নিচের কোনটিতে পরিবহন টিস্যু থাকে? উদ্দীপক(stem)

ক. শৈবাল

খ. ছত্রাকবিক্ষেপক (distractors) বিকল্প উত্তর(options)

গ. মস

ঘ. ফার্ণসঠিক উত্তর(key)

উপরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নটির বিশ্লেষণ থেকেদেখা যায় এতে রয়েছে:

(১) উদ্দীপক (stem)

(২)বিকল্প উত্তর (options) ৪টি ।(i)বিক্ষেপক(distractors) ৩টি ও (ii)সঠিক উত্তর(key) ১টি

সাধারণভাবে বলা যায় একটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের চারটি অংশ থাকে যথা: উদ্দীপক, বিকল্প উত্তর,বিক্ষেপক, সঠিক উত্তর।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক ও বিকল্প উত্তর

উদ্দীপক হচ্ছে শিখনফল ও পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে রচিত ঘটনা যা বাস্তব বা বাস্তবসম্বত হতে পারে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নে এই উদ্দীপকের নিচে চারটি বিকল্প উত্তর সন্নিবেশিত থাকে। উদ্দীপক পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয় না বরং উত্তর খুঁজতে দিক নির্দেশনা দেয়। তাই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্দীপকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপক মূলত পাঠ্যবই, বিকল্প উত্তর, শিক্ষার্থী- এ তিনের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। সঠিক উত্তর নির্বাচন করার সময় পরীক্ষার্থী এ উদ্দীপকের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুতে যায়। আবার এ উদ্দীপকের মাধ্যমেই বিকল্প উত্তরে ফিরে আসে। এ কারণে উদ্দীপক হতে হয় তথ্যবহুল ও প্রাসঙ্গিক।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরির বিবেচ্য দিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক উত্তর তৈরির সময় প্রশ্নপ্রণেতাকে বিশেষ কিছু দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়।নতুবা উদ্দীপকে অনাকাঙ্খিত ভুল থেকে যেতে পারে যা প্রশ্নের যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।উদ্দীপকে সচরাচর নিচের বিষয় সংশ্লিষ্ট ত্রুটিগুলোদেখা যায়। তাই এসব বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

- উদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে, তথ্যের কোন ঘাটতি থাকবে না
- উদ্দীপকের ভাষা হবে সহজ, অর্থপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত
- উদ্দীপকে প্রাসঙ্গিক উপাদান থাকবে,অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু থাকবে না

- বিকল্প উত্তরে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না করে উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দসংযোজন করতে হবে
- উদ্দীপক হ্যাঁ'-বোধক হওয়া বাঞ্চনী
- না-বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়লে **'না'** শব্দটি বড় অক্ষরে লিখতে হবে
- উদ্দীপকে সরাসরি কোনো ইঙ্গিত থাকবে না যা শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে কিংবা ভুল উত্তর বাদ দিতে সাহায্য করে
- উদ্দীপক সর্বদা নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তে ইতিবাচক ধারণা বহন করবে

উপরের প্রতিটি বিষয়ের একটি ত্রূটিযুক্ত ও ত্রূটিমুক্ত নমুনা প্রশ্ন নিচের ছকে দেখানো হল:

ত্রূটিযুক্ত প্রশ্ন	**ত্রূটিমুক্ত প্রশ্ন**
১. উদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে, তথ্যের কোন ঘাটতি থাকবে না।	
১. কোন উপ-পর্যায়ে নিউক্লিউলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটে? ক. লেপ্টোটিন খ. প্যাকাইটিন গ. ডায়াকাইনেসিস ঘ. সাইটোকাইনেসিস	১. পোফেজ-১ এর কোন উপ-পর্যায়ে নিউক্লিউলাস ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটে? ক. লেপ্টোটিন খ. প্যাকাইটিন গ. ডায়াকাইনেসিস ঘ. সাইটোকাইনেসিস
২.উদ্দীপকের ভাষা হবে সহজ, অর্থপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত।	
২. প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রকৃত সিলোম গঠণকারী ভ্রুনীয় মেসোডার্মাল কোষস্তরে আবৃত অংশটির নাম কী? ক. পেরিকনিড্রয়াম খ. পেরিঅস্ট্রিয়াম গ. পেরিটোনিয়াম ঘ. পেরিকার্ডিয়াম	২. প্রকৃত সিলোম কোন ধরনের আবরণীতে আবৃত থাকে? ক. পেরিকনিড্রয়াম খ. পেরিঅস্ট্রিয়াম গ. পেরিটোনিয়াম ঘ. পেরিকার্ডিয়াম
৩.উদ্দীপকে প্রাসঙ্গিক উপাদান থাকবে, অপ্রাসঙ্গিক কোন কিছু থাকবে না	
৩. সবুজউদ্ভিদ দেহে ক্লোরেনকাইমা টিস্যুর কাজ কোনটি? ক.খাদ্য পরিবহন খ. খাদ্য প্রস্তুতকরণ গ. দৃঢ়তাপ্রদান ঘ.ক্ষতনিরাময়	৩. ক্লোরেনকাইমা টিস্যুর কাজ কোনটি? ক. খাদ্য পরিবহন খ. খাদ্য প্রস্তুতকরণ গ. দৃঢ়তাপ্রদান ঘ.ক্ষতনিরাময়
৪.বিকল্প উত্তরে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি না করে উদ্দীপকে প্রয়োজনীয় শব্দ সংযোজন করতে হবে।	
৪. কোনটি Lআকৃতির? ক. মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম খ. সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম গ. এক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম ঘ. টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম	৪. কোনটি Lআকৃতির ক্রোমোসোম? ক. মেটাসেন্ট্রিক খ. সাবমেটাসেন্ট্রিক গ. এক্রোসেন্ট্রিক ঘ. টেলোসেন্ট্রিক
৫.উদ্দীপক হ্যাঁ' বোধক হওয়া বাঞ্চনীয়	
৫. কোন প্রাণীটি ওরিণ্টোল অঞ্চলের এন্ডেমিক নয়? ক.ওরাংউটাং খ.ওয়াল্লাবি গ. উল্লুক ঘ. ঘড়িয়াল	৫. কোন প্রাণীটি অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলের ওরিণ্টোল এন্ডেমিক? ক.ওরাংউটাং খ.ওয়াল্লাবি গ. উল্লুক ঘ. ঘড়িয়াল

৬. না-বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়লে **'না'** শব্দটি বড় অক্ষরে লিখতে হবে	
৬. কোনটি মনেরার বৈশিষ্ট্য নয়? ক. সুগঠিত নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত খ. অধিকাংশসদস্য মৃতজীবি গ. কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস ঘ. কোষ প্রাচীর পলিস্যাকারাইড ও আমিষযুক্ত	৬. কোনটি মনেরার বৈশিষ্ট্য **নয়?** ক. সুগঠিত নিউক্লিয়াসঅনুপস্থিত খ. অধিকাংশ সদস্য মৃতজীবি গ. কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস ঘ. কোষ প্রাচীর পলিস্যাকারাইড ও আমিষযুক্ত
৭.উদ্দীপকে সরাসরি কোনো ইঙ্গিত থাকবে না যা শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে কিংবা ভুল উত্তর বাদ দিতে সাহায্য করে	
৭.পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতে কোন ছত্রাক ব্যবহৃত হয়? ক. Pseudomonas খ. Nocardia গ.Penicillium ঘ.Torula	৭.অ্যান্টিবায়োটিক তৈরিতে কোন ছত্রাক ব্যবহৃত হয়? ক. Pseudomonas খ. Nocardia গ.Penicillium ঘ.Torula
৮.উদ্দীপক সর্বদা নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তে ইতিবাচক ধারণা বহন করবে	
৮. জীবাণু অস্ত্র তৈরি করে কতিপয় দেশ নিজেদেরকে শক্তিশালী হিসাবে প্রকাশ করতে চায়। এটি জেনে রাহাত জীবাণু অস্ত্র তৈরির গবেষণা শুরু করেন। রাহাতের গবেষনার অনুসৃত পদ্ধতি হল- i. জীন প্রযুক্তি ii. টিস্যু কালচার প্রযুক্তি iii. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii	৮.সুইডেনের একদল বিজ্ঞানী *Oryza japonica* গাছে জীন স্থানান্তরের মাধ্যমে সুপার রাইস তেরি করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তরুণ বিজ্ঞানী রাহাতের বাংলাদেশী আবহাওয়ায় ক্ষরা সহনশীল জাতের ধান উদ্ভাবনের গবেষনার চিন্তা করেন। রাহাতের গবেষনার অনুসৃত পদ্ধতি হতে পারে- i. জীন প্রযুক্তি ii. টিস্যু কালচার প্রযুক্তি iii. রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii **খ. i ও iii** গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

বিকল্প উত্তর তৈরির বিবেচ্য দিক

বিকল্প উত্তর তৈরির সময় সাধারণত নিচের বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবে।নতুবা উদ্দীপকের মত এখানেও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। বিকল্প উত্তরসমূহ-

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ করে তুলবে।
- ন্যূনতম ৫% পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- সংখ্যাবাচক হলে মানের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে, উর্ধ্বক্রমে অথবা নিম্নক্রমে।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- পারস্পরিক সংযুক্তি(mutually inclusive) ও পারস্পরিক বিযুক্তি(mutually exclusive) মুক্ত হবে।
- উপরের সবগুলি সঠিক বা কোনোটি নয় এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।

উপরের প্রতিটি বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি ত্রূটিযুক্ত ও ত্রূটিমুক্ত নমুনা প্রশ্ননিচের ছকে দেখানো হলো :

ত্রূটিযুক্ত প্রশ্ন	ত্রূটিমুক্ত প্রশ্ন
১. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ব্যকরণগত গঠনের দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।	
১. Plasmodiumএর জীবাণু মানুষের- ক. যকৃতে সাইজোগনি সৃষ্টি হয় খ. অগ্নাশয়ে অবস্থান করে গ. বৃক্কে সংক্রমণ ঘটায় ঘ. লালাগ্রন্থিতে গ্যামিটোগনি ঘটায়	Plasmodium এর জীবাণু মানুষের- ক. যকৃতে সাইজোগনি সৃষ্টি হয় খ. অগ্নাশয়ে অবস্থান করে গ. বৃক্কে সংক্রমণ ঘটায় ঘ. লালাগ্রন্থিতে গ্যামিটোগনি ঘটায়
২. সংখ্যাবাচক হলে মানের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে, উর্ধ্বক্রমে অথবা নিম্নক্রমে	
মানবদেহে লাম্বার কশেরুকার সংখ্যা কয়টি? ক.৭ খ.১২ গ.৫ ঘ.৪	মানবদেহে লাম্বার কশেরুকার সংখ্যা কয়টি? ক.৪ খ.৫ গ.৭ ঘ.১২
৩. দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান হওয়া বাঞ্জনীয়।	
স্যাকুলাসের কাজ কোনটি? ক. ভারসাম্য রক্ষা খ. গ্রাহক যন্ত্ররুপে মস্তিষ্কে শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি গ. দর্শন অনুভূতি সৃষ্টি ঘ. মাথা ও কাঁদের সঞ্চালন	৫. স্যাকুলাসের কাজ কোনটি? ক. ভারসাম্য রক্ষা খ. শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি গ. দর্শন অনুভূতি সৃষ্টি ঘ. মাথা ও কাঁদের সঞ্চালন
৪.বিকল্প উত্তরগুচ্ছ পারস্পরিক অন্তর্ভূক্তি(mutually inclusive) মুক্ত হবে	
৬. প্রেটিন পরিপাককারী এনজাইম কোনটি? ক. অ্যামাইলেজ খ. প্রোটিয়েজ গ. পেপসিন ঘ. লাইপেজ	৬. প্রেটিন পরিপাককারী এনজাইম কোনটি? ক. অ্যামাইলেজ খ. প্রোটিয়েজ গ. পেপসিন ঘ. লাইপেজ
৫. বিকল্প উত্তরগুচ্ছ পারস্পরিক বহির্ভূক্তি(mutually exclusive) মুক্ত হবে	
৭. মানব দেহের পিটুইটারি গ্রন্থি একটি- iঅন্তঃক্ষরা গ্রন্থি iiবহিঃঅন্তক্ষরা গ্রন্থি iiiগ্রন্থিরাজ নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii	৭ . মানব দেহের পিটুইটারি গ্রন্থি একটি- i অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ii বহিঃঅন্তক্ষরা গ্রন্থি iii গ্রন্থিরাজ নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

৬. উপরের সবগুলি সঠিক বা কোনোটি নয় এমন বাক্য পরিহার করতে হবে।	
৮. কোনটি জটিল টিস্যুর উপাদান? ক. ট্রাকিড খ. ভেসেল গ. সীভনল ঘ. উপরের সবগুলি কোলেনকাইমা কোষ - ক. লিগনিনযুক্ত খ.গহ্বরবিহীন গ. প্রস্থচ্ছেদে গোলাকার	৮. কোনটি জটিল টিস্যুর উপাদান? ক. ট্রাকিড খ. কোলেনকাইমা গ. ল্যাটেক্স ঘ. ট্রান্সফিউশন কোলেনকাইমা কোষ - ক. লিগনিনযুক্ত খ.গহ্বরবিহীন গ. প্রস্থচ্ছেদে গোলাকার গ. প্রাচীর অসমভাবে পুরু

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ধরন, গঠন ও প্রণয়ন কৌশল

আমাদের মাধ্যমিক স্তরে পাবলিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় তিন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রচলন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

- সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Simple MCQ)
- বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

উপরে উল্লেখিত প্রশ্নটি একটি সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন।এ প্রশ্নে পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য বা ধারণা জানতে চাওয়া হয়। এটি স্থান ও কালের বিবেচনায় একটি সাধারণ সত্য এবং সরল বাক্যে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ এটি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, এবং পৃথিবীর যেকোন স্থানের জন্য প্রযোজ্য।

সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন দ্বারা চিন্তন দক্ষতার শুধু জ্ঞান স্তর ও অনুধাবন স্তর যাচাই করা যায়। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা যায় না।

এ প্রশ্নে উদ্দীপক একটি মাত্র বাক্যে লেখা হয়। এটি সাধারণত সম্পূর্ণ বাক্য হয় এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে। তবে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে গিয়ে খুব সমস্যায় পড়লে কখনো কখনো অসম্পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তুসবসময় অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করার লক্ষ্য থাকতে হবে। কেননা সম্পূর্ণ বাক্য সম্বলিত প্রশ্নের চেয়ে অসম্পূর্ণ বাক্য সম্বলিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক বেশি বেগ পেতে হয়। **যেমন, উপরের প্রশ্নটিকে নিম্নরুপে লেখা ঠিক হবে না।**

প্রশ্ন: পরিবহণ টিস্যু থাকে- ক. শৈবালে খ. ছত্রাকে গ. মসে ঘ. ফার্ণে

এরুপ করলে প্রতিটি বিকল্প উত্তর বার বার উদ্দীপকের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয় যা পরীক্ষার্থীর জন্য অহেতুক বাড়তি চাপ।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

এ ধরনের একটি প্রশ্নের নমুনা নিচে দেখানো হল:

১. পরজীবীতা হলো - i. দুটি ভিন্ন জীব একত্রে বসবাস করা ii.জীব দুটির মধ্যে পুষ্টির বিনিময় হওয়া iii. একটি জীব উপকৃত হওয়া নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii **খ. i ও iii** গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

একটি অস্পূর্ণ বাক্য দিয়ে এধরনের প্রশ্ন শুরু হয়। এর পর তিনটি বিবৃতি বা তথ্য রোমান অক্ষর (i), (ii), (iii) দ্বারা বিন্যস্ত থাকে। উক্ত বিবৃতিগুলির একটি, দুটি, কিংবা তিনটিই সঠিক হতে পারে প্রতিটি বিবৃতি বা তথ্যকে অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষে যুক্ত করলে তিনটি স্বতন্ত্র অর্থপূর্ণ বাক্য পাওয়া যায়। বিবৃতি তিনটিকে সন্নিবেশ করে চারটি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। সঠিক বিবৃতি সম্বলিত বিকল্পটি হয় সঠিক উত্তর।

এ ধরনের প্রশ্ন সাধারণত শিক্ষার্থীর অনুধাবন ক্ষমতা পরিমাপ করে। জ্ঞান দক্ষতা যাচাই করার জন্য এ প্রশ্ন করা হয় না।অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নের দক্ষতা স্তর হবে কমপক্ষে অনুধাবন।তবে নতুন পরিস্থিতিমূলক উদ্দীপকের অধীনে হলে এর দ্বারা প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা পরিমাপ করা যায়। একটি প্রশ্নপত্রে সর্বোচ্চ ২০% বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে।

কেন বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন?

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল চারটি সুবিধাজনক বিকল্প উত্তর খুঁজে পাওয়া। এ জন্য প্রশ্ন প্রণেতাকে প্রায়ই হিমসিম খেতে হয়। এমনকি প্রচুর সময়ওব্যয় করতে হয়। সাধারণ বহুনির্বাচনীতে জ্ঞান স্তরের পশ্ন যত সহজে করা যায় অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন তত সহজে করা যায় না। তাছাড়া একটি সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্নে একই সাথে কেবল একটি তথ্যই যাচাই করা য়ায় এর বেশি নয়।সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্নের এসব সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটেছে।এর সুবিধা হল এটি-

- জ্ঞানস্তরের প্রশ্নকে অনুধাবন স্তরে উন্নীত করতে পারে
- একই সাথে একাধিক জ্ঞানকে পরীক্ষা করতে পারে
- প্রশ্ন প্রণেতার জন্য বিকল্প উত্তরের প্রাপ্যতা সহজ করে তুলে

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নঃ একটি নমুনা প্রশ্ন নিচে দেখানো হল-

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মিসেস আমিনার পেয়ারা গাছে এবছর অনেক পেয়ারা ধরেছে। তবে পেয়ারাগুলো কাঁচা থাকতেই কাঠ বিড়ালি খেতে শুরু করেছে। তাই তিনি কয়েকটি পেয়ারা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ডাল পাতাসহ বেঁধে রাখলেন। দুই দিন পরে তিনি লক্ষ করলেন পলিথিনের ভিতরের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি জমে আছে। যদিও বাহির থেকে পলিথিনের ভিতরে পানি ঢুকার কোন সুযোগ ছিল না।

১. পলিথিনের ভিতর পানি জমার কারণ কী?
   ক. শ্বসন
   খ. অভিস্রবন
   গ. প্রস্বেদন
   ঘ. সালেকসংশ্লেষণ

২. পলিথিনের ভিতর পানি জমার ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে-
i. আলোর
ii. আর্দ্রতার
iii. তাপমাত্রার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ.ii ও iii
গ.i ও iii
ঘ. **i, ii ও iii**

উপরে উল্লেখিত উদাহরণের মত এ ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শুরুতে নতুন প্রেক্ষাপট সম্বলিত একটি উদ্দীপক (Stem) থাকে। উদ্দীপকের ঘটনটি সাধারণ সত্য,তবে স্থান ও কালের বিবেচনায় খুবই সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের ও স্থানের ঘটনা। এ উদ্দীপকের ধারণার ভিত্তিতে নিচে দুই বা ততোদিক প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নগুলো অবশ্যই প্রয়োগ স্তর ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর পরিমাপের জন্য জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের জন্য নয়।প্রশ্নগুলির গঠন সাধারণ বহুনির্বাচনী ও বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মত।

উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে। এই নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, যুক্তি প্রদর্শন, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপক তৈরির নীতিমালা

- পাঠ্য বইয়ের তথ্যের আলোকে নতুন পরিস্থিতিমূলক উদ্দীপক তৈরি করতে হবে ।
- উদ্দীপক সর্বোচ্চ ৫-৬ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ভাষা হবে সহজ।
- অনুচ্ছেদ ছাড়া উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত ডায়াগ্রাম, ছবি, সারণি, গ্রাফ, ইত্যাদি।
- শুধুমাত্র প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা পরিমাপের জন্য উদ্দীপক তৈরি করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা বাক্য পরিহার করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টতা বজায় থাকলে একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করে করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও পত্রপত্রিকা, জার্নাল, গবেষনাকর্ম ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হতে পারে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নির্দেশক ছক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হচ্ছে দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর - এই চার প্রকারের দক্ষতা যাচাই করা হয় এই প্রশ্নের মাধ্যমে।তাই এক সেট প্রশ্নপত্রে মুল্যায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী চার দক্ষতার প্রশ্ন বিভিন্ন অনুপাতে সন্নিবেশ করতে হয়। আবার এই প্রশ্নগুলো যেন জীববিজ্ঞানের প্রতিটি অধ্যায় থেকেই আসে, কোন অধ্যায় বাদ না পড়ে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। আর এ কাজটি যথাযথভাবে করার উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে নির্দেশক ছক অনুসরণ করা।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নির্দেশক ছক হচ্ছে কলাম ও সারি সমন্বিত একটি ছক। এ ছকে কলাম বরাবর অধ্যায় এবং সারি বরাবর দক্ষতাস্তর সন্নিবেশিত থাকে। প্রশ্ন প্রণয়ন শেষে যে অধ্যায থেকে যে প্রশ্ন এসেছে তার ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশক ছকের সেই কলামে বসানো হয়। একইসাথে এই প্রশ্নটি কোন দক্ষতার তা বাম পাশের সারিতে তাকালেই বুঝা যায়। নির্দেশক ছকের মাধ্যমে এক নজরে দক্ষতার স্তরের শতকরা এবং অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নের ঘনত্ব বুঝা যায়।

এস.এস.সিতে চার দক্ষতার বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শতকরা হার		
চিন্তন দক্ষতা স্তর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শতকরা হার	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সংখ্যা (৩০)
জ্ঞান	৩০-৪০%	৯- ১২
অনুধাবন	৩০-৪০%	৯-১২
প্রয়োগ	১০-২০%	৫-৯
উচ্চতর দক্ষতা	১০-২০%	৫-৯

এইচ.এস.সিতে চার দক্ষতার বহুনির্বাচনী প্রশ্নেরশতকরা হার		
চিন্তন দক্ষতা স্তর	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের শতকরা হার	বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সংখ্যা (৩৫)
জ্ঞান	২৫-৩৫%	৯- ১২
অনুধাবন	২৫-৩৫%	৯-১২
প্রয়োগ	১৫-২৫%	৫-৯
উচ্চতর দক্ষতা	১৫-২৫%	৫-৯

নির্দেশক ছক

দক্ষতার স্তর	অধ্যায়													
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০ ১৪		১১	১২	১৩
উচ্চতর দক্ষতা														
প্রয়োগ														
অনুধাবন														
জ্ঞান														

৮.৫ : জীববিজ্ঞান বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উওরপত্র মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন হল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা পরিমাপের জন্য প্রণীত প্রশ্ন। এটি দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন।এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর- জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন) যাচাই করা যায়।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ভাল ধারণা থাকতে হয়। কেননা, সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর পাঠ্য বইয়ে সরাসরি ব্যক্ত থাকে না । আবার পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হয় না। তাই এ প্রশ্নের উত্তর আগেই তৈরি অবস্থায় বই পুস্তকে থাকে না। বইয়ের তথ্যের আলোকে পরীক্ষার সময়ই কেবল শিক্ষার্থীর মেধা খাটিয়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে হয়। আর এ কারণে শিক্ষার্থীরা বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। পরীক্ষায় ভাল করার আশায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা অর্জনে মনোযোগী হয়। আর এভাবে তাদের চিন্তন ক্ষমতা তথা সৃজনশীলতার বৃদ্ধি ঘটে।বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপরীক্ষায় উভয়ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্পূর্ণ বই মুখস্থ রাখতে হয় না বলে এ প্রশ্নে পরীক্ষা সময় দেওয়ার শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ মুক্ত থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্নের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো উত্তরপত্র মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা। সৃজনশীল প্রশ্ন দক্ষতাভিত্তিক হওয়ায় এর নৈর্ব্যাক্তিকতা সনাতনীর চেয়ে অনেক বেশি। এ কারণে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়িত হলেও প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য খুব কম থাকে

সৃজনশীল পশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক থাকে। এ উদ্দীপকের নিচে একই ভাব ঘটিত চারটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন (ক), (খ), (গ), (ঘ) থাকে। প্রশ্ন চারটি সহজ থেকে কঠিন- এ ধারাক্রমে বিন্যস্ত থাকে। নিচে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা দেখানো হল:

সৃজনশীল প্রশ্ন:একজন জীনত্ত্ববিদ R জীন বহনকারী লালচে ফলত্বকের কুলের সাথে g জীন বহনকারী সবুজ ফলত্বকের কুলের ক্রস করালেন। এর ফলে Rg ফিনোটাইপ সম্পন্ন লালচে ফলত্বকের কুল উৎপন্ন হল।

ক. ক্রেমোজোম কী? ১

খ. টেস্ট ক্রস বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F1 জনুর মধ্যে সংঘটিত ক্রম চেকারবোর্ডে উপস্থাপন কর।। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রথম বংশধরের সাথে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন কুলের মধ্যকার ক্রসের ঘটনা বিশ্লেষণ কর। ৪

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে। এই ১০ নম্বর (ক), (খ), (গ), (ঘ) এই চারটি অংশে বন্টিত থাকে।সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই শিখনফল বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রশ্ন (ক): এই অংশে ১ নম্বর বরাদ্ধ। এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর **স্মৃতি বাজ্ঞান দক্ষতা** যাচাই করা হয়।প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয় যেন উত্তর পাঠ্যবইয়ে সরাসরি পাওয়া যায়। পাঠ্যবইয়ে থাকে বলে উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়াই **শিক্ষার্থী স্মৃতি** থেকে এর উত্তর দিতে পারে।

প্রশ্ন (খ): এই অংশে ২ নম্বর বরাদ্ধ। এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর **বুঝার দক্ষতা** যাচাই করা হয়। এখানে পাঠ্য বইয়ে আছে এমন কোনো ধারণার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তবে পাঠ্য বইয়ে উত্তর সরাসরি থাকে না বলে স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ উত্তর করা যায় না। পঠিত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলেই শিক্ষার্থী প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রেও উদ্দীপকে সাহায্য ছাড়াই উত্তর করা যায়।

প্রশ্ন (গ) : এই অংশে ৩ নম্বর বরাদ্ধ। এখানে শিক্ষার্থীর **প্রয়োগ দক্ষতা** যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করতে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপকের তথ্য বিবেচনা করতে হয়। কারণ এখানে **উদ্দীপকের পরিস্থিতিটি থাকে সম্পূর্ণ নতুন**। এই নতুন পরিস্থিতিতে কী ঘটেছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ধারণার আলোকে শিক্ষার্থীকে তা শনাক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হয়।

প্রশ্ন (ঘ) : এ প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীর **উচ্চতর দক্ষতা** যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করতে উদ্দীপকের **তথ্য ও দিক নির্দেশনা** বিবেচনা করতে হয়। কারণ এখানে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ধারণার আলোকে **সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপটে** ঘটনাকে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয়। শিক্ষার্থীর শুধু স্মৃতি ও অনুধাবন দক্ষতা থাকলেই হয় না বরং বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা থাকতে হয়। এখানে বরাদ্ধকৃত নম্বর ৪।

সৃজনশীল প্রশ্নের উদ্দীপক

উদ্দীপক হচ্ছে পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বাস্তব কিংবা বাস্তবসম্বত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই উদ্দীপক সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা এ উদ্দীপককে ভিত্তি করেই নিচের (গ) ও (ঘ) প্রশ্নের উত্তর আবর্তিত হয়। পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়, প্রশ্ন, শিক্ষার্থী- এ তিনের মাঝে উদ্দীপক যোগসূত্র স্থাপন করে। উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে সরাসরি উত্তর বলে দেয় না, তবে উত্তর দিতে দিক নির্দেশনা দেয়। এ কারণে উদ্দীপক হতে হয় প্রাসঙ্গিক ও তথ্যবহুল ।

উদ্দীপক তৈরির নীতিমালা

- পাঠ্য বইয়ের তথ্যের আলোকে নতুন পরিস্থিতিমূলক উদ্দীপক তৈরি করতে হবে ।
- উদ্দীপক সর্বোচ্চ ৬-৭ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ভাষা হবে সহজ।
- শুধুমাত্র প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের দিতে উদ্দীপক তৈরি করতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা বাক্য পরিহার করতে হবে।
- বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টতা বজায় থাকলে একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করে **উদ্দীপক তৈরি** করা যাবে।
- পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও পত্রপত্রিকা, জার্নাল, গবেষনা কর্ম ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ছবি, চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদিও উদ্দীপক হতে পারে তবে তা তথ্য প্রদানের ঈঙ্গীতপূর্ণ হতে হবে।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শিক্ষার্থী পরীক্ষায় নিজের ভাষায় নিজের মত করে উত্তর প্রদান করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন অধিকতর নির্ভরযোগ্য করতে নমুনা উত্তর ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন নির্দেশিকা পরীক্ষককে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভগ্নাংশ নম্বর প্রদানের কোন সুযোগ নাই। নিচের মূল্যায়ন নির্দেশিকা দেখানো হল।

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থী সক্ষম হবে	প্রত্যাশিত উত্তর
১ক	১	জ্ঞান	তথ্য স্মরণ/ মনে করতে	
১খ	১	জ্ঞান	তথ্য স্মরণ/ মনে করতে	
	২	অনুধাবন	যা অনুধাবন করেছে তা প্রকাশ করতে	
১গ	১	জ্ঞান	তথ্য স্মরণ/ মনে করতে	
	২	অনুধাবন	যা অনুধাবন করেছে তা প্রকাশ করতে	
	৩	প্রয়োগ	কোনো বিষয়ে অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে	
১ঘ	১	জ্ঞান	তথ্য স্মরণ/ মনে করতে	
	২	অনুধাবন	যা অনুধাবন করছে তা প্রকাশ করতে	
	৩	প্রয়োগ	কোনো বিষয়ে অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে	
	৪	উচ্চতর দক্ষতা	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও যুক্তি সঙ্গত সিদ্ধান্তগ্রহণ	

সৃজনশীল প্রশ্নের দক্ষতাভিত্তিক নম্বর বন্টন নিচের সারণিতে সহজভাবে উপস্থাপন করা হল।

সৃজনশীল প্রশ্ন	মোট নম্বর	দক্ষতা স্তর অনুযায়ী নম্বর বিভাজন			
		জ্ঞান	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা
প্রশ্ন ক: জ্ঞানমূলক	= ১	১			
প্রশ্ন খ: অনুধাবনমূলক	= ২	১	১		
প্রশ্ন গ: প্রয়োগমূলক	= ৩	১	১	১	
প্রশ্ন ঘ: উচ্চতর দক্ষতামূলক	= ৪	১	১	১	১
মোট	= ১০ (১০০%)	৪ (৪০%)	৩ (৩০%)	২ (২০%)	১ (১০%)

৮.৬: জীববিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন ট্যুলস তৈরি ও শিক্ষার্থী মুল্যায়নে আইসিটির ব্যবহার

আমরা ইতোমধ্যে এ কথা ভালভাবেই জানি যে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মূল্যায়ন। আমাদের মাধ্যমিক স্তরে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক - দুই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে ধরনের মূল্যায়ন ট্যুলস বা প্রশ্ন ব্যবহৃত হয় সেটা মূলত বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন। এসব মূল্যায়ন ট্যুলস তৈরিতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হলেও বিদ্যায়ের মূল্যায়ন কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার খুব কমই চেখে পড়ে। আইসিটি সামগ্রির সহজ প্রাপ্যতা, উপযুক্ত পরিবেশ, ব্যবহারিক দক্ষতার অভাব প্রভৃতি কারণে এমনটি হতে পারে।এই পাঠে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে আইসিটি সামগ্রির পরিচিতি ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীর মূল্যায়নে আইসিটি যন্ত্রপাতি

আইসিটি(ICT- **I**nformation and **C**ommunication **T**echnology) হচ্ছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'। শিক্ষায় আইসিটি বলতে বুঝায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যহারের মাধ্যমে শিখন ও শেখানো। কম্পিউটার শিক্ষা ও আইসিটি এক জিনিস নয়। কম্পিউটার শিক্ষায় প্রযুক্তির দিকটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আইসিটিতে প্রযুক্তি বিবেচ্য বিষয় নয়। জীববিজ্ঞানশিক্ষায় আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন ওমূল্যায়নে শিক্ষক আইসিটিকে কত কার্যকররুপে কাজে লাগাতে পারছেন। আইসিটি কথাটির পরিধি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। যেকোন যোগাযেগ যন্ত্র এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। যেমন রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার। এ ছাড়াও এদের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ভিডিও কনফারেন্স, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি। শিক্ষামূলক এসব আইসিটি যন্ত্রকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক.)ইনপুট সোর্স: ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেপটপ, টেবলেট, ভিজুয়ালাইজার ক্যামেরা, স্মার্টফোন ইত্যাদি (খ) আউটপুট সোর্স: প্রজেক্টর, ইন্টরেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, ডিসপ্লে মনিটর, টেলিভিশন,স্মার্টফোন ইত্যাদি(গ) অন্যান্য:ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল রেকর্ডার ইত্যাদি।

মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখনের ও শিক্ষকের শেখানোর উন্নয়ন ঘটানো। কম্পিউটারের সহায়তায় শ্রেণিতে অফলাইন এবং অনলাইন উভয় অবস্থায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্ভব। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য আইসিটি ডিভাইসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

ওয়েভবিহীন বা অফলাইন মূল্যায়ন: কম্পিউটার, লেপটপ, প্রজেক্টার, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যমেরা, অডিও ভিডিও রেকর্ডার, ইউএসবি মেমরি স্টিক এসব আইসিটি যন্ত্রপাতি অফলাইন মূল্যায়নে ব্যবহৃত হতে পারে। শ্রেণির কাজে আইসিটিকে ব্যবহার করতে সবসময় ইন্টারনেট দরকার হয় না। কম্পিউটার, লেপটপ এমনকি মোবাইল ফোন কাজে লাগিয়ে অফলাইন অবস্থায় শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে উল্লেখিত আইসিটি ডিভাইসে সেগুলো স্থানান্তরিত করতে হবে। শ্রেণির কার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়নের নির্ধারিত স্থানে প্রশ্নগুলি প্রদর্শন করে স্বল্প সময় ব্যয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা যায়।

অনলাইন মূল্যায়নঃ ই-মেইল,ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, ব্লগ, উইকি, মোবাইল এপস প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্যমে অনলাইন অবস্থায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা যায়। এই ব্যবস্থায় বাড়তি সুবিধা হল নিজের তৈরি ট্যুলস ব্যবহার ছাড়াও ওয়েভসাইটের বিভিন্ন রিসোর্সকে শিক্ষক মূল্যায়নের কাজে লাগাতে পারেন। নিচে এদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যকারিতা তুলে ধরা হল।

ই-মেইলঃ শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের ইমেইল সুবিধা থাকলে শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে যে কোন সময়ে শিক্ষার্থীর কাছে প্রশ্ন প্রদানের মাধ্যমে মূল্যায়ন কাজ করা যায়। এ ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ট্যুলস যদি ইন্টারেক্টিভ হয় হয় তবে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের মূল্যায়ন করতে পারেন।

ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ডঃ এ ধরনের বোর্ড শ্রেণিকক্ষের প্রাচীরে সাথে যুক্ত থাকে। এটি যখন চালু করা হয় তখন সম্পূর্ণ বোর্ডটি কম্পিউটারের মনিটরের মত একটি বিশাল মনিটরে পরিনত হয়। কম্পিউটার থেকে ডাটা প্রজেক্টারের মাধ্যমে এতে ডিজিটাল ফাইল স্থানান্তর করে প্রদর্শন করা যায়। এতে লেখার জন্য হাতের আঙ্গুলই যথেষ্ট। তবে এক বিশেষ ধরনের কলমের সাহায্যেও এর উপর লেখা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ে এর উপর লিখতে পারেন। শিক্ষক ইচ্ছামত মূল্যায়ন ট্যুলস ব্যবহার করে এর সাহায্যে মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন করা যায়।

ওয়েব ব্লগঃএটি মূলত ওয়েভভিত্তিক জার্নাল বা লগ বই যেখানে লেখক তার লেখা ব মতামত প্রকাশ করে থাকেন। তবে এই ব্লগ গ্রুপভিত্তিক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপের সকলে এতে লেখালেখি করতে পারেন। এখানে তথ্য বা লেখা ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। জীববিজ্ঞান শ্রেণিশিক্ষক তাঁর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ওয়েভ ব্লগ খুলে শিখন শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে কাজে লাগাতে পারেন।

উইকিঃ এটি একটি ওয়েভসাবইট যেখানে ব্যবহারকারীরা এতে কোন কিছু সংযোজন, বিয়োজন বা সম্পাদনা করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট শ্রেণিশিক্ষক ঐ শ্রেণির জন্য উইকি খুলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন করতে পারেন।

মোবাইল এপস-সক্রেটিভঃ বিভিন্ন ধরনেরমোবাইল এপস তৈরি বা সংগ্রহ করেও মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়।এ ধরনের একটি জনপ্রিয় ও কার্যকরী মোবাইল এপস হল সক্রেটিভ। এই এপস এক্সারসাইজ বা অনুশীলন ও গেমস এর মাধ্যমে পুরো ক্লাশকে সমপৃক্ত করা যায়।শিক্ষার্থীর ইন্টারেকটিভ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষক সক্রেটিভে নানা ধরনের প্রশ্ন সংযোজন করতে পারেন।

আমাদের পরীক্ষা পদ্বতিতে আইসিটিভিত্তিক মূল্যায়ন কেবল ধারাবাহিক বাগাঠনিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সামষ্টিকের ক্ষেত্রে নয়। কেননা ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিতে সংঘটিত হয়, আর আইসিটিভিত্তিক মূল্যায়ন শ্রেণির কাজেরই অংশ।

মূল্যায়নে আইসিটির ব্যবহার

আমাদের শ্রেণিকার্যক্রমে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রচলিত ধারা হচ্ছে পাঠের শেষ পর্যায়ে কয়েকজনকে কিছু মৌখিক প্রশ্ন করা। আবার এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষক শ্রেণিতে সুনির্দিষ্ট না করে সকলের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর পাঠার্জন সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। তাছাড়া প্রতিদিন একই ধরনের গতানুগতিক মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের নিকট একঘেয়েমি লাগতে পারে। অন্যদিকে এটাও সঙ্গত যে, সকল বিষয়ে কিংবা সকল অধ্যায়ের মূল্যায়ন চাহিদা এক না। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, ৯ম-১০ম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানেরসকল অধ্যায়ের মূল্যায়নের প্রকৃতি একইরুপ হবে না। কেননা কোন অধ্যায় অতিমাত্রায় তথ্য নির্ভর, কোনটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নির্ভর যা হাতে কলমে করার দরকার হয়, আবার কোনটি ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্বলিত।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের ভালভাবে প্রস্তুত করা। কিন্তু শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন তৈরি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। শ্রেণিতে বসে স্বল্প সময়ে দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।এসব ক্ষেত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরিকৃত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সফট কপি হিসাবে তৈরি করে রাখলে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে অতি সহজে যথাযথভাবে সকলের মূল্যায়ন করা যায়। আইসিটিতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। শুধুমাত্র

বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক না। কম্পিউটার ও আইসিটি ব্যবহার করে এর বাইরেও নানা ধরনের প্রশ্ন তৈরি ও মূল্যায়ন সম্ভব। নিচে আইসিটি যন্ত্রে সচরাচর ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি প্রশ্ন উল্লেখ করা হল-

বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নঃ জীববিজ্ঞানে ভাল মানের বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করতে অনেক চিন্তা ভাবনা ও সময়ের প্রয়োজন হয়। একটি শ্রেণিতে বরাদ্দকৃতসময়ে পাঠকার্যক্রম শেষে বোর্ডে বহুনির্বচনী প্রশ্ন লিখে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক আইসিটিকে কার্যকরীরুপে কাজে লাগাতে পারেন। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এর অংশ হিসেবে কয়েকটি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন তৈরি করে রাখতে পারেন। অতপর ক্লাশের মূল্যায়ন অংশে প্রজেক্টার, ইন্টারেক্টিভ হোয়াইট বোর্ড, মোবাইল ফোন অথবা অন্য কোন আইসিটি ডিভাইসে প্রদর্শন করে দ্রুততম সময়ে সকল শিক্ষাথীর মূল্যায়ন সম্ভব। এর ফলে আনন্দদায়ক উপায়ে অথচ কম সময়ে বেশি কাজ করা যায়।

মিলকরণ : জীববিজ্ঞানে কিছু কিছু পাঠ থাকে জীবের বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গসংস্থানের বর্ণনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা। এসব পাঠ শুধু তথ্যে পরিপূর্ণ যা বুঝতে গভীর চিন্তার দরকার হয় না কিন্তু মনে রাখার প্রয়োজন পড়ে। এ ক্ষেত্রের কোন অংশের সাথে কোন অংশের মিল বা সম্পর্ক রয়েছে এসব বিবেচনা করে এক সেট প্রশ্ন মিলকরণ প্রশ্ন প্রজেক্টারে অথবা অন্যান্য আইসিটি ডিভাইস ব্যবহার শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করা যায়।

সত্য মিথ্যা : পাঠের প্রকৃতি ও মূল্যায়নের চাহিদা মোতাবেক তত্ত্ব ও তথ্যের সঠিকতা, কারণ ও ফলাফল এ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীর মান যাচাই করতে সত্য মিথ্যা নামক প্রশ্নেরও আশ্রয় নেওয়া যায়।

শূন্যস্থান পূরণঃ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখা ও বুঝতে পারার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য এ ধরনের প্রশ্নের সেট তৈরি করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে বৈচিত্রময় মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করানো হচ্ছে মূল্যায়নের লক্ষ্য।

কুইজ ও গেমসঃ **পাঠ্য**বইয়ে কখনো কখনো এমন কিছু বিষয় থাকে যা মনে রাখা কষ্টকর এবং বিরক্তিকরও বটে। এ ধরনের পাঠে আনন্দ থাকে না। কিন্তু এগুলো বাদ দেওয়ার উপায় নেই। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম মনে রাখা। এ ক্ষেত্রে কুইজ ও গেমস এর মাধ্যমে শিখন ও মূল্যায়ন দুটোই এক সাথে করা যায়। শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরে এটি করতেও আইসিটি ডিভাইস দরকার।বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইন কুইজ বা টেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে।

চেকলিস্টঃ কোন জিনিসের সম্পূর্ণতা জানা কিংবা সামগ্রিক কোন কিছু থেকে যেন কিছু বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এটি করা হয়। যেমন, ব্যাঙের দেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চেকলিস্ট, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট নিয়ামকগুলির চেকলিস্ট ইত্যাদি।

প্রবাহচিত্র বা ফ্লো-চার্টঃ জীববিজ্ঞানের বেশিরভাগ বিষয়বস্তু জুড়েই রয়েছে জীবের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয় যা প্রবাহচিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। যেমন- কোষ বিভাজনের বিভিন্ন ধাপ, প্রাণীর পরিপাক পদ্ধতি, শ্বসন প্রক্রিয়া , রক্ত সংবহন পদ্ধতি প্রভৃতি। শিক্ষার্থীর এ সংক্রান্ত শিখন যাচাইয়ের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্ন প্রণয়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে আইসিটিকে কাজে লাগাতে পারলে শিখন শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ হবে এবং সময়ের সাশ্রয় করা যাবে। তবে এসব ডিভাইস ব্যবহারের আগে শিক্ষককে এর সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধাগুলো মনে রাখতে হবে। মূল্যায়নে আইসিটি ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে অতি অল্প সময়ে, সঠিকভাবে, অনন্দের সাথে মূল্যায়ন করা যায়। অসুবিধাগুলো হচ্ছে আইসিটি যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ভাবে স্থাপন করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন পড়ে। বৈদ্যুতিক গোলযোগ থাকতে পারে। অভিজ্ঞতার অভাবে এর ব্যবহার কঠিন হতে পারে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মূল্যায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে সামষ্টিক মূল্যায়ন থেকে পৃথক ব্যাখ্যা করুন?

৩। বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নের প্রয়োজনীয়ত বিশ্লেষন করুন।

৪। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের দক্ষতা স্তর কয়টি ও কী কী?

৫ । নির্দেশক ছক কী? এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জীববিজ্ঞানের পাঠ অবলম্বনে মূল্যায়নের তিনটি ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করুন।

২. একজন জীববিজ্ঞান শিক্ষক ৬০ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে উদ্ভিদের অভিস্রবণ প্রক্রিয়া বুঝানোর জন্য ৬টি দল গঠন করে হাতে কলমে কাজের নির্দেশ দেন। অতপর ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রেণির কাজ সমাপ্ত করলেন। শিক্ষক নিজের এবং শিক্ষার্থীর কোন কোন দিক মূল্যায়ন করলেন? ব্যাখ্যা করুন।

৩. জীববিজ্ঞান শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে সামষ্টিক মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. এক সেট বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়ণ করুন এবং নির্দেশক ছকে উপস্থাপন করুন।

৫. শিখনফলের ভিত্তিতে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করুন এবং সম্ভাব্য উত্তর লিখুন।

Reference:

1. http://www.cmu.edu/teaching/assessment/howto/basics/formative-summative
2. https://www.bookwidgets.com/blog/2017/04/the-differences-between-formative-and-summative-assessment

ইউনিট ৯ : জীববিজ্ঞানে স্ব-শিখন

সাধারণ অর্থে শিখন বলতে বোঝায় নতুন কোন জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতা অর্জন। জীবন ধারণের জন্য মানুষকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবেশও বদলে যায়। মানুষকে নতুনতর পরিবেশ ও সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার জন্য তাকে আয়ও করতে হয় নিত্য নতুন জ্ঞান, কলাকৌশল ও আচরণ। এই নতুন জ্ঞান ও কলা কৌশল আয়ত্ত করা এবং সে অনুযায়ী আচরণ সম্পন্ন করাই হল শিখন। অতএব বলা যায়, শিখন হল আচরণিক পরিবর্তন। "স্ব-শিখন" অর্থ হল নিজে নিজে শেখা। এটি এমন একটি পিদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাধ্যম থেকে স্ব-উদ্যেগে শিক্ষা গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করে এবং শিক্ষার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে না। স্ব-শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব, আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। সর্বোপরি প্রয়োজন শিখন অভ্যাস। মনোবিদ মেগিয়ক (Megeoch) শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন "শিখন হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন"। অর্থাৎ ক্রিয়া বা আচরণের পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হল শিখন অভ্যাস। আর শিখনের অভ্যাস মূলত: গড়ে উঠে স্ব-শিখনের মাধ্যমে। স্ব-শিখনের অভ্যাস শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর নিজের ইচ্ছাতেই গড়ে ওঠে না, এর জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা। অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, বিদ্যালয় ও সামগ্রিক পরিবেশ। এই ইউনিটের সিলেবাসে উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে তিনটি সাব ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি নিম্নরুপে বিন্যাস করা হয়েছে---

৯.১ : জীববিজ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা, শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠন, নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল

৯.২ : ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন, জীববিজ্ঞান শিখনের নবতর ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনগাদ রাখা, জীববিজ্ঞান শিখনে প্রতিফলন প্রক্রিয়া/কর্ম সহায়ক গবেষণা

৯.১ : জীববিজ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা, শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠন, নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল

জীববিজ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ সর্ম্পকে অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন। বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছ ও যুক্তিসম্মত চিন্তা করতে ও নিজের হাতে কাজ করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা দান করে । আর, দক্ষতা হল একটি কাজ নিখুঁতভাবে করার যোগ্যতা। কোন ব্যক্তি একটি কাজ যত নিখুঁতভাবে করতে পারবেন তিনি সেই কাজে তত দক্ষ। বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ,অনুমিত ভবিষ্যৎবাণী, যৌক্তিক পাঠব্যাখ্যা, সংখ্যার ব্যবহার, যোগাযোগসাধন ও লিপিবদ্ধ করণ, শ্রেণিকরণ, হিসাবকরণ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, উপাত্ত বিশ্লেষণ ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। দক্ষতা এমন একটি জিনিস যা কেউ কাউকে দিতে পারে না। দক্ষতা ব্যক্তিকেই অর্জন করতে হয়। জীববিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষাদানে যেমন দক্ষ হবেন তেমনি ভাবে জীববিজ্ঞান বিষয়েও দক্ষ হবেন। জীববিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের দক্ষতা প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে আত্মস্থ করবেন এবং বাস্তবে প্রয়োগ করবেন। যা সকল জীববিজ্ঞান শিক্ষকের দরকারি একটি বিষয়। অনুশীলন অনঅভিজ্ঞকে অভিজ্ঞকরে তোলে। যে যতো বেশি অভিজ্ঞ হবে, তার কাজ করা তত বেশি সহজ হবে। আবার এর ওপর নির্ভর করে সে শিক্ষক সফলতার মুখ দেখতে পাবেন। আর একটি জিনিস হলো আত্মবিশ্বাস। এটি না হলে শুধু পেশাগতভাবেই নয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য আসবে না। নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপনা করার কৌশল জানা জীববিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। সেটি কাজের ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হোক।

দক্ষতা হচ্ছে অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের স্থায়ী অবস্থা যা সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা। কোন কিছু জানা বা বোঝা হলো জ্ঞান এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে প্রজ্ঞাবান হওয়া হল দক্ষতা। ব্যক্তি যখন কোন একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ইতিবাচক চিন্তা করে এবং বার বার চর্চা করে তখন সে দক্ষতা অর্জন করে। দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন অত্যাবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলনের ধরণ ও প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা আছে।

দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলনের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয়। শিক্ষক অনুশীলনের জন্য নিজকে পরিবেশে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন। অনুশীলনের জন্য আগ্রহ এবং প্রেষণার প্রয়োজন যা অনুশীলনের দক্ষতা তৈরি করে।

শিক্ষার্থীর জন্য অনুশীলন দক্ষতা

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা নির্ভর করে সে কোন কাজে সক্রিয় ভাবে করছে কি না কিংবা সে সচেতন ভাবে লক্ষ্যাভিমুখি হয়ে কি পরিমাণ অনুশীলন করছে। গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলন দক্ষতা অর্জনে সহায়ক। সচেতন বা চিন্তন মূলক অনুশীলন তাৎক্ষণিক দক্ষতা অর্জনে কার্যকর। চিন্তন মূলক অনুশীলন, যান্ত্রিক অনুশীলন এর মত নয়। যান্ত্রিক অনুশীলনে কোন কাজকে নাবুঝে পুনরাবৃত্তি করাকে বুঝায় যেখানে কোন প্রকার মানের উন্নয়ন ঘটে না। চিন্তন মূলক অনুশীলন মনোযোগ, আগ্রহ, রিহার্সাল দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা বুঝায় যা নতুন জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনের দিকে নিয়ে যায় এবং পরবার্তি সময় নতুন জটিল জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।। চিন্তন মূলক অনুশীলন এর মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যক্তির দক্ষতা উন্নয়নের চিন্তন থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুশীলনের প্রেষণা তৈরির জন্য শিক্ষককে কৌশলী হতে হয়। একজন বিজ্ঞান শিক্ষককে জানতে হবে কি প্রক্রিয়ায় এবং কত সময়ে বিজ্ঞান অনুশীলনের (ব্যবহারিক পরীক্ষণ) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এর জন্য তিনি অবশ্যই প্রথমত বৈজ্ঞানিক দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে শিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের কি ধরনের কাজের মাধ্যমে এসব বৈজ্ঞানিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা তিনি গুরুত্ব অনুসারে নিজের ডায়রীতে লিখবেন। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক মনস্কতার মাত্রা মাপতে হবে তাঁকে। অত:পর তিনি শিক্ষার্থীর অনুশীলন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর কাজে নিয়োজিত করবেন।

অনুশীলন শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পরিবর্তন আনে

- অনুশীলন শিক্ষার্থীর নতুন তথ্য স্মরণ করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। (Anderson, 2008).
- অনুশীলন শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়তা বাড়ায় (automaticity) (প্রতিনিয়ত জ্ঞানের উপাদানগুলিকে প্রয়োগ করতে শিখতে শেখা)। স্বংক্রিয়তা শিক্ষার্থীর চিন্তন মূলক জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেয়। স্বয়ংক্রিয়তা ব্যাপক রিহার্সাল এবং পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে অর্জিত হয়। সমস্যা সমাধানে চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়তা চিন্তন মূলক জ্ঞানকে কাজে লাগায়। (Brown & Bennett, 2002 Moors & De Houwer, 2006).
- শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান করার অনুশীলনে যে দক্ষতাগুলি অর্জন করে একিসাথে সে দক্ষতাগুলিকে নতুন এবং আরও জটিল সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সক্ষমতা অর্জন করে। এটি শৈশব এর জন্য যেমন সত্য (Glover, Ronning, & Bruning, 1990) তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সমভাবে সত্য। (Li, Schmiedek, Huxhold, Röcke, Smith, & Lindenberger, 2008)।
- অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা আরো শেখার জন্য অনুপ্রেরণা নিয়ে আসে (Kalchman, Moss, & Case, 2001)।
- অনুশীলন শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
- অনুশীলন শিক্ষার্থীকে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অবিষ্কার করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দদায়ক পরিবেশে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে অনুশীলনের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। জীববিজ্ঞানের দক্ষতাগুলো যেন অর্জিত হয় সে জন্য হাতে-কলমে কাজ, পরীক্ষণ, প্রকল্প, সমস্যা সমাধান ইত্যাদিতে সুপরিকাল্পত ভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করে অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে হবে। অবশ্যই অনুশীলনের মাঝে এবং পরে ফলাবর্তনের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন পরবর্তী অনুশীলনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুশীলন করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর উচ্চচিন্তন ক্ষমতা বাড়বে, অর্ন্তদৃষ্টি তৈরি হবে এবং আগ্রহ ও প্রেষণা জাগ্রত হবে।

শিক্ষকের জন্য অনুশীলন দক্ষতা

শিক্ষার্থীকে অনুশীলনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয় আর শিক্ষককে অনুশীলনের জন্য পরিবেশ তৈরি করে নিতে হয় আবার কখনো কখনো কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে অনুকূল পরিবেশ তৈরির ব্যবস্থা করতে হয়। শিক্ষকের অনুশীলনের ক্ষেত্র ব্যপক ও বিস্তৃত। তিনি তাঁর বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং একইসাথে শ্রেণিতে শ্রেণি ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন।অনুশীলন শিক্ষককে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নানা বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে শিখায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। সূক্ষ্মচিন্তন ও দক্ষতার সাথে অনুশীলনের জন্য দৈনন্দিন কর্মের প্রতিফলন ডায়েরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। প্রতিনিয়ত আত্মবিশেষণের অনুশীলন শিক্ষককের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। পেশাগত আচরণ, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, পরিবেশ-পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, জীববিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় বস্তুর সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপন, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রয়োগ (হাতে-কলমে কাজ, পরীক্ষণ, প্রকল্প, সমস্যা সমাধান,অংশগ্রহণমূলক কাজ ইত্যাদি), আই.সি.টি এর যথাযথ ব্যবহার, উপকরণ সংগ্রহ এবং তৈরি, অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ, কর্মসহায়ক গবেষণা ইত্যাদি নানা কার্যক্রমে জীববিজ্ঞান শিক্ষককে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। আর একটি বিষয় পেশাগত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত আর তা হলো ভাষাগত দক্ষতা। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রেই এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নির্ভুল ও স্পষ্টভাবে কথা বলার দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। তা ক্রমান্বয়ে গতানুগতিক ও প্রথাসিদ্ধ ধারা থেকে অধিকতর পেশাদার ধারার দিকে ধাবমান। শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক, মিথষ্ক্রিয়াভিত্তিক ও স্বকীয় শিখন উপযোগী পদ্ধতিসমূহের। কার্যকর শিখন অর্জনের জন্য এবং শিখনের যথার্থ মান যাচাইয়ের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে সৃজনশীল/কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি এবং উচ্চতর মানের নৈর্ব্যক্তিক তথা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ন্যায্যতা, সমতা এবং একীভূতকরণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে কার্যকর নেতৃত্ব ও নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে "কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PBM)"। উল্লেখিত সকল ক্ষেত্রে শিক্ষককে অভিযোজিত হওয়ার জন্য ক্রমাগত অনুশীলন করতে হবে এবং সময়ের সাথে সাথে অনুশীলন কৌশলও বদলাতে হবে।

জীববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনবরত তাঁকে নানা ক্ষত্রে নানা কৌশলে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। জীববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিচে অনুশীলনের পাঁচটি কৌশল উল্লেখ করা হলো।

দৈনন্দিন কর্মের প্রতিফলন ডায়েরী

শিক্ষক দৈনন্দিন তার পেশাগত কার্যাবলীতে ব্যাক্তিগত উন্নয়নের জন্য যে দিনলিপি তৈরি করেন তাহাই প্রতিফলন ডায়েরি। প্রতিফলন ডায়েরি শিক্ষকের ত্রমোন্নতির একটি দিকনির্দেশক। এ ডায়েরি১অনুসরণ করে শিক্ষক নিজেই তার শিখন কার্যক্রম ক্রমোন্নতি বুঝতে পারেন। বিশেষজ্ঞ, সতীর্থ শিক্ষকের প্রতিফলন ডায়েরি আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন। শিক্ষক যখন একটি ভাল পাঠ পর্যবেক্ষণ করেন কিংবা নিজেই নিজের পাঠের ভালমন্দ বিচার করেন সেই অনুযায়ী ভাল দিকগুলো অনুশীলন করেন এবং মন্দ দিকগুলো বর্জনের চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা বা অনুশীলন তাকে অবশ্যই ভালো শিক্ষক হতে সহায়তা করবে। এ পদ্ধতিতে পেশাগত কাজের ভালো দিকগুলোই নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হবে, খারাপ দিকগুলো নয়। দৈনন্দিন কর্মের প্রতিফলন ডায়েরিতে শিক্ষক বৈচিত্রময় নানা ধরনের তথ্য-উপাত্ত লিখেন। এই তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল ভবিষতে সমস্যা সমাধানে এবং সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রতিদিনের কর্মকান্ডের ধারাবাহিক বিবরণ শিক্ষককে নতুন করে আবিষ্কার করতে শিখায় এবং প্রতিটি অনুশীলনে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সামর্থ্য যোগায়। ভালো কৌশলগুলো পুনঃপুন প্রয়োগ এবং দুর্বল দিকগুলো সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষক আদর্শ শিক্ষকে রূপান্তরিত হন।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ/ ইনহাউস ট্রেনিং (On-job training/In house training)

কর্মরত থাকাকালীন অবস্থায় যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয় তাকে বলে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ। কর্মীরা নিজস্ব কর্মপরিবেশেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কর্মীকে কর্মস্থলের বাইরে যেতে হবেনা। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থেকেই আত্মোপলব্ধি এবং আত্ম-অনুশীলনের মাধ্যমে কর্মীগণ প্রশিক্ষিত হবেন। সেকারণে এ ধরনের প্রশিক্ষণকে In house প্রশিক্ষণও বলা হয়। এটি হচ্ছে 'নিজে করে শেখা' পদ্ধতি। এইপদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কর্ম ক্রমাবর্তন, কোচিং/কর্ম নির্দেশনা, জ্যেষ্ঠ কর্মীর অধীনে সহকারী অথবা শিক্ষানবিস হিসাবে কর্মরত থাক, বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি। কর্মকালীন প্রশিক্ষণপদ্ধতি

অনুশীলনভিত্তিক এবং স্বশিখনের সহায়ক। এই পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধায়ক, জ্যেষ্ঠ কর্মী, দক্ষ কর্মী অথবা প্রশিক্ষিত কর্মীরা প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। নতুন জ্ঞান এবং দক্ষতা শিক্ষকদের মধ্যে বিস্তরনের জন্য প্রতিষ্ঠান ইনহাউজ ট্রেনিং এর আয়োজন করে যেখানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নবলব্দ দক্ষতা সহকর্মীদের জানান এবং প্রশিক্ষিত করে তোলেন। বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা নিয়েও প্রতিষ্ঠান ইনহাউজ ট্রেনিং এর আয়োজন করে। এ ক্ষেত্রে ট্রেনিং এর লক্ষ, উদ্দেশ্য,কৌশল এবং ফলোআফ কৌশল পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়। ফলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের আওতায় আসে। ইনহাউজ ট্রেনিং, দক্ষতা আনুশীলনের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের উন্নয়ন ঘটালেই হবেনা, যদি না প্রশিক্ষণের অর্জন শিক্ষকগণ কর্মে প্রয়োগ করেন। এই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান এক্ষেত্রে একজন Cotrainer এর ভূমিকা পালন করবেন। কর্মীদের প্রশিক্ষণের অর্জন ফলপ্রসূ করার জন্য তাঁর করণীয় হতে পারে-

- প্রশিক্ষণের প্রতি শিক্ষকের আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রণোদিত করা।
- শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রশিক্ষণের অর্জনকে কাজে প্রযুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রশিক্ষণের অর্জনকে প্রয়োগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ পাঠসামগ্রি ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

আত্মসমীক্ষা এবং আত্মোন্নয়ন : শিক্ষকের আত্মসমীক্ষা এবং আত্মোন্নয়ন ছক তৈরির জন্য যে বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে-

- আত্মসমীক্ষা এবং আত্মোন্নয়ন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখতে হবে।
- পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করতে হবে।
- প্রতিটি ক্ষেত্রকে আবার দক্ষতা অনুযায়ী উপভাগ করতে হবে।

প্রতি ক্ষেত্রের উন্নয়ন মাত্রা নির্দিষ্ট করতে হবে। (অধুনিক গবেষণার ফলাফল ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথেসাথে উন্নয়ন মাত্রা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বদলাতে হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে হবে এবং স্বশিখন এর মাধ্যমে নিজকে কেতাদুরস্ত রাখতে হবে। নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।)

এমন ভাবে ছক তৈরি করতে হবে যেন উপযুক্ত ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নিজের সবলতা ও দুর্বলতা জানা যায় এবং পরবর্তীতে অনুশীলনের মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বলতা দূর করা করা যায়।

শিক্ষকের আত্মসমীক্ষা এবং আত্মোন্নয়ন ছক এর নমুনা

ক্র. নং	পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র	৪-চমৎকার	৩- খুবভাল	২- ভাল	১-উন্নয়ন প্রয়োজন	মন্তব্য
১	উপকরণের ব্যবহার	যথাযথা উপকরণ ব্যবহার করি (স্বল্পমূল্য বা ব্যয়হীন উদ্ভাবনী মূলক উপকরণ সহ) এবং শিক্ষার্থীদেরকে এসব ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট করি	উপকরণ ব্যবহার করি তবে তা উদ্ভাবনী মূলক এবং শিক্ষার্থীদেরকে এসব ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট করি	মাঝে মধ্যে উপকরণ ব্যবহার করি কিন্তু তা মূলত প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি	নামমাত্র উপকরণ ব্যবহার করি	
২	--------	--------	---------	----------		

মাইক্রোটিচিং

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একেবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রতিটিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই মাইক্রটিচিং। সুতরাং মাইক্রটিচিং এমন এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বার বার অনুশিক্ষণ করে আয়ত্ত করতে হয়। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের পদ্ধতি অবলম্বন করে কৌশল বা দক্ষতা বাস্তবায়নের শিক্ষা অনুশীলন করাই মাইক্রটিচিং বা অনুশিক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের নানাবিধ দক্ষতা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য মাইক্রটিচিং পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজকে প্রস্তুত করতে পারেন।

শিখনে ভালপাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠন

শিক্ষার্থীর শিখন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। শিক্ষকের পক্ষে সকল কিছু শিখিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। তিনি পদ্ধতি শেখাবেন বা শিখনের উপায় বলে দেবেন এবং শিক্ষার্থী অনেক কিছুই নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিখবে। শিক্ষার্থীর নিজ প্রচেষ্ঠায় অর্জিত এ শিখনকে স্ব-শিখন বা (Self Learnign) বলা হয়। ভাল পাঠ বা শিখন অভ্যাস গঠন এক ধরনের স্ব-শিখন।

জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য শিক্ষার্থী যখন নিজ উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বা পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় রত হয় তখন তাকে শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস বলে। শিক্ষক ছাড়া নিজেরা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজস্ব দুর্বলতা শনাক্ত করার প্রক্রিয়াকেও ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস বলা যায়।

শিখনে ভালপাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনের উপায়

বিজ্ঞান শিখনে ভালপাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য করনীয় কাজের তালিকা।

১. পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, নিজে বার বার অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা হিত্যাদি।

২. শ্রেণিতে অবস্থানকালীন সময়: শ্রেণিতে অবস্থানকালীন সময়ে শিক্ষকের আলোচনা গভীর মনোনিবেশের সাথে অনুধাবনের চেষ্টা। শিক্ষকের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তথ্য, তত্ত্ব, ব্যাখ্যা, উদাহরণ খাতায় নোট করার অভ্যাস গঠন। কোন অংশ না বুঝলে প্রশ্ন করা। খাতায় তোলা নোট মাঝে মধ্যে শিক্ষককে দিয়ে চেক করানো। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা, অবসর সময়কে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

৩. সহ-শিক্ষা ক্রমিক দক্ষতা অর্জনে

উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা, বির্তকে অংশগ্রহণ। বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ বা নিজে থেকে বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান যাদুঘর বা শিক্ষামূলক ভ্রমনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

৪. অন্যান্য উপায় সমূহ: নিয়মিত পেপার, পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী পড়ার অভ্যাস গঠন। লাইব্রেরীতে বসে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যগত বই পড়া। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের আর্টিকেল, নতুন নতুন আবিষ্কার, তথ্য সংগ্রহের অভ্যাস, প্রযুক্তির ধারণা গ্রহণ। নিজ থেকে উদ্ভাবনের চেষ্টা, সখের জিনিস বানানো, টেলিভিশনে শিক্ষণীয় বিষয় দেখা, সম্ভব হলে Internet ব্রাউজিং করা ইত্যাদি।

বিজ্ঞান শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনের ফলাফল

১. ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের জন্য দলীয় কাজের ব্যবস্থা করা। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সুযোগ দেয়া। সরাসরি উত্তর বলে না দিয়ে উত্তর প্রদানের জন্য পরিবেশ তৈরি করা। শ্রেণিতে নোট লিখতে বলা। বিভিন্ন ধরনের সহায়ক ও উচ্চ শ্রেণির বই পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান, প্রয়োজনে নাম বলে দেয়া। লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করা। বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজন এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। বিজ্ঞানের জার্নাল, সাময়িকী, ম্যাগাজিন বা বুলেটিন সংগ্রহরে পন্থা বলে দেয়া।

২. বিজ্ঞান শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনের ফলাফল

ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠনের ফলে - ছাত্র-ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশিত হয়। বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট হয়। স্মৃতিপটে দীর্ঘদিন গেঁথে থাকে এবং মেধা ও দক্ষতা বাড়ে। শিক্ষক ছাড়াও নিজেরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিখতে পারে। শিখন স্থায়ী হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধানে পারদর্শী হয়ে ওঠে। চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন ঘটে, বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদে বিজ্ঞানী তৈরি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান শেখার গতানুগতিক ধারা পরিবর্তিত হয়, নতুনত্ব আসে।

নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল

চিন্তা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ প্রতিনিয়ত কোন না কোন বিষয় নিয়ে চিন্তাযুক্ত থাকে। এই চিন্তা কখনও বিক্ষিপ্ত, হালকা অথবা গভীর হয় এবং ধারাবাহিক। সকল চিন্তারই একটি সাময়িক পরিণতি অর্থাৎ সমাধান থাকে। সমস্যা সমাধানের পর আবার নতুন চিন্তা আসে। অর্থাৎ কখনও চিন্তামুক্ত থাকা যায় না। চিন্তায় নিমগ্ন থাকার ব্যাপারটিকে আমরা একান্ত নিজস্বতা বলতে পারি। নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আমরা কখনও অন্যের সংগে ভাগাভাগি করি যা আমাদের চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এটিকে আমরা চিন্তার উন্নয়ন বলতে পারি। বিজ্ঞান সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তার উন্নয়নের জন্য তেমনি অন্য কোন সূত্র থেকে নতুন তথ্য যোগ করার প্রয়োজন হতে পারে। নিজস্ব চিন্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত নতুন কোন বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য যোগ হওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন বলতে পারি।

নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়নের উপায়

নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল সমূহ-

- রেডিও, টেলিভিশনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তগত খবরা খবর শোনা
- বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করা
- প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে ভাবা
- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যাগুলো শনাক্ত করা ও তা সমাধানের জন্য নিজে নিজে চেষ্টা করা
- যে কোন ঘটনাকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা
- সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে সহপাঠিদের সংঙ্গে আলাপ করা
- পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানের ঘটনা পড়া
- বিজ্ঞানের বই পড়া
- বিজ্ঞান সাময়িক বা জার্নাল পড়া
- এককভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা
- শিক্ষকের বক্তৃতা শুনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নোট করার অভ্যাস গঠন
- বিজ্ঞানের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করা.....ইত্যাদি

নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়নে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

- সহপাঠক্রমি কার্যাবলি
- বিজ্ঞান ক্লাব
- বিজ্ঞান যাদুঘর
- বিজ্ঞান মেলা
- বিজ্ঞান সপ্তাহ উদযাপন
- শিক্ষামূলক ভ্রমন
- বিজ্ঞান বিষয়ক ক্যুইজ
- বিজ্ঞান বিষয়ে বিতর্ক সভা

- প্রকল্প তৈরি
- বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনা/সিম্পোজিয়াম/আলোচনা সভা
- বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি

নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়নে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ভূমিকা

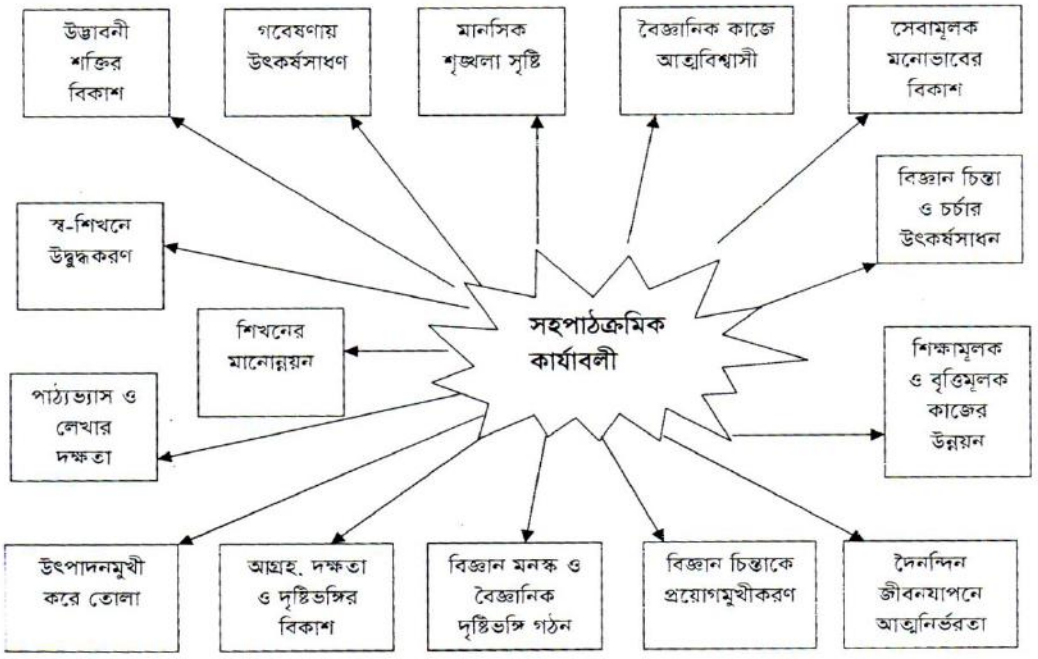

চিত্র : ধারণা মানচিত্র

৯.২ : ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন, জীববিজ্ঞান শিখনের নবতর ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনগাদ রাখা

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে সূচারুভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষকের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন । শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষক কর্তৃক শুধুমাত্র কর্মসম্পাদনের দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জনই বোঝায় না, দক্ষতা এবং যোগ্যতার সাথে ভবিষ্যতের কঠিনতর এবং ব্যাপকতর কর্মসম্পাদনের দায়িত্বভার গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনকেও বোঝায়।

ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়ন বলতে বোঝায় পেশাকর্মে ধীরে ধীরে যোগ্য ও দক্ষ হয়ে উঠা। যে কোন পেশায় পেশাজীবি একজন মানুষ যে যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে পেশাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন, ধীরে ধীরে তার অধ্যবসায়, শ্রম ও সাধনার দ্বারা পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন ঘটে। একেই ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন বলে। শিক্ষকতা একটি পেশা। এ পেশাজীবিদের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন আরো বেশী প্রয়োজন। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে সমগ্য বিশ্ব এগিয়ে চলছে। আবিস্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলা কৌশল। বিজ্ঞান শিক্ষনের জন্য এটি আরো বেশী প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষককে বিজ্ঞানের জ্ঞান, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও কলা-কৌশল সম্পর্কে থাকতে হবে নবতর চিন্তন ও ধারণা। এর জন্য ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন।

ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সময়োপযোগী চিন্তা-চেতনায় শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা শিক্ষকের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষার্থী যেন বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বা প্রয়োগের সুবিধা, সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারে এসবের প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষকের মনোযোগ থাকবে। বিজ্ঞান মুখস্থ বিষয় নয়, এর প্রতিটি তত্ত্ব যেন শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হলে তার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

সাধারণ অর্থে শিখন বলতে বোঝায় নতুন কোন জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতা অর্জন। জীবন ধারনের জন্য মানুষকে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে পরিবেশও বদলে যায়। মানুষকে নতুনতর পরিবেশ ও সমস্যার সম্মুখিনহতে হয়। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলার জন্য তাকে আয়ত্ত করতে হয় নিত্য নতুন জ্ঞান, কলাকৌশল ও আচরণ। এই নতুন জ্ঞান ও কলা কৌশল আয়ত্ত করা এবংসে অনুযায়ী আচরণ সম্পন্ন করাই হল শিখন। প্রতিনিয়ক শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন এব সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য শিক্ষককে নতুন কলা-কৈশল ও জ্ঞানকে আয়ত্তে এনে প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। তাই ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করা ও নিজেকে কেতাদূরস্ত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি বিজ্ঞান শিক্ষককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

শিক্ষক নিজ চেষ্ঠায় নতুন নতুন জ্ঞান, কলাকৌশল আয়ত্ব করে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া একান্তভাবে অপরিহার্য্য। এতে শিক্ষকের আচরণে নানা পরিবর্তন আসে যার মধ্যে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও সামাজিক সহযোগিতা নিজের অনুকূলে আনার জন্য শিক্ষককে অবিরত প্রচেষ্ঠা চালাতে হয়। ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

বিজ্ঞান শিখনকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।এরূপ কোন পদ্ধতিই সফল হবে না যদি শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিখনে আগ্রহী হয়ে না উঠে। এজন্য শিক্ষককে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণজন্মে এবং বিজ্ঞান শিখনে আগ্রহী হয়ে উঠে। শিক্ষককে এমন সব উপায় অবলম্বন করতেহবে যাতে শিক্ষার্থীদের নিকট বিজ্ঞান শিখন একটি আনন্দ দায়ক, বৈচিত্রময় ও চিত্তাকর্ষককাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা সবাই জানি, বিজ্ঞান শিক্ষা একটি চলমান, গতিশীল ও সদা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। সুতরাং বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াও বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনমুখী। যুগেযুগে শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীগণ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া নিয়েগবেষণা কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। স্থান, কাল ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে তাঁরা সময়োপযোগী বিভিন্ন শিখনতত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাবন করেছেন। সাম্প্রতিক কালের এরকম কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অসবোর্ণ ও উইট্রক, ভাইগোটসকীর শিখনতত্ত্ব । যুগ যুগ ধরে এমন নবতর তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা উন্নয়নে সংযোজিত হতে থাকবে। তাই সচেতন ভাবে শিক্ষককে ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হয়।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সহকারে শ্রেণিকক্ষ শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকরতে হলে একজন শিক্ষককে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃতি অনুধাবন এবং বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হয়। এজন্য একজন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রথমত তাঁর মূল বিষয় সম্পকেপরিপূর্ণ এবং স্বচ্ছ জ্ঞান রাখতে হয়। এরপর তাকে বিজ্ঞান শিক্ষার কাজে শ্রেণিকক্ষ কর্মকান্ডপরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশলসমূহ অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করতে হয়। কেবলমাত্র এরপরই একজন বিজ্ঞান শিক্ষক তার প্রকৃত পেশা এবং শ্রেণিকক্ষের কার্যবিধি পরিচালনা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন। অর্থাৎ ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নই শিক্ষকে শ্রেণি কক্ষে সর্বদা সক্রিয় রাখে।

"শিক্ষক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা হতে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা" প্রয়োগে অভ্যস্থ হতে একজন শিক্ষক তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে যেখানে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং সময়োপযোগী পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য ক্রমাগত ভাবে পেশাগত উন্নয়ন অনুশীলন প্রয়োজন।

সিপিডি প্রশিক্ষণের ধারণা ও গুরুত্ব

সিপিডি (Continuous Professional Development) প্রশিক্ষণ এক ধরনের কর্মকালীন পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। এটি ব্যাক্তিকে পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় এবং নবতর জ্ঞান, ধারণা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সহায়তা করার মাধ্যমে তার পেশাগত দায়িত্ব অধিকতর সক্ষমতার সাথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সিপিডি প্রশিক্ষণকে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায় হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে।

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষক যে কোন শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষকদের এ যোগ্যতাটি যথাযথ অর্জনে ধারাবাহিক পেশাগত মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের (৬ষ্ঠ-১২শ) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিপিডি প্রশিক্ষণ প্রদানের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষার মানোয়নের জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা নিরুপন করে নির্দিষ্ট সময়ান্তর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যুগোপযোগী চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন শিক্ষকের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনামাফিক একই চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষকদের দলভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকের চাহিদা ভিন্নভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় নিয়মিত ইনহাউজ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবে যেখানে নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটবে। মাঠ পর্যায় শিক্ষাকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও অংশীজনের মতামত থেকে এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে চক্রাকারে একই শিক্ষককে সময়ান্তে বার বার প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন ধারাবাহিক পেশাগত মান উন্নয়নের কার্যক্রম থেমে না যায়।

একুশ শতকের শিক্ষকের দক্ষতাসমূহ

একুশ শতকের শিক্ষকের দক্ষতাসমূহকে সংক্ষেপে এবং সুনির্দিষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে সাধারণভাবে বলা হয় একুশ শতকের শিক্ষকের দক্ষতা হছে- শিক্ষকের জ্ঞান, প্রয়োজনীয় দক্ষতা,দক্ষতাভিত্তিক কাজ করার সু-অভ্যাস এবং কিছু আচরণিক বৈশিষ্ট্যের এক বিস্তৃত সেট। তথাপি শিখন শেখানো কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার নিমিত্তে শিক্ষকের দক্ষতাসমূহকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে Cisco, Intel, এবং Microsoft এর আর্থিক সহায়তায় অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড,পর্তুগাল, সিংগাপুর, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫০ জন গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত Assessment and Teaching of 21st Century Skills (AT21CS) consortium একুশ শতকের শিক্ষকের দক্ষতাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে ২টি ক্যাটাগরিতে উপস্থাপন করে। এগুলো হল শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা ও ডিজিটাল দক্ষতা।

(ক) একুশ শতকের শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতাসমূহ-

১। ঝুঁকি গ্রহণকারী (The risk taker) : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্তির অপেক্ষা না করে শ্রেণিকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ শিক্ষকদের নিজের উদ্যোগে সংগ্রহ করতে সক্ষমতা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতেও শিক্ষকগন প্রস্তুত থাকবেন।

২। সহায়তাকারী (The Collaborator) : শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে অত্যন্ত কার্যকর প্রযুক্তি নির্ভর শিখন-শেখানো তথ্যভান্ডারের খোজখবর দেয়া এবং সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন।

৩। মডেল (Model): শিক্ষক হবেন একজন সু-চিন্তক,সহনশীল, বৈশ্বিক সচেতন, আত্মবিশ্বাসী, সুবিচারক, শিক্ষার্থীর প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক, সদালাপি প্রভৃতি গুণের অধিকারী। যেন তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আদর্শ শিক্ষার্থীদের উপর প্রতিফলিত হয়ে ভবিষ্যতে সু-নাগরিগ সৃষ্টি হয়।

৪। নেতা (The leader): বর্তমান শতকে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন কাজে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ গুণ। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে এই নেতৃত্ব যেন সবসময় ইতিবাচক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, কখনই যেন নেতিবাচক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষক অত্যন্ত পারদর্শী হবেন।

৫। দূরদর্শী (The visionary): শিক্ষকদের দূরদর্শী হতে হবে। তাঁরা সব সময় ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী নিয়ে উঠতি প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় দিকগুলোর সাথে শিক্ষাক্রমের সাথে করে সমন্বয় সাধন এবং সাথে সাথে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

৬। ভালো পাঠক (learner): শিক্ষকদের সদা পরিবর্তনশীলতার সাথে তাল মিলিয়ে চলমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোনো সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে অর্থাৎ একজন ভালো শিক্ষক আজীবন ছাত্র।

৭। যোগাযোগকারী (Communicator) : ২১ শতকের শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি অত্যন্ত সাবলীলভাবে ব্যবহারের যোগ্যতা থাকতে হবে। পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁদের অবশ্যই মধ্যপন্থী হিসাবে কাজ করার মনোভাব নিয়ে সহজে অন্যকে উদ্দীপ্ত করা, যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করা এবং পরিচালনা করার দক্ষতা থাকতে হবে।

৮। অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন (The adaptor) : স্থান-কাল-পাত্রের উর্দ্ধে থেকে সময়োপযোগী ও নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করা, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে ইতিবাচক মানসিক প্রস্তুতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংগতিবিধান করার দক্ষতা থাকতে হবে।

(খ) একুশ শতকের শিক্ষকের ডিজিটাল দক্ষতাসমূহ-

১। বিনামূল্যে প্রাপ্ত সফটওয়ার বা অনলাইনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে ডিজিটাল অডিও তৈরি ও এডিট করার দক্ষতা।

২। বিনামূল্যে প্রাপ্ত সফটওয়ার বা অনলাইনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে ডিজিটাল ছবি তৈরি ও এডিট করার দক্ষতা।

৩। বিনামূল্যে প্রাপ্ত সফটওয়ার বা অনলাইনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে ভিডিও সংগ্রহ এবং প্রদর্শন করার দক্ষতা।

৪। বিভিন্ন ধরনের প্রেজেন্টেশন তৈরি এবং শেয়ার করার দক্ষতাঃ প্রেজেন্টেশন তৈরি এবং স্লাইড প্রদর্শন করা একজন শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক একটি কাজ।

৫। অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায় এমন ছবির ভান্ডার খুঁজে বের করা তা প্রয়োজনে প্রিন্ট করার দক্ষতা।

৬। সটিক Keyword এর সাহায্যে স্বল্প সময়ে কার্যকরী Search query ব্যবহার করার দক্ষতা।

৭। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার দক্ষতা।

৮। শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী প্রয়োজনীয় এবং নির্ভরশীল ওয়েবসাইট ভিত্তিক কনটেন্ট খুজে বের করা এবং তা মূল্যায়ন করা।

৯। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক ভিডিও-অডিও সম্বলিত ওয়েবসাইট যেমনঃ YouTube ব্যবহারের উপায়সমূহ জানা থাকতে হবে।

১০। সামাজিক ওয়েবসাইট ব্যবহারের মাধ্যমে সহকর্মীদের সাথে আন্তঃ যোগাযোগ স্থাপন করে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন,পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার দক্ষতা।

১১। ফাইল শেয়ারিং টুলস ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট এবং ফাইল আদান-প্রদান করার দক্ষতা।

১২। বিভিন্ন ধরনের ডবন browser ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় Website এর Bookmarking list তৈরি, বিভিন্ন ফরমেটের ফাইল ডাউনলোড করে তা শিক্ষার্থীদের সরবারাহ করা।

১৩। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী ওয়েব কনটেন্ট যাচাই-বাছাই করার দক্ষতা।

১৪। বিভিন্ন ধরনের Task management tools ব্যবহার করে নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করার দক্ষতা।

১৫। যে-কোনো সফটওয়ার ব্যবহারে কপিরাইট আইন সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকা এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৬। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও তাদের পক্ষে সহজে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের অনলাইন শিক্ষামূলক উপকরনের উৎস নির্দিষ্ট করা।

১৭। আকর্ষণীয় ধারনা সম্বলিত এবং দৃষ্টিনন্দন Sticky notes ব্যবহারের দক্ষতা।

১৮। অনলাইনে কাজ করার সময় বিশেষ নিরাপত্তা গ্রহণ করার দক্ষতা।

১৯। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন web page এবং সেই page এর কোনো উদ্ধৃতাংশকে টীকা হিসাবে শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করার দক্ষতা।

২০। ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করা এবং প্রদর্শন করা, মাঝে মাঝে বিভিন্ন তথ্য অনলাইন থেকে সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়।

২১। Polling software ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, শিক্ষোপকরণ গুণগত মান, শেখন-শেখানো পদ্ধতির মান প্রভৃতি দিকের রিয়েলটাইম সার্ভে করার দক্ষতা।

২২। শিক্ষার্থীদেরবুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এবং মেধার বিকাশে সহায়ক বিভিন্ন সিমুলেশন (পাঠসহায়ক ভিডিও গেম) ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করার দক্ষতা।

২৩। বিভিন্ন Collaborative tools ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক লিখা উপস্থাপন ও সম্পাদন করার দক্ষতা।

২৪। শিক্ষার্থীরা তাদের অর্পিত কাজ সম্পন্ন করতে ইন্টারনেট থেকে অন্য কারো সম্পাদিত কাজ সরাসরি কপি করছে কি-না তা নিশ্চিত হতে Plagiarism tools ব্যবহার করার দক্ষতা।

২৫। অনলাইনে বিভিন্ন tools ব্যবহার করে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে Electronic Profile তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের দক্ষতা।

২৬। বিভিন্ন ব্লগ এবং উইকিপিডিয়া প্রনয়ণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন পরিসর তৈরি রার দক্ষতা।

২৭। বিনামূল্যে প্রাপ্ত বা অনলাইন সফটওয়ার ব্যবহার করে Screen capture ভিডিও এবং ভিডিও টিউটোরিয়েল তৈরি করা।

২৮। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান যাচাই করার উদ্দেশ্যে ডিজিটাল কুইজ তৈরি করা এবং তা মূল্যায়নে ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করার দক্ষতা।

২৯। অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের টুলস ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় নোট, কনটেন্ট সংগ্রহ করা এবং তা শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করার দক্ষতা।

৩০। বিভিন্ন Screen casting tools যেমনঃ aTubecatcher (Open Source) প্রভৃতির সাহায্যে Screen shot এর সাহায্যে তৈরি করা টিউটোরিয়েল শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা।

৩১। শিক্ষার্থীদের Group Assignment কাজে আন্তঃ যোগাযোগের জন্য Group messaging tools ব্যবহার করার দক্ষতা।

৩২। বিভিন্ন Digital tools ব্যবহার করে গবেষণা সহায়ক তথ্য, গবেষণা পত্র সংগ্রহ করার দক্ষতা।

৩৩। অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে শিক্ষকদের বাৎসরিক শিক্ষা-ক্যালেন্ডার তৈরির দক্ষতা। এ দক্ষতাগুলো অর্জন করতে হলে ক্রমাগত অনুশীলন করে যেতে হবে, যা ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের কয়েকটি প্রক্রিয়া-

- প্রতিফলন অনুশীলন
- কর্মসহায়ক গবেষণা
- সিপিডি প্রশিক্ষণ
- বিশেষ প্রশিক্ষণ
- ইনহাউজ ট্রেনিং
- জীববিজ্ঞান অনুশীলন দক্ষতা
- শিখনে ভাল পাঠ ও শিখন অভ্যাস গঠন
- নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন কৌশল
- জীববিজ্ঞান শিখনের নবতর ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনাগাদ রাখা
- স্ব-শিখন
- বিজ্ঞান ও শিক্ষাভাবনা নিয়ে লেখা
- বিজ্ঞান বিষয়ক ব্লগ তৈরি
- সহপাঠ্যক্রমিক কাজ
- শিক্ষক ফোরামের সদস্য
- পাঠ চক্রের সদস্য
- সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ
- পরিবেশ উন্নয়ন মূলক কাজ

জীববিজ্ঞান শিখনের নবতর ধারণা সম্পর্কে নিজেকে হালনগাদ রাখা

জীববিজ্ঞান শিক্ষকে জীববিজ্ঞানের নবতর শিক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা অর্জন করে নিজেকে হালনগাদ রাখতে হবে। আধুনিককালের শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা সবই গ্রহণযোগ্য হয়। পৃথিবীর কোন প্রান্তে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের কোন বিশেষ দিক অবলম্বনে গবেষণা হচ্ছে কখন সেই গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশিত হচ্ছে এ সবই শিক্ষককে জানতে হবে এবং যুগোপযোগী হতে হবে।

নবতর শিক্ষণ ধারণা

শ্রেণি পাঠদানে শিক্ষককে সহায়তার জন্য সর্বাধুনিক শিক্ষণ-শিখন (TeachingLearning) পদ্ধতি, তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ হচ্ছে নবতর শিক্ষন ধারণা। যেমন অসবেল, অসবোর্ণ এবং উইট্রক ও ভাইগোটস্কীর শিক্ষণ ধারণাসমূহ সর্বাধুনিক। আবার সতীর্থ ও সহযোগিতামূলক শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন-পোস্ট বক্স, ভবিতব্য-পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ, মাথা খাটানো, দৃশ্যকল্প, ধারণা মানচিত্র, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি নবতর শিক্ষণ ধারণার উদাহরণ।

যুগোপযোগী বা কেতাদুরস্ত রাখার জন্য নবতর শিক্ষণ ধারণা অর্জনের উপায়সমূহ

প্রশিক্ষণ, শ্রেণি পাঠদান পর্যবেক্ষণ, পাঠদানের ভিডিও দেখা, স্কাই চ্যানেল, জার্নাল, বুলেটিন, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা, আর্টিকেল, ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভি, বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান যাদুঘর, লাইব্রেরী ওয়ার্ক, ইন্টারনেট, বিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদি।

যুগোপযোগী বা কেতাদুরস্ত রাখার করণীয় নির্ধারণ

ঘন ঘন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি ও ধারণার সাথে পরিচয় হয়। বিভিন্ন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের শ্রেণী পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক মতামতবিনিময় করা সম্ভব হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হয় এবং নিজেকেও শ্রেণী পাঠদান করতে হয়। ফলে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

কেতাদুরস্ত রাখার জন্য মিডিয়া

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। জীববিজ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষককে অতি-সাম্প্রতিক বিজ্ঞান সম্পৃক্ত তথ্যাবলী সর্ম্পকে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। এজন্য তিনি পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, রেডিও টেলিভিশনের খবরা-খবর নিয়মিত পড়বেন ও শুনবেন, টেলিভিশনে বা কম্পিউটারে বিভিন্ন স্যাটেলাই এবং ভিডিও চ্যানেলের শিক্ষামূলক পাঠ দেখার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত খবরা-খবর রাখবেন। বৈজ্ঞানিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলী দেখবেন। নিয়মিত ইন্টারনেট ব্রাউস করবেন।

দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণঃ দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিজ্ঞান শিক্ষকের পাঠদান পর্যবেক্ষণের সময় যে দিকগুলো বিবেচনায় নেওয়া যায়-

- শিক্ষকের প্রশ্ন করার কৌশল কেমন?
- শিক্ষকের প্রশ্ন করার কৌশল কেমন?
- তিনি কী কী নতুন পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেন?
- আসন বিন্যাস কেমন?
- কিভাবে দল গঠন, দলে কাজ প্রদান এবং দলীয় কাজ আদায় করেন?
- কী কী উদাহরণ ব্যবহার করেন?
- পাঠ ব্যাখ্যার কৌশল কেমন?
- মূল্যায়নের ধরণ কেমন?
- সারাংশ বা উত্তর কিভাবে আদায় করেন ?
- শিক্ষার্থীদের কিভাবে প্রেষণা দেন বা উজ্জীবিত করেন ?
- শিক্ষার্থীদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক তৈরি করেন?

হালনাগাদ হওয়ার জন্য অন্যান্য করনীয় হচ্ছে

- নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী, বুলেটিন, দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞান কলাম, ম্যাগাজিন পড়ার অভ্যাস করা।
- নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও আবিষ্কার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা।
- বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান সমিতি, বিজ্ঞান যাদুঘরের সদস্য হবেন এবং গবেষণা কাজ করতে চেষ্টা করা।
- লাইব্রেরীতে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা।
- নিয়মিত ডায়রি ব্যবহার করবেন, ভাল মন্দ নোট করবেন, পর্যালোচনা করা এবং শ্রেণীতে প্রয়োগ করা।
- নিজেস্ব দুর্বল দিকগুলো আন্তরিকভাবে শনাক্ত করার চেষ্টা করা এবং সেগুলো সংশোধনে উদ্যোগী হওয়া।

হালনাগাদ রাখার ফলাফল

শিক্ষকতা একটি চির উন্নয়নশীল পেশা। সুতরাং নবতর শিক্ষণ ধারণা শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। শ্রেণি পাঠদানের মান উন্নয়ন ঘটাবে। নিজের মধ্যে আত্নবিশ্বাস তৈরি হবে। উৎসাহ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। তারা শিক্ষকের নিকট থেকে বেশি তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করতে পারবে। ভাল শিখন অভ্যাস তৈরি হবে। নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়ন ঘটবে। বিজ্ঞান চর্চা বা বিজ্ঞান শিক্ষণ-শেখানোর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জিত হবে ফলে জীববিজ্ঞানের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে।

প্রতিফলন

প্রতিফলন শব্দের অর্থ হল ফিরে আসা, গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল ইত্যাদি। আমরা যেমন আয়নায় নিজে নিজের প্রতিবিম্বের প্রতিফলন দেখে নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে নিজকে প্রস্তুত করি ঠিক তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিফলন হল শিক্ষাদান কার্যক্রমের (শিক্ষণ-শিখন) পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন। অর্থাৎ শিক্ষাদান কার্যক্রমের যাবতীয় ভুল-ত্রুটির পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটিয়ে তা সংশোধনপূর্ব শিক্ষাদান কার্যক্রমের মান আরও উন্নত করা। এ প্রসঙ্গে- Boud, Keogh and Walder, ১৯৮৫ প্রতিফলন সম্পর্কে বলেন- "প্রতিফলন হচ্ছে মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা যার দ্বারা অভিজ্ঞতার পুন:আয়ত্বকরণ, সে সম্পর্কে চিন্তা, মনে মনে বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়"।

The process of reflection for teachers begins when they experience a difficulty troublesome event or experience that cannot be immediately resolved.

প্রতিফলন প্রক্রিয়া তখনই শুরু হয় যখন শিক্ষক কঠিন, কষ্টকর ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান হয় না।

Reflection is also a process that involves more than logical and rational problem solving process.

প্রতিফলন প্রক্রিয়া অর্ন্তজ্ঞান, আবেগ এবং অনুরাগ সম্পৃক্ত (অর্থাৎ আমরা যখন শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পুনর্মূল্যায়ন করি তখন বিভিন্ন উৎস থেকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা আমাদের মস্তিষ্ক, হৃদয়, যুক্তি ক্ষমতা এবং আবেগের গভীরতা দিয়ে বোঝা ও প্রক্রিয়াকরণ হল প্রতিফলন)।

প্রতিফলন অনুশীলন (Reflective Practice)

প্রতিফলন অনুশীলন শিক্ষণ অভিজ্ঞতার পুনর্বিবেচনা ও মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা শিক্ষাদান কাজের ক্রমাগত উন্নয়ন করা যায়। প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার নিজের পাঠদান কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাই একজন নবীন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রতিফলন অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে প্রতিফলন অনুশীলন একধরনের কর্মসহায়ক গবেষণা। প্রতিফলন অনুশীলন সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

Donald Schon (১৯৮৭)A creative skilled professional is gradually trained up through reflective practice about his own ability and modeling of successful practitioners.

একজন সৃজনশীল দক্ষ পেশাদার তার নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষিত এবং সফল পেশাপজীবির মডেল হয়ে উঠেন।

Kolb (১৯৮৪) Only reflective experience makes learners learning easy and simple. শুধুমাত্র প্রতিফলন অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীদের শিখন সরল ও সহজবোধ্য করে।

Boud et al **(১৯৯৭)** Raw experience becomes learning through reflection. প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে দুর্বল অভিজ্ঞতা শিখনে রূপান্তরিত হয়।

Brown and McCartney **(১৯৯৯)** Reflective practice starts at the very beginning of a learner's learning and goes on up to a professional whole life.

শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার শুরুতেই প্রতিফলন অনুশীলন শুরু হয়ে তার পুরো পেশাজীবন জুড়ে তা চলতে থাকে।

প্রতিফলন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

১। লক্ষ্য করা (Noticing): প্রতিফলন প্রক্রিয়া শুরু হয় শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, অবলোকন, আলোচনা ও পড়ার মাধ্যমে। যেমন- সতীর্থের শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, নিজের পাঠদান অনুশীলনের সফলতা বা বিফলতার বিভিন্ন দিক শনাক্ত করা, শিক্ষক, সতীর্থ বা অন্যের সংগে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জার্নাল বা ডায়েরি পড়া ইত্যাদি।

২। বর্ণনা (Describing): এই ধাপে লক্ষ্য করা বিষয়গুলোর (শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম) বিস্তারিত মনে মনে স্মরণ করে ডায়েরি বা জার্নালে বর্ণনার মাধ্যমে লিখে রাখা হয় যা পরবর্তী ধাপে বিশ্লেষণ করা হয়।

৩। সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ (Critical Anlysis): এই ধাপে বর্ণনার বিষয়গুলোর উপর সমালোচনামূলক প্রশ্ন রাখা হয়। যেমন- বিষয়টি পাঠদানে উদাহরণের ব্যবহার কী সঠিক ছিল? না হলে কী ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করা যেত।

- উচ্চ স্তরের প্রশ্ন করা হয়েছিল কী?
- উপকরণের ব্যবহার যথার্থ ছিল কী?
- পাঠের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল কী?
- পাঠদান পদ্ধতি সঠিক ছিল কী?
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কেমন?
- কিভাবে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজে অনুপ্রেরণা জোগান?
- কিভাবে পাঠের সারাংশ আদায় করেন?

উপরোক্ত ধরনের প্রশ্নসমূহ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বোঝার মাধ্যমে পরবর্তীতে করণীয় বা সমাধান সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

৪। ক্রিয়া (Action): প্রতিফলন প্রক্রিয়ার এ ধাপে ঘটনার বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত ফলের উন্নয়ন ঘটিয়ে পরবর্তী পাঠদান কার্যক্রমে শিক্ষক ক্রিয়া বা প্রয়োগ করবেন এবং পুনরায় ধাপ- ১ হতে ধাপ- ৪ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ঘটিয়ে যাবেন।

প্রতিফলন একটি চলমান প্রক্রিয়া যার সাহায্যে অব্যাহতভাবে পেশাগত উন্নয়ন করা যায়। নিচে প্রতিফলন প্রক্রিয়ার ধাপ চক্রটি দেখান হল-

চিত্র : প্রতিফলন প্রক্রিয়ার ধাপ চক্র

প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

- শিক্ষণে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করে।
- নিজেকে চিনতে সাহায্য করে।
- ভুল-ত্রুটি শনাক্তের দ্বারা সংশোধনে সহায়তা করে।
- ঘটনাবলী মূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলায় নতুন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।
- শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার প্রতি সচেতনতা ও কৌতুহল বৃদ্ধি পায়।
- উপলব্ধির মাধ্যমে শিখন হয়।
- আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন সম্ভব হয়।
- অর্থপূর্ণ (গবধহরহমভঁষ) শিক্ষণে তাগিদ সৃষ্টি করে।
- প্রতিফলন দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- প্রতিফলন অনুশীলন কর্মসহায়ক গবেষণা হওয়ার কারণে পেশাগত উন্নয়ন ঘটে।

● সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

জন হেরন ফলাবর্তন মডেল (John Heron Feedback Model)

প্রতিফলন অনুশীলনের একটি অন্যতম কৌশল "জন হেরন ফলাবর্তন মডেল"। জন হেরন সারে বিশ্ববিদ্যালয় (Surrey University) এর Human Potential Research Project এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন এবং ২০০০ সাল হতে নিউজিল্যান্ড এর South Pacific Centre for Human Inquiry এর পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পাঠদান অনুশীলনের সময় স্কুলের বিষয় শিক্ষক (সহযোগী শিক্ষক), অথবা কলেজের গাইড শিক্ষকের সামনে পাঠদান করে তার পাঠদানের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া সতীর্থ শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ থেকেও পাঠদানের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পাঠদানের পূর্বে, পাঠদানের সময় এবং পাঠদানের পর পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে ফলাবর্তন পেয়ে থাকেন।

পাঠদানের পূর্বে ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসে ফলাবর্তনের শর্ত (পাঠদানের দক্ষতা) ঠিক করেন।

২. নির্বাচিত শর্তগুলো অবশ্যই পাঠদানের বিশেষ দক্ষতা বা যোগ্যতা পর্যবেক্ষণে মূল্যায়ন করা হবে।

পাঠদানের সময় ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অংশ বিশেষ অথবা পুরো পাঠ শেষ করার মধ্যে পর্যবেক্ষক তার পাঠের ভুল-ত্রুটিগুলো সনাক্ত করে নোট বুকে নোট রাখেন। এমনকি পাঠের দুর্বল দিক এবং সবল দিক সম্পর্কেও তিনি নোট রাখেন।

পাঠদানের পর ফলাবর্তন

১. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসেন এবং নিচের ক্রম অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারে পর্যবেক্ষক তার ফলাবর্তন পেশ করেন। তিনি পাঠে কোথায় কোথায় ভুল ছিল তা প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে অতি গঠনমূলকভাবে তুলে ধরেন।

২. একই সময়ে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক তার নিজের প্রস্তুতকৃত আত্ম- মূল্যায়ন দ্বারা তার পাঠের সবল ও দুর্বল দিক পর্যবেক্ষকের কাছে তুলে ধরেন।

৩. পরিদর্শক-পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থীকে ইতিবাচক ফলাবর্তন দেনএবং প্রশিক্ষণার্থীর পাঠের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে হবেতা বলে দেন।

৪. প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক সে উপদেশ পরবর্তী পর্যায়ে পালনে সম্মত হন।

৯.৩ জীববিজ্ঞান শিখনে প্রতিফলন প্রক্রিয়া/কর্ম সহায়ক গবেষণা

শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যালয়ে কর্ম-সহায়ক গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার কার্যকর তথা টেকসই সমাধান বের করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মূলত: প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকগণ কর্ম-সহায়ক গবেষণা পরিচালনের প্রধান নিয়ামক। তবে প্রয়োজনে বহি:বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া যাবে। কর্ম-সহায়ক গবেষণার ধাপসমূহ সাধারণ গবেষণার অনুরূপ তবে সমস্যার সমাধানে তা প্রয়োগ করে বিদ্যালয়ের উদ্ভুত সমস্যার সমাধান প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। কর্ম সহায়ক গবেষণা সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত ধারণা এবং সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। জীবজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে সমস্যা সমাধানে ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে কর্ম সহায়ক গবেষণা পরিচালনা করবেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা স্থানীয় ভাবে সমাধানের জন্য কর্ম সহায়ক গবেষণা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে উদ্ভুত কোন সমস্যা যার সমাধান ব্যতিরেকে তা শিক্ষা কার্যের একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে কর্ম সহায়ক গবেষণা কাজ হাতে নেওয়া দরকার। কর্ম-সহায়ক গবেষণা শুধুমাত্র সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হয় না, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফললাভ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে অব্যাহত উৎকর্ষতার লক্ষ্যে কর্ম-সহায়ক গবেষণা পরিচালন প্রয়োজন। কর্ম-সহায়ক গবেষণার সময়সীমা খুবই সীমিত। কর্ম-সহায়ক গবেষণার মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান আশা করা যায়। এ প্রকারের গবেষণা বিদ্যালয় পরিস্থিতির উন্নয়ন, শিক্ষকগণের গবেষণা ক্ষমতার বিকাশ, শিক্ষার্থীদের কৃতকার্যতার মান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আমেরিকার MIT-এর অধ্যাপক Kurt Lewin 1946 সালে তাঁর æAction Research and Minority Problems," নামক নিবন্ধে কর্মসহায়ক গবেষণার বিষয়টি অবতারণা করেন। তিনি কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে বলেন:

æAction research is a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action and research leading to social action that uses a spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, action, and fact-finding about the result of the action."

Green Wood and Levin (১৯৯৮) ও Kemmis (১৯৯৪) বলেন যে সমাজে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিজ কর্মের উন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে পারেন। যেমন নৃ-বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

The North Central Regional Educational Laboratory কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞায় বলা হয়: Action research is an inquiry or research in the context of focused efforts to improve the quality of anorganization and its performance. It typically is designed and conducted by practitioners who analyze the data to improve their own practice. Action research can be done by individuals or by teams of colleagues. The team approach is called collaborative inquiry (NCRL, 2008, para. 1).

উপরোক্ত সংগাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পেশাজীবি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্মপরিবেশ ও আত্মউন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করেন।

কর্ম-সহায়ক গবেষণা -বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান উন্নয়ন, গবেষণাগার ব্যবহার, শ্রেণির বাহিরে শিখন কার্যত্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় কর্ম-সহায়ক গবেষণা পরিচালনা করেন। কর্ম-সহায়ক গবেষণা অনুশীলনের জন্য শিক্ষক যে কাজগুলো করবেন-

১। সমস্যা ক্ষেত্র শনাক্তকরণ

২। তথ্যানুসন্ধান এবং সমস্যা সুচিহ্নিতকরণ

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ

৪। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কী কী তথ্য আহরণ করতে হবে তা নির্ধারণ এবং গবেষণা নকশা প্রণয়ন

৫। নমুনা নির্ধারণ

৬। তথ্য সংগ্রহণ

৭। তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণ

৮। ফলাফল অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষকে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানে না পাওয়া পর্যন্ত আনেকগুলো চক্র কাজ সম্পাদন করতে হয়। Stephen Kemmis এর মডেলে প্রতিটি চক্রে চরিটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। ধাপগুলো হলো-

- পরিকল্পনা (Planning)
- কর্ম (Act)
- পর্যবেক্ষণ (Observation)
- প্রতিফলন (Reflection)

এই মডেলের বৈশিষ্ট্য হলো-

- এটি চক্রাকার যার প্রতিটি চক্রে রয়েছে পরিকল্পনা, কর্ম, পর্যবেক্ষণ, প্রতিফলন।
- এটি সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহিত আত্ম প্রতিফলনশীল চক্রাকার প্রক্রিয়া।
- এটি কর্মসহায়ক গবেষণা শুরু করার একটি চমৎকার ভিত্তি।

নিচের চিত্রে মডেলটি প্রদর্শন করা হলো

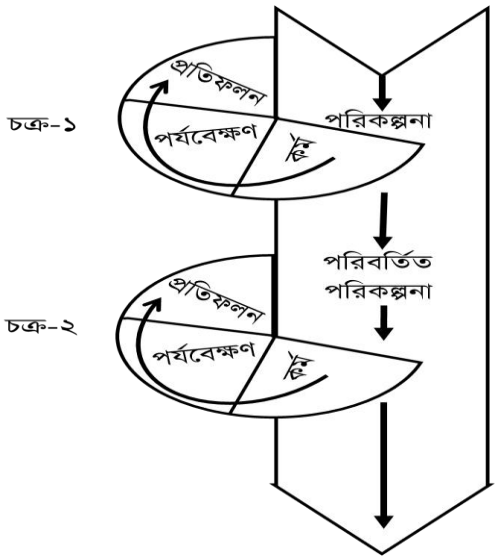

চিত্র : স্টিফেন কেমিস এর কর্মসহায়ক গবেষণা স্পাইরাল মডেল

উপরের চিত্রে প্রতিটি চক্রে চরিটি ধাপ রয়েছে পরিকল্পনা, কর্ম, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিফলন। প্রতিটি চক্রের এই চারধাপ বিশিষ্ট প্রত্রিয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান হয়। এ থেকে বোঝা যায় কর্মসহায়ক গবেষণা শিখার জন্য যেমন অনুশীলন এর প্রয়োজন তেমনি ভাবে কর্মসহায়ক গবেষণার ফলাফল পাওয়ার জন্য অনেকগুলো অনুশীলন চক্র শেষ করতে হয়।

কর্ম সহায়ক গবেষণা ধাপসমূহ

১। সমস্যা ক্ষেত্র শনাক্তকরণ

২। তথ্যানুসন্ধান এবং সমসাা সুচিহ্নিতকরণ

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য নির্ধারণ

৪। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কী কী তথ্য আহরণ করতে হবে তা নির্ধারণ এবং গবেষণা নকশা প্রণয়ন

৫। নমুনা নির্ধারণ

৬। তথ্য সংগ্রহণ

৭। তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল নির্ধারণ

৮। ফলাফল অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কর্মসহায়ক গবেষণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১. কোন প্রতিষ্ঠানে বা শ্রেণিতে কোন অপ্রত্যাশিত কী ঘটনা ঘটেছে যা শিখন পরিস্থিতিকে বাধাগ্রস্থ করছে, তা কেন ঘটছে এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায় তা জানার জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালিত হয়।

২. প্র্যাকটিশনার (শিক্ষক-শিক্ষা প্রশাসক-অন্যান্য) নিজে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করেন।

৩. কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভর ও প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক।

৪. কর্মসহায়ক গবেষণা অংশগ্রহণ কেন্দ্রিক। গবেষণা পরিচালনা, বাস্তাবয়ন বা প্রয়োগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এমনকি অভিভাবক সকলেই সম্পৃক্ত হতে পারেন।

৬. কর্মসহায়ক গবেষণা নমনীয় প্রকৃতির। প্রয়োজনে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যায়।

৭. কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনই এর লক্ষ্য।

৮. কর্মসহায়ক গবেষণা বহু পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিচালিত হয়।

৯. কর্মসহায়ক গবেষণা বৃত্তীয় (Cyclic), সরল প্রকৃতির নয়। একটি চক্র শেষে আর একটি চক্র পরিচালিত হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নে বিবৃত হলো:

১. পেশাগত অনুশীলন উন্নয়ন।

২. কর্মস্থলে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানকল্পে এবং পেশাগত চর্চা বা বিদ্যমান কর্ম পরিস্থিতির উন্নয়ন।

৩. সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বা পেশাগত চর্চার বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন এনে এর উন্নয়ন ঘটানো কর্মসহায়ক গবেষণার কাজ। তাই শ্রেণি শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রশাসনসহ যে কোন পেশাদার বা প্রাকটিশনার এর উন্নত অনুশীলনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশাসক-এর মনে আত্মসমালোচনার মনোভাব গড়ে উঠে বিধায় তাঁরা নিজ পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন।

৫. কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত শিক্ষক, তার নিজের পেশাগত ভূমিকা, শিক্ষার্থীর শিখন মান এবং শ্রেণিকক্ষ কার্যাবলীর মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

৬. এ ধরনের গবেষণা শিক্ষক তাঁর কর্মস্থলে সম্পন্ন করতে পারেন বিধায় তিনি নিজস্ব সময় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

৭. কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষার্থীদেরকে কার্যকর এবং মানসম্মত শিখনে সহযোগিতা করে।

৮. গবেষক নিজেই নিজের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। বহিরাগত কোন গবেষক দ্বারা পরিকল্পিত এবং আরোপিত কর্ম সম্পাদন করা হয় না। বহিরাগত গবেষক সহায়কের ভূমিকা পালন করেন, কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। ফলে গবেষকের পক্ষে ঘটনা বুঝা এবং এর উন্নয়ন বা সমাধান সহজ হয়।

এ ছাড়া, আত্মশুদ্ধি, আত্ম উন্নয়ন, আত্ম শ্রদ্ধা/ ভক্তি, আত্ম প্রতিফলন, আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি, পেশাগত জ্ঞানেরবৃদ্ধি ইত্যাদির জন্যও কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

জীবজ্ঞান শিক্ষক যে সকল বিষয়ে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- গতানুগতিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির পরিবর্তন
- গতানুগতিক মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তন
- শ্রেণি কার্যে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- শ্রেণিতে শিক্ষণ-শিখন কার্য চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রশ্নকরণ প্রক্রিয়া
- শিক্ষার্থীর সময়মত এবং নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন (সিএ)
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার মান উন্নয়ন
- একীভূত শিক্ষণ বাস্তবায়ন

- শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগিতা
- শ্রেণিতে বেপরোয়া স্বভাবের শিক্ষার্থীদের অনভিপ্রেত আচরণ
- শ্রেণিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- শ্রেণি মূল্যায়নের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে অপারগতা দূরীকরণ

কর্ম সহায়ক গবেষণার কতিপয় মডেল

কর্ম সহায়ক গবেষণা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মডেল রয়েছে। নিম্নে কতিপয় মডেল উল্লেখ করা হলো।

কান এবং কিগলি-এর মডেল (১৯৯৭)

পরিকল্পনা পর্যায়
ধাপ ১: সমস্যা বুঝতে সচেষ্ট হওয়া
ধাপ ২: সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান
ধাপ ৩: সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিকল্পনা করা বা চিহ্নিত করা
পরিকল্প কার্যকরকরণ পর্যায়
ধাপ ৪: পরিকল্পিত পদক্ষেপ বাস্তবে প্রয়োগ এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ
প্রতিফলন স্তর
ধাপ ৫: বাস্তবায়ন পর্যায়ে লব্ধ ফলাফল মূল্যায়ন
ধাপ ৬: গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিফলন

এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ এর মডেল (১৯৯৩)

আরম্ভকরণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ
ধাপ ১: গবেষণা জার্নাল লিখন
ধাপ ২: গবেষণার শুরু করার ইস্যু বা বিষয় নিরূপন করা
ধাপ ৩: ইস্যু বা বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন
ধাপ ৪: উপাত্ত সংগ্রহকরণ
ধাপ ৫: উপাত্ত বিশ্লেষণ
কর্মকৌশলের বিকাশ
ধাপ ৬: সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মকৌশলের পরিকল্পনা করা উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবে প্রয়োগ করা।
বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব গঠন
ধাপ ৭: বিশ্লেষণলব্ধ ফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠা অপরের সাথে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বিনিময় করা।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষার্থীর শিখন অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা কী হওয়া উচিত -ব্যাখ্যা করুন?

২. নিজস্ব বিজ্ঞান চিন্তার উন্নয়নে শিক্ষকের করণীয় উল্লেখ করুন।

৩. শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করতে কেতাদূরস্ত শিক্ষক কেন প্রয়োজন?

৪. ইনহাউস ট্রেনিং কীভাবে শিক্ষকের চিন্তার উন্নয়নে সহায়তা করে।

৫. প্রতিফলন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৬. কর্মসহায়ক গবেষণার চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্ব-শিখন শিক্ষাকে আধুনিক যুগোপযোগী চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ করে- বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

২. একজন শিক্ষক কীভাবে প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রশিক্ষিত এবং সফল শিক্ষকের মডেল হয়ে উঠেন?

৩. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী স্ব-শিখনের ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে- এ বিষয় ইনহাউজ ট্রেনিং এর জন্য ধারণাপত্র লিখুন।

৪. একুশ শতকের শিক্ষকের বিশেষ দক্ষতা সমূহ উল্লেখপূর্বক তা অর্জনের উপায়গুলো লিখুন।

৫. একুশ শতকের শিক্ষকের পাঁচটি ডিজিটাল দক্ষতা উল্লেখ পূর্বক শ্রেণিকার্যক্রমে প্রয়োগ দেখান।

References:

১. বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগনের প্রি-সার্ভিস প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ২০১২. টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাঅধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২. জীববিজ্ঞান শিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা, প্রকাশকাল:জুন ২০০০ খ্রি:

৩. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি এড) বিজ্ঞান শিক্ষণ (মডিউল ১ ও ৩), টিচিং সেকেন্ডারী এডুকেশন পজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিকাদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০০৮ খ্রি:

৪. জীববিজ্ঞান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প, ঢাকা প্রকাশকাল: জুন ১৯৯০ খ্রি:

৫. Becoming a secondary School Science Teacher, Leslie W. Trowbridge & Rodger W. Bybee, Merrill Publising Company, A bell & Howell Compay, Columbus, Ohio 43216, Published 1986.

৬. হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৬ খ্রি:

৭. সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

(প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল),বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট(বিইডিইউ), সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০১৪ খ্রি:

৮. http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html

ইউনিট ১০ : রক্ত ও রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্ত (Blood) হল উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহের এক প্রকার কোষবহুল, জৈব ও অজৈব পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সামান্য লবণাক্ত, আঠালো, ক্ষারধর্মী ও লালবর্ণের ঘন তরল পদার্থ যা হৃৎপিন্ড, ধমনী, শিরা ও কৈশিক জালিকার মধ্য দিয়ে নিয়মিত প্রবাহিত হয়। রক্ত প্রধানত দেহে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পরিবাহিত করে। রক্ত হল আমাদেরে দেহের জ্বালানি স্বরূপ। মানবদেহে শতকরা ৮ ভাগ রক্ত থাকে (গড়ে মানবদেহে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে)। রক্তের PH সামান্য ক্ষারীয় অর্থাৎ ৭.২ - ৭.৪। মানুষের রক্তের তাপমাত্রা ৩৬ - ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (গড়ে ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)।

বৃটিশ বিজ্ঞানী William Harvey ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রাণিদেহে রক্ত সংবহন তন্ত্রের কথা বলেন, যা আমাদের দেহের ভিতরের খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন করে, দেহের তাপমাত্রা ও বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং রোগজীবাণু প্রতিরোধ কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থাকে। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

১০.১: রক্ত, রক্তের উপাদান ও কাজ , রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ও রক্ত নির্বাচন
১০.২: ব্যবহারিক কাজ: রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড
১০.৩: রক্ত সঞ্চালন(হৃদপিণ্ডের গঠন ও কাজ, শিরা ও ধমনীর কাজ, রক্ত চাপের ভূমিকা)
১০.৪: মানবদেহে রক্ত সংবহন: সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারী সংবহন, হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগ ও করণীয়
১০.৫ ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা (রক্ত সঞ্চালন ও গর্ভধারণজনিত জটিলতা)

১০.১: রক্ত, রক্তের উপাদান ও কাজ, রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ও রক্ত নির্বাচন

রক্ত : রক্ত একটি তরল যোজক কলা। এর মাধ্যমে মানবদেহের যাবতীয় জৈবিক প্রক্রিয়ার পরিচালনা অনেকাংশে নির্ভরশীল। রক্ত রসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের রক্ত কণিকা বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট্য ও কাজ রয়েছে। পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গে বাহিত হয়। কলা থেকে আবার বর্জ্য পদার্থ বের করে রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। এছাড়া হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে গড়ে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে।

রক্তের উপাদান: রক্ত প্রধানত দুই প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা–

- রক্তরস (Plasma)
- রক্ত কণিকা (Blood Corpuscles)

প্রকৃতপক্ষে রক্ত কণিকাগুলো রক্ত রসে ভাসমান থাকে এবং লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির কারণেই রক্ত লাল দেখায়।

রক্ত রস : রক্তের মধ্যে ক্ষারধর্মী হলুদ এবং তঞ্চনে সক্ষম তরল অংশকে "রক্তরস" বলে। রক্তের প্রায় ৫৫% রক্ত রস। প্লাজমাতে ৯০-৯২% পানি এবং বাকী ৮-১০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব পদার্থ বিদ্যমান। এছাড়া কিছু গ্যাসীয় পদার্থ রক্ত রসের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যেমন– (O_2, CO_2), সরল খাদ্য উপাদান, বর্জ্য পদার্থ, হরমোন এনজাইম ইত্যাদি।

রক্ত রসের কাজ-

(১) পরিপাকের পর খাদ্য রক্ত রসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা ও অঙ্গে প্রবাহিত হয়।
(২) কলা থেকে বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে রেচনের জন্য বৃক্কে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

(৩) রক্তের অম্ল ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

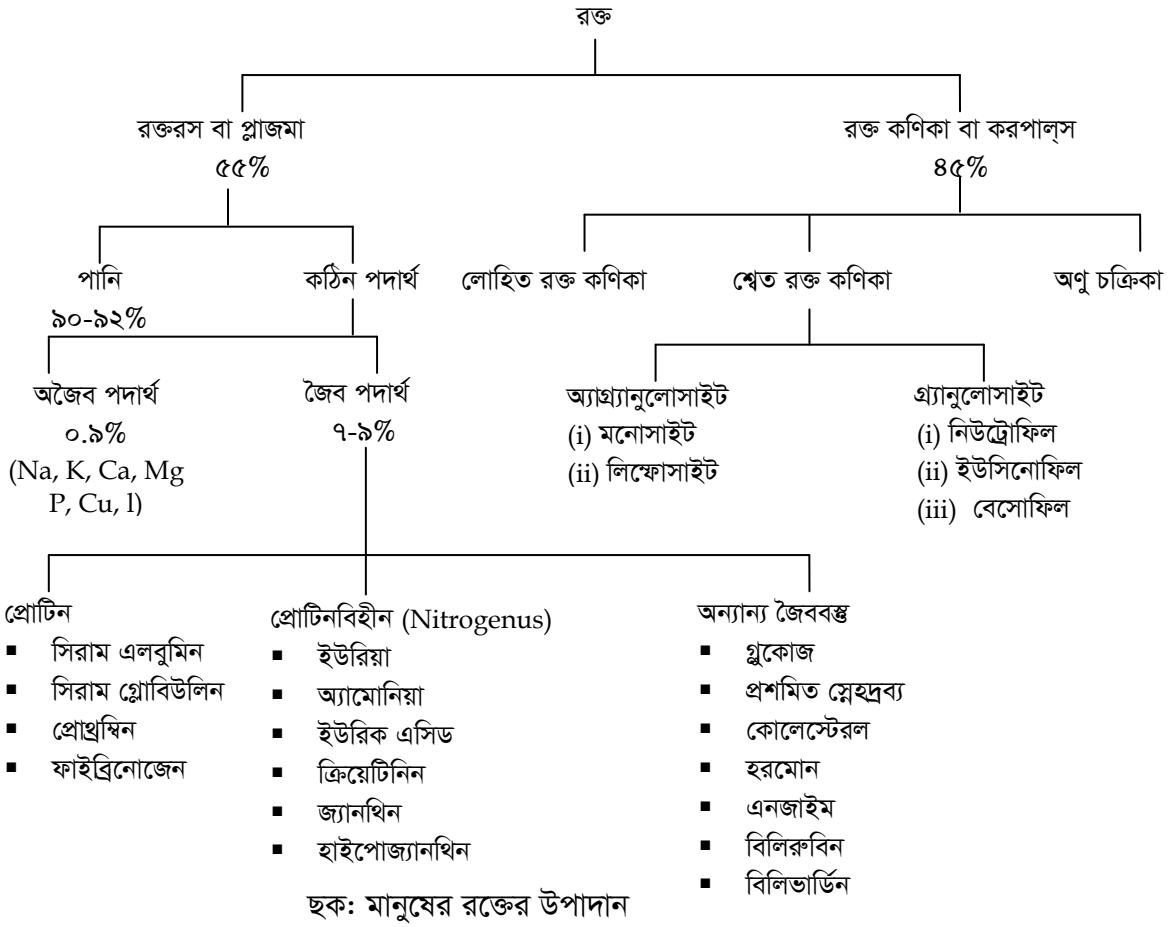

ছক: মানুষের রক্তের উপাদান

রক্ত কণিকা (Blood Corpuscles/Blood Cell)

রক্ত রসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের কোষকে রক্ত কণিকা বলে। রক্তের প্রায় ৪৫% রক্ত কণিকা। মানুষের রক্ত রসে তিন প্রকার রক্ত কণিকা পাওয়া যায়। যথা–

- লোহিত রক্ত কণিকা/এরিথ্রোসাইট
- শ্বেত রক্ত কণিকা/লিউকোসাইট
- অণু চক্রিকা/থ্রম্বোসাইট

চিত্র: মানুষের রক্ত কণিকাসমূহ

লোহিত রক্ত কণিকা বা এরিথ্রোসাইট (RBC or Erythrocyte)

পরিনত লোহিত রক্ত কণিকা ক্ষুদ্র দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল বর্ণের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। এরা স্থিতিস্থাপক প্লাজমা পর্দা বেষ্টিত এবং স্পঞ্জী সাইটের প্লাজমা নিয়ে গঠিত। সুস্থ দেহে প্রতি ১০০ মি.মি রক্তে ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।

হিমোগ্লোবিন সূর্য রশ্মির ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মির (লাল ও সবুজ) অত্যাধিক শোষণ করে বলে এসব কণিকা লাল দেখায় এবং কণিকাগুলোর ব্যাপক উপস্থিতির কারণে রক্ত গাঢ় লাল দেখায়।

চিত্র: লোহিত রক্ত কণিকা

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন থাকে। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দেহে ৫ মিলিয়ন (৫০ লক্ষ) পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী দেহে ৪.৫ মিলিয়ন (৪৫ লক্ষ), শিশুর দেহে ৬-৭ মিলিয়ন (৬০-৭০ লক্ষ) এবং ভ্রূণ দেহে ৭-৯ মিলিয়ন (৭০-৯০ লক্ষ)।

প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা ৫০ লক্ষের চেয়ে ২৫% কম হলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। রাসায়নিকভাবে এদের ৬০-৭০% পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ। আর এই কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% হিমোগ্লোবিন। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবন, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি।

উৎপত্তি: ভ্রূণ অবস্থায় যকৃত, প্লীহা ও থাইমাস থেকে **লোহিত রক্ত কণিকা** সৃষ্টি হয়। এরা নিউক্লিয়াসযুক্ত। জন্মের পর ২০ বছর পর্যন্ত দেহের সব লম্বা অস্থির অস্থিমজ্জার হিমোসাইটোব্লাস্ট (Haemocytoblast) নামক কোষ থেকে এবং জীবনের বাকী সময় হিউমেরাস, ফিমার, স্টার্নাম, কশেরুকা, পর্শুকা ও করোটির চ্যাপ্টা অস্থি থেকে এদের উৎপত্তি। মানুষের লোহিত রক্ত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)।

লোহিত রক্ত কণিকার কাজ

- হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমান CO_2 পরিবহন করে।
- রক্তের সান্দ্রতা (Viscocity) বজায় রাখা।
- রক্তে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা।
- রক্তের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের সাম্যাবস্থা বজায় রাখা।
- রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদন করে।
- কণিকার প্লাজমা ঝিল্লিতে প্রোটিন সংযুক্ত থাকে যা মানুষের রক্ত ক্লটিংয়ের জন্য দায়ী।

শ্বেত রক্ত কণিকা বা লিউকোসাইট (White Blood Corpuscles or W. B. C)

রক্ত রসে বিদ্যমান অনিয়তাকার, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং হিমোগ্লোবিনবিহীন শ্বেত বর্ণের বড় কোষ। এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবানু ধ্বংস করে।

শ্বেত রক্ত কণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন, তবে প্রয়োজনে আকার পরিবর্তন করতে পারে। আকারে লোহিত রক্ত কণিকা অপেক্ষা বড়। মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটারে রক্তে ৫-৮ হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানুষের দেহে শ্বেত কণিকা সংখ্যায় বেড়ে যায়। রক্তে লোহিত ও শ্বেত রক্ত কণিকার অনুপাত ৭০০:১।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা

শ্বেত রক্ত কণিকা নিউক্লিও প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেত রক্ত কণিকাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- অ্যাগ্র্যানুলোসাইট (দানাহীন, Agranulocyte)
- গ্র্যানুলোসাইট (দানাময়, Granulocyte)

অ্যাগ্র্যানুলোসাইট

এ ধরনের শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন, স্বচ্ছ ও বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত। আকৃতিগতভাবে এরা দুই প্রকার। যথা–

- লিম্ফোসাইট (Lymphocyte)
- মনোসাইট (Monocyte)

লিম্ফোসাইট

প্রতি কিউবিট মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০-৪০০০; গোলাকার, নিউক্লিয়াস বৃহৎ গোলাকার বা বৃক্কাকার এবং সাইটোপ্লাজমের প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করে। উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জা, যকৃত ও লসিকা থেকে।

লিম্ফোসাইট আবার দু'প্রকারের। যথা:

- T-লিম্ফোসাইট
- B-লিম্ফোসাইট

মনোসাইট

মনোসাইটগুলো বিপুল পরিমান সাইটোপ্লাজম ও অপেক্ষাকৃত ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবাহী বড় কণিকা। প্রতি কিউবিক মি.মি রক্তে সংখ্যা ১৫০০-২৭০০। উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জা, যকৃত ও প্লীহা থেকে। এরা আগ্রাসী প্রকৃতির।

গ্র্যানুলোসাইট

এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাময় এবং ২-৭ খন্ডযুক্ত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট। এদের উৎপত্তি লোহিত অস্থিমজ্জা থেকে। লিশম্যান রঞ্জকে এরা নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণ ধারণের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্র্যানুলোসাইট তিন ধরনের। যথা–

- নিউট্রোফিল (Neutrophil) সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত।
- ইওসিনোফিল (Eosinophil) দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ হয়।
- বেসোফিল (Basophil) দানাগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারণ করে।

শ্বেত রক্ত কণিকার কাজ

- **আগ্রাসন:** মনোসাইট ও নিউট্রোফিল আগ্রাসন বা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগ জীবানু ধ্বংস করে।
- **অ্যান্টি বডি উৎপাদন:** লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।
- **হেপারিন নি:সরণ:** বেসোফিল হেপারিন তৈরি করে যা রক্ত নালীর অভ্যন্তরে রক্ত তঞ্চন জমাট বাধা রোধ করে।
- **নিউট্রোফিলের:** বিষাক্ত দানা জীবানু ধ্বংস করে।
- **ট্রিফোন সংশ্লেষণ:** দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও কলার ক্ষয় রোধ করে।
- **ইউসিনোফিল:** রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট (Platelates or Thrombocyte)

রক্ত রসে অবস্থিত বর্ণহীন, নিউক্লিয়াসবিহীন, সবচেয়ে ক্ষুদ্র, গোল, ডিম্বাকার বা রডের মত, দানাময় এবং রক্ত তঞ্চনে সাহায্যকারী রক্তকোষগুলোই অণুচক্রিকা।

পরিনত মানব দেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এর সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ। অসুস্থ দেহে এগুলোর সংখ্যা আরও বেশী হয়। প্রতিটি থ্রম্বোসাইট দানাময় সাইট্রোপ্লাজম গহবর, পিনোসাইটিক গহবর ও অন্যান্য কোষ অঙ্গানু বিশিষ্ট এবং একক পর্দা দ্বারা বেষ্টিত। থ্রম্বোসাইটে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন ও সেফালিন নামক ফসপোলিপিড থাকে।

লাল অস্থিমজ্জার বড় মেগা ক্যারিওসাইট এর ভঙ্গুর ক্ষণপদ এদের উৎপত্তি। এর গড় আয়ু ৫-১০ দিন।

চিত্র : অণুচক্রিকা

অনুচক্রিকার কাজ

- দেহের ক্ষত স্থানে অণু চক্রিকা রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে।
- কৈশিক নালীর ক্ষতিগ্রস্থ এন্ডোথেলিয়াল আবরণ পুর্নগঠন করে।
- রক্ত তঞ্চনকালে অণুচক্রিকা ক্ষতস্থানে সাময়িক হিমোস্টেটিক প্লাগ সৃষ্টি করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে।
- ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কার্বন কণা ও ভাইরাসকে ভক্ষণ করে।

রক্তের গ্রুপ (Blood Group)

ব্যক্তির লোহিত রক্ত কনিকায় 'A' এবং æB" নামক দুই ধরনের এন্টিজেন (Antigen) এবং রক্তরসে æa" ও æb" দুই ধরনের এন্টিবডি থাকে। এই এন্টিজেন ও এন্টিবডির উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা যায়। একে "রক্তের গ্রুপ" বলে। ১৯০১ সালে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা æA" æB" æO" এবং æAB" এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। আজীবন মানুষের রক্তের গ্রুপ একই রকম থাকে, পরিবর্তন হয় না।

- যে গ্রুপ অন্য সকল ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারে তাদের "সার্বজনীন রক্তদাতা (Universal Douer) বলে। যেমন– O গ্রুপ।
- যে গ্রুপ অপর যে কোনো গ্রুপের ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করতে পারে তাকে সার্বজনীন রক্ত গ্রহীতা æUniversal Receipient" বলে। যেমন– AB গ্রুপ।

রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট ও রক্ত নির্বাচন

লোহিত রক্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে রক্ত গ্রুপ বা Blood Group বলে। আমেরিকার জীব বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন। রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অণুপস্থিতির উপর নির্ভর করে রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করেন, তা ABO ব্লাড গ্রুপ। অনেক সময় একে ল্যান্ডস্টেইনার এর ব্লাড গ্রুপ বলে

অ্যান্টিজেন (Antigen)

লোহিত রক্ত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে মিউকোপলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ যা অ্যান্টিবডি উৎপাদনের উদ্দীপনা যোগায় তাকে অ্যান্টিজেন বলে।

অ্যান্টিবডি (Antibody)

অ্যান্টিবডি হচ্ছে দেহে বহিরাগত পদার্থের প্রতি সাড়া দিয়ে প্লাজমা কোষ (B-লিম্ফোসাইট) থেকে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেনকে নিস্ক্রিয় করতে সাহায্য করে। অ্যান্টিবডি থাকে প্লাজমা প্রোটিন রূপে। অধিকাংশ অ্যান্টিবডি ব্লাড গ্রুপে ইমিউনোগ্লোবিউলিন G(1gG) বা M(lgM) কখনও কখনও A(lgA)। যে অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেন বিক্রিয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাকে অ্যাগ্লুটিনিন বলে।

মানুষের রক্তে A ও B-এ দু'ধরনের অ্যান্টিজেন থাকতে পারে। অ্যান্টিজেন A ও B-র সাথে রক্ত রসে কতকগুলো স্বত:স্ফুর্ত অ্যান্টিবডি রয়েছে। এগুলোকে Ante A এবং Ante B বলে। এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতেই রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়, যথা: A, B, AB ও O। A ব্লাড গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB গ্রুপে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে। O গ্রুপের রক্তের কণিকা ঝিল্লিতে কোন অ্যান্টিজেন নেই কিন্তু রক্তরসে α ও β দু'রকম অ্যান্টিবডিই থাকে।

A গ্রুপের অ্যান্টিবডি B রক্ত গ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমাট বেঁধে দেয়। ঠিক তেমনি B গ্রুপের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না, কারণ সেখানে কোন অ্যান্টিবডি নেই। ঠিক একই কারণে O গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য তিন গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। অর্থাৎ কারো দেহে O গ্রুপের রক্ত থাকলে তিনি কেবল O গ্রুপের রক্ত নিতে পারবেন কিন্তু অন্য সব গ্রুপকেই রক্ত দিতে পারবেন।

১০ : ২ ব্যবহারিক কাজ : মানুষের রক্তের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ (Study of Permenent Slide of Human Blood)

রক্ত কণিকাসমূহের (Blood Corpuscles) স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ, শনাক্তকরণ ও চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন।

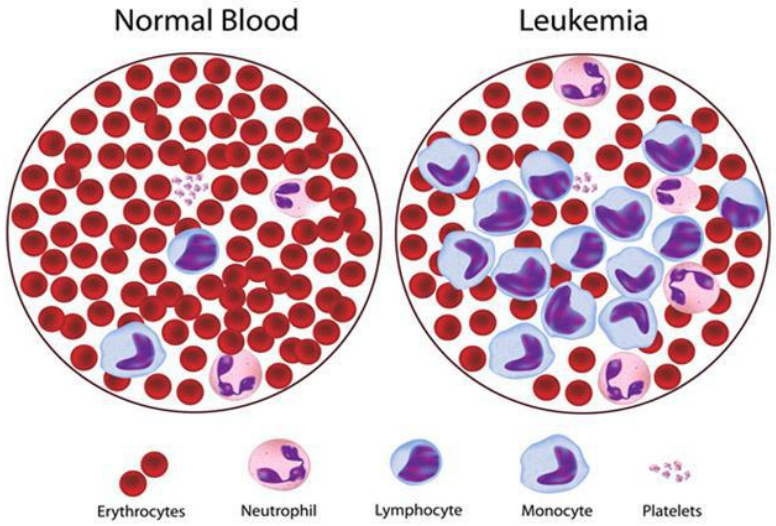

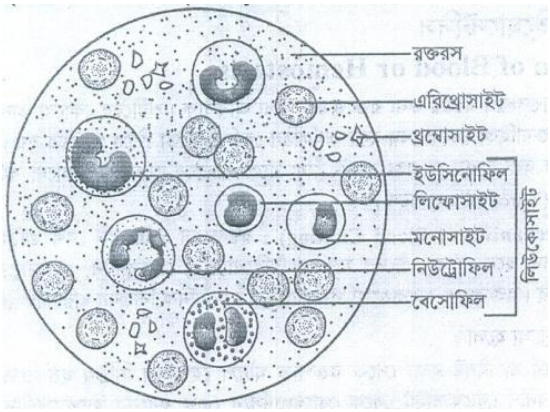

চিত্র : মানুষের রক্ত

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

প্রদত্ত নমুনা স্লাইডটিকে নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান।

- রক্তরসে তিন ধরনের রক্তকণিকা বিদ্যমান।
- লোহিত কণিকা, গোলাকার দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন এবং লাল বর্ণের।
- শ্বেত কনিকা বিভিন্ন আকার আকৃতির এবং দ্বি-খন্ডিত নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং বর্ণহীন।
- অণুচক্রিকা দন্ডাকার, ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াসবিহীন বর্ণহীন।

শনাক্তকরণ: সরবরাহকৃত নমুনাটি মানুষের রক্তের স্থায়ী স্লাইড।

শ্রেণির কাজ: রক্তের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণে, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের একাধিক দল গঠন করে, প্রতি দলে মাইক্রোস্কোপ ও স্থায়ী স্লাইড সরবরাহ এবং সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে, পর্যবেক্ষণ পরবর্তী উপস্থাপনের জন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১০.৩ : রক্ত সঞ্চালন (হৃদপিন্ডের গঠন ও কাজ, শিরা ও ধমনির কাজ ও রক্ত চাপের ভূমিকা)

মানবদেহে রক্ত বিভিন্ন রক্তবাহিকা নালিকা দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ "হৃদপিন্ড"। হৃদপিন্ড একটি পাম্পের ন্যায় কাজ করে। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারন দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়। হৃদপিন্ডের অবিরাম সংকোচন ও প্রসারনের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে। হৃদপিন্ডের সংকোচনকে বলা হয় "সিস্টোল" ও প্রসারনকে বলা হয়– "ডায়াস্টোল"। হৃদপিন্ডের একবার সিস্টোল ডায়াস্টোলকে একত্রে "হৃদস্পন্দন" (Heart Beat) বলে।

হৃদপিন্ডের গঠন

হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোনাকার ফাঁপা অঙ্গ। এটি হৃদপেশি নামক এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। এর সম্মুখ ভাগ স্টার্ণামের দিকে পশ্চাৎভাগ মেরুদন্ডের দিকে এবং নিম্নভাগ ডায়াফ্রামের উপরে থাকে। হৃৎপিন্ডের প্রশস্ত সম্মুখ উপরিভাগ অলিন্দ দ্বারা ও পশ্চাদের মোচাকার অংশটি নিলয় দ্বারা গঠিত। হৃদপিন্ডের ওজন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ওজনের ০.৪৫% এবং মহিলাদের দেহের ওজনের ০.৪০%। হৃদপিন্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। হৃদপিন্ডের প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে।

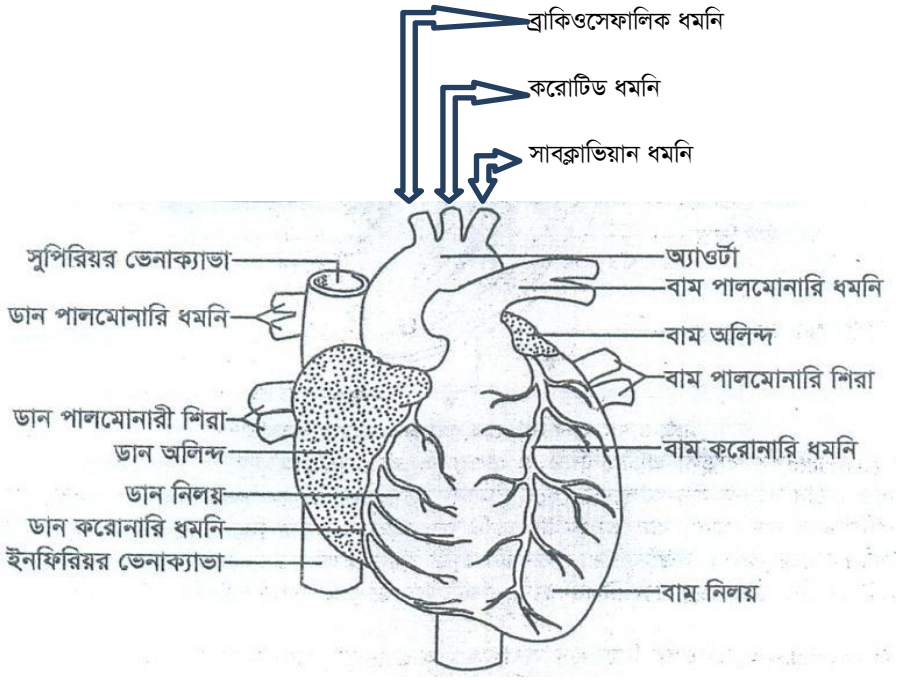

চিত্র : মানুষের হৃদপিন্ডের বর্হিগঠন

ক. হৃদপিন্ডের প্রাচীরঃ

- **বহিঃস্তর বা এপিকার্ডিয়াম :** এটি হৃদপ্রাচীরের বাইরের স্তর এবং যোজককলার তৈরি। এই স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।
- **মধ্যস্তর বা মায়োকার্ডিয়াম :** এটি হৃদপ্রাচীরের মাঝের স্তর। স্তরটি পুরু, দৃঢ়, অনৈচ্ছিক সরেখ হৃদপেশির তৈরি এবং হৃৎপিন্ড সংকোচন-প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এটি অলিন্দের তুলনায় নিলয়ে অপেক্ষাকৃত পুরু, তদুপরি বাম নিলয়ে সর্বাপেক্ষা পুরু।
- **অন্তঃস্তর বা এন্ডোকার্ডিয়াম:** এটি হৃদপ্রাচীরের ভিতরের স্তর যা হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, একস্তরী আইশাকার কলার তৈরি যা হৃৎপিন্ডের কপাটিকা তৈরি করে।

খ. প্রকোষ্ঠসমূহ

- **অলিন্দ (Atrium):** পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট ও প্রশস্ত অঞ্চল। আন্তঃঅলিন্দ প্রাচীর দ্বারা ডান ও বাম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ডান অলিন্দ বাম অলিন্দের চেয়ে সামান্য বড়। ডান ও বাম উভয় দিক থেকে দুটি করে পালমোনারি শিরা বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। বাম অলিন্দটি একটি বড় অলিন্দ নিলয় ছিদ্র পথে বাম নিলয়ে উন্মুক্ত হয়। এটি বড় ডান অলিন্দ-নিলয় ছিদ্র পথে ডান অলিন্দ ডান নিলয়ে উন্মুক্ত হয়।
- **নিলয় (Ventricle):** অলিন্দের নিম্নভাগে অবস্থিত। আন্তঃনিলয় পর্দা দ্বারা ডান ও বাম প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এর প্রাচীর অলিন্দের প্রাচীর থেকে বেশি পুরু। তদুপরি বাম নিলয়ের প্রাচীর ডান নিলয়ের প্রাচীর অপেক্ষা প্রায় তিনগুন পুরু। ডান নিলয়টির উপরিভাগ থেকে পালমোনারী মহাধমনি এবং বাম নিলয়ের উপরিভাগ থেকে অ্যাওর্টা বা মহাধমনি সৃষ্টি হয়।

হৃদপিন্ডের অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে যে ছিদ্র পথ আছে তা খোলা বা বন্ধ করার জন্য ভালব (Valve) বা কপাটিকা থাকে। ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় মধ্যবর্তী ছিদ্রপথ তিন পাল্লা বিশিষ্ট "ট্রাইকাসপিড" ভালব দ্বারা সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় দুই পাল্লা বিশিষ্ট "বাইকাসপিড" ভালব দ্বারা সুরক্ষিত। মহাধমনি ও ফুসফুসীয় ধমনির মুখে অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা থাকে। এদের অবস্থানের ফলে পাম্প করা রক্ত একই দিকে চলে এবং উল্টো দিকে ফিরে আসতে পারে না।

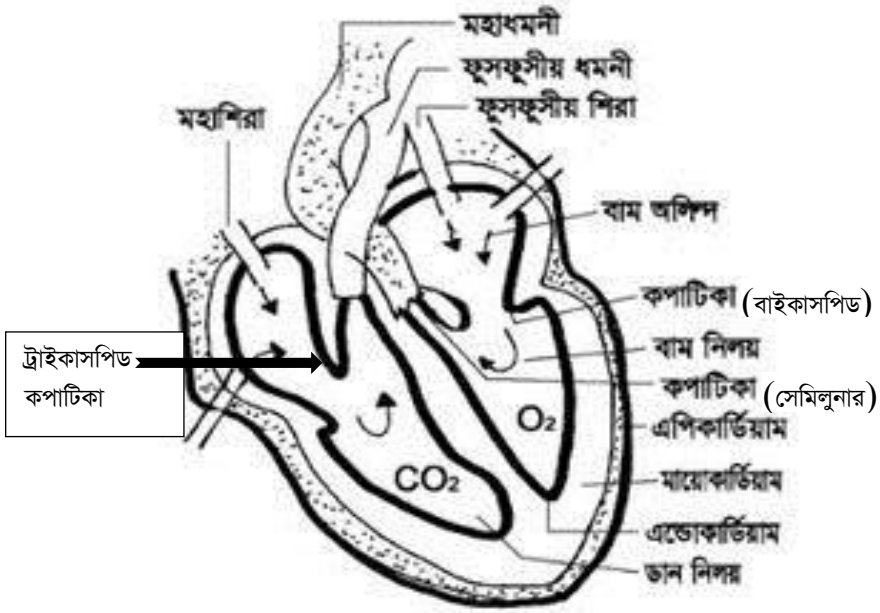

চিত্রঃ হৃদপিন্ডের মধ্যে রক্ত সংবহনের গতিপথ

হৃদপিন্ডের কাজ

- রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃদপিন্ডের সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রে রক্ত প্রবাহ সচল থাকে।
- হৃদপিন্ডের যে সব নালির ভেতর রক্ত প্রবাহিত হয় সে সব নালিপথে হৃদপিন্ড থেকে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত করা এবং বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় রক্ত হৃদপিন্ডে ফিরিয়ে আনে।
- ধমনী হৃদপিন্ড থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসে পৌঁছে দেয়।
- শিরার মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিন্ডে ফিরে আসে।

রক্তবাহিকা

আকার-আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম, যথা– ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা।

১. **ধমনি (Artery):** যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিন্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বলে। (এ ক্ষেত্রে পালমোনারি ধমনি ব্যতিক্রম। এটি CO_2 সমৃদ্ধ রক্তকে হৃদপিন্ড থেকে ফুসসুফে পৌঁছে দেয়)। ধমনি প্রাচীর তিনস্তর বিশিষ্ট, যথা– (ক) যোজক কলায় গঠিত বাইরের স্তর টিউনিকা এ্যাডভেনটিসিয়া বা টিউনিকা এক্সটার্ণা; (খ) পেশীতন্ত্র নির্মিত স্তর টিউনিকা মিডিয়া এবং (গ) এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত অন্তঃস্তর টিউনিকা ইন্টিমা।

ধমনি ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিকজালিকায় সমাপ্ত হয়। এভাবে, ধমনি হৃদপিন্ড থেকে শুরু হয় এবং কৈশিকজালিকায় শেষ হয়।

২. **শিরা (Vein):** যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ড্রাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাকে শিরা বলে। (এ ক্ষেত্রে পালমেনারি শিরা ব্যতিক্রম। এটি ফুসফুস থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিন্ডে নিয়ে আসে)। শিরার প্রাচীর অনুরূপ ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও নরম কিন্তু স্থিতি স্থাপক নয়। এদের লুমেন বড়। ধমনি প্রান্তের কৈশিকজালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ শিরা ও পরে বড় শিরা গঠন করে। এভাবে, শিরা কৈশিকজালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃদপিন্ডে শেষ হয়।

৩. **কৈশিকজালিকা (Capillary):** শুধুমাত্র একস্তর বিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত সূক্ষাতিসূক্ষ রক্তবাহিকা যা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগ স্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত, সেগুলোকে কৈশিকজালিকা বলে। কৈশিকজালিকার রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন ক্রিয়ায় খাদ্যসার, শ্বসনবায়ু, রেচন দ্রব্য ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	ধমনী	শিরা
১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি	হৃদপিন্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকনালীতে সমাপ্ত হয়।	কৈশিকনালী থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিন্ডে সমাপ্ত হয়।
২. রক্ত প্রবাহের দিক	হৃদপিন্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে।	দেহ থেকে হৃৎপিন্ডের পরিবহন করে।
৩. রক্তের প্রকৃতি	পালমোনারী ধমনী ছাড়া অন্য ধমনীগুলো CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জল লাল বর্ণের।	পালমোনারী শিরা ছাড়া অন্য শিরাগুলে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের।
৪. প্রাচীর	বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক।	কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক।
৫. লুমেন (গহ্বর)	লুমেন ছোট।	লুমেন বেশ বড়।
৬. কপাটিকা	কপাটিকা থাকে না।	সেমিলুনার কপাটিকার মতো কপাটিকা থাকে।
৭. অবস্থান	প্রধানত দেহের গভীর অংশে বিস্তৃত থাকে।	দেহের পরিধি অংশে বিস্তৃত থাকে।
৮. রক্ত চাপ	উচ্চ চাপে রক্ত পরিবহন করে।	কম চাপে রক্ত পরিবহন করে।

রক্তচাপ

বাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহমান রক্ত বাহিকার প্রাচীরের গাত্রে যে পার্শ্বীয় চাপ সৃষ্টি করে, তাকে রক্তচাপ বলে। প্রকৃত অর্থে রক্তচাপ বলতে ধমনি রক্তচাপকে বোঝায়। এটি বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা হয়।

- **সিস্টোলিক রক্তচাপ:** হৃদপিন্ডের নিলয়ের সংকোচনকালীন সর্বাধিক রক্তচাপ। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে এটি 120 মি.মি. পারদ চাপের সমান।
- **ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ:** হৃদপিন্ডের নিলয়ের সম্প্রসারণকালীন সর্বনিম্ন রক্তচাপ। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে এটি 120 মি.মি. পারদ চাপের সমান।
- **নাড়ী রক্তচাপ:** সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের পার্থক্য। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে স্বাভাবিক নাড়ী রক্তচাপ 80 মি.মি. (120-80 মি.মি.) পারদ চাপের সমান।
- **অস্বাভাবিক রক্তচাপ:** পূর্ণ বয়স্ক পুরুষে সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৫০ এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মি.মি. পারদ চাপের বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৫০ মি.মি পারদ চাপের কম হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বা হাইপোটেনশন বলে।

রক্তচাপ হওয়ার কারণ

- বংশানুক্রমিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- স্নায়ুবিক চাপ (Tension) বা ধুমপানের অভ্যাস থাকলে।
- দেহের ওজন বৃদ্ধি হলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।
- খাদ্যে লবণ ও চর্বিযুক্ত উপাদান উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- পরিবারের সদস্যদের ডায়াবেটিস বা কোলেস্টেরোলের পূর্ব ইতিহাস থাকলে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।
- সন্তান প্রসবের সময় খিঁচুনী রোগের কারণে মায়ের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।

রক্তচাপের লক্ষণ

- মাথা ব্যাথা বিশেষ করে মাথার পেছন দিকে ব্যাথা করা।
- মাথা ঘোরা, ঘাড় ব্যাথা, বুক ধড়ফড় করা ও দুর্বল বোধ করা।
- রোগীর নাক দিয়ে রক্ত পড়া।
- উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সুনিদ্রা হয় না।
- অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠা।

রক্তচাপ নির্ণয় করা

সাধারণত: রক্তচাপ মাপক যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়। রক্তচাপ মাপার সময় কমপক্ষে দুইবার ১ থেকে ২ মিনিট ব্যবধান রেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা ভালো।

উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকার

- টাট্‌কা ফল ও শাক-সব্জি খাওয়ার অভ্যাস করা।
- দেহের ওজন নিয়ন্ত্রন রেখে শারীরিক পরিশ্রম করা।
- ব্যায়াম করা।
- চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
- খাবারের সময় অতিরিক্ত লবণ না খাওয়া এবং কাঁচা লবণ খাওয়া পরিহার করা।
- ধুমপান বা যে কোন মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা।
- রক্তচাপ বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা।

১০.৪ : মানবদেহে রক্ত সংবহন: সিস্টেমিক সংবহন ও পালমোনারি সংবহন, হৃদপিন্ড সম্পর্কিত রোগ, করণীয়

মানবদেহের সংবহনে রক্ত জীবনী শক্তির মুল। রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কোষে অক্সিজেন ও খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অংশে চলাচল করে তাকে "রক্ত সংবহন তন্ত্র" (Circulatory System) বলে।

মানবদেহে রক্ত প্রবাহ কেবল হৃদপিন্ড ও রক্তনালীসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কখনও বাইরে আসে না। সারাদেহে রক্তের একবার পরিভ্রমণের জন্য মাত্র ১ মিনিট বা তার চেয়ে কম সময় লাগে। এ ধরনের সংবহনতন্ত্রকে "বন্ধ সংবহন তন্ত্র" (Close Circulatory System) বলা হয়। এ ব্যবস্থায় রক্ত সরাসরি দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে পৌঁছে এবং রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে পরিভ্রমণ করে দ্রুত হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে।

মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র: মানদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রে প্রধানত ৪ প্রকারের রক্ত সংবহন হয়ে থাকে । যথা: (ক) সিস্টেমিক সংবহন ও (খ) পালমোনারি সংবহন (গ) করোনারি সংবহন (ঘ) পোর্টাল সংবহন

চিত্র: মানবদেহে রক্ত সরবরাহের প্রবাহ চিত্র

(ক) সিস্টেমিক সংবহন

যে পদ্ধতিতে হৃদপিন্ড থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্যাপিলারি জালক থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃদপিন্ডে প্রবেশ করে তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে। সিস্টেমিক সংবহন দুই ভাগে বিভক্ত। যথা– (ক) ধমনিতন্ত্র ও (খ) শিরাতন্ত্র।

- **সিস্টেমিক ধমনিতন্ত্র:** বাম নিলয়ের অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন অ্যাওর্টা এ তন্ত্রের সূচনা করে। অ্যাওর্টা উৎপত্তি লাভের পর সম্মুখ দিকে স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করেই বাম দিকে বাঁকা হয়ে এককভাবে অ্যাওর্টিক আর্চ গঠন করে। অ্যাওর্টিক আর্চটি অতঃপর পশ্চাদে বা দিক বরাবর এসে এককভাবে ডর্সাল অ্যাওর্টা গঠন করে। এরা বিভিন্ন শাখা প্রদান করে।
- **করোনারি ধমনি:** অ্যাওর্টা অ্যাওর্টিক আর্চ গঠনের পূর্বেই ডান ও বাম করোনারি ধমনী উৎপন্ন হয়। এরা অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃদপেশিতে সরবরাহ করে।
- **অ্যাওর্টিক আর্চ থেকে উৎপন্ন ধমনিসমূহ:** অ্যাওর্টা করোনারী ধমনি প্রদানের পরেই উপরিভাগে চলে যায় এবং বাঁকা হয়ে তিনটি প্রধান শাখা প্রদান করে। এদের অ্যাওর্টিক আর্চ বলে। প্রধান শাখা তিনটি হলো– ব্র্যাকিও, সেফালিক বা ইনোমিনেট, বাম সাধারণ ক্যারোটিড ও বাম সাবক্লেভিয়ান।
- **ব্র্যাকিও সেফালিক বা ইনোমিনেট:** শাখা দুটি, যথা– ডান সাধারণ ক্যারোটিড ও ডান সাবক্লেভিয়ান।
- **ডান ও বাম সাধারণ ক্যারোটিড ধমনির শাখাসমূহ:** ডান ও বাম উভয় সাধারণ ক্যারোটিড সম্মুখ ভাগে দুটি শাখা প্রদান করে। যথা–

১. **অন্তঃস্থ ক্যারোটিড:** মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পশ্চাদ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে।

২. **বহিঃস্থ ক্যারোটিড:** বহিঃস্থ ক্যারোটিড থেকে উৎপন্ন ফেসিয়াল– মুখমন্ডলের পেশি ও ত্বকে; সুপিরিয়র থাইবয়েড-**থাইরয়েড এবং শ্বাসযন্ত্রে;** লিংগুয়াল-জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিতে; ফ্যারিঞ্জিয়াল-গলবিলে; অন্তঃস্থ ম্যাক্সিলারি-চোয়াল ও দাঁতে রক্ত সরবরাহ করে।

ডান ও বাম সাবক্লেভিয়ান ধমনির শাখাসমূহ

ভার্টিব্রাল– মেরুদন্ড, গ্রীবা এবং মস্তিষ্কে, ব্র্যাকিয়াল, ঊর্ধ্ববাহুর বিভিন্ন অঞ্চলে, অন্তঃস্থ ম্যামারি-ডায়াফ্রাম স্তন্য গ্রন্থি প্রভৃতিতে রক্ত সরবরাহ করে।

ডর্সাল অ্যাওর্টার শাখাসমূহ: ডর্সাল অ্যাওর্টা উদরীয় অঞ্চলের পেলভিসের সমতলে এসে বিভিন্ন শাখা প্রদান করে। যেমন–

সিলিয়াক-পাকস্থলী ও অন্ত্রে: ফ্রেনিক-ডায়াফ্রামের পেশীতে; রেনাল-বৃক্কে; মেসেন্টেরিক অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে স্পার্মাটিক-শুক্রাশয়ে বা ওভারিয়ান ডিম্বাশয়ে রক্ত সরবরাহ করে। ডর্সাল অ্যাওর্টা চতুর্থ লম্বারের সমতলে এসে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। শাখা দুটি হলো– ডান সাধারণ ইলিয়াক ও বাম সাধারণ ইলিয়াক। এরা প্রত্যেকেই আবার অন্তঃস্থ ইলিয়াক ধমনী এবং বহিঃস্থ ইলিয়াক ধমনী নামক দু'টি করে শাখায় বিভক্ত হয়

অন্তঃস্থ ইলিয়াক: পেলভিসের প্রাচীর, শ্রোণিচক্রের পেশি, মলাশয়, মূত্রথলে, জরায়ু প্রভৃতিতে শাখা দেয়।

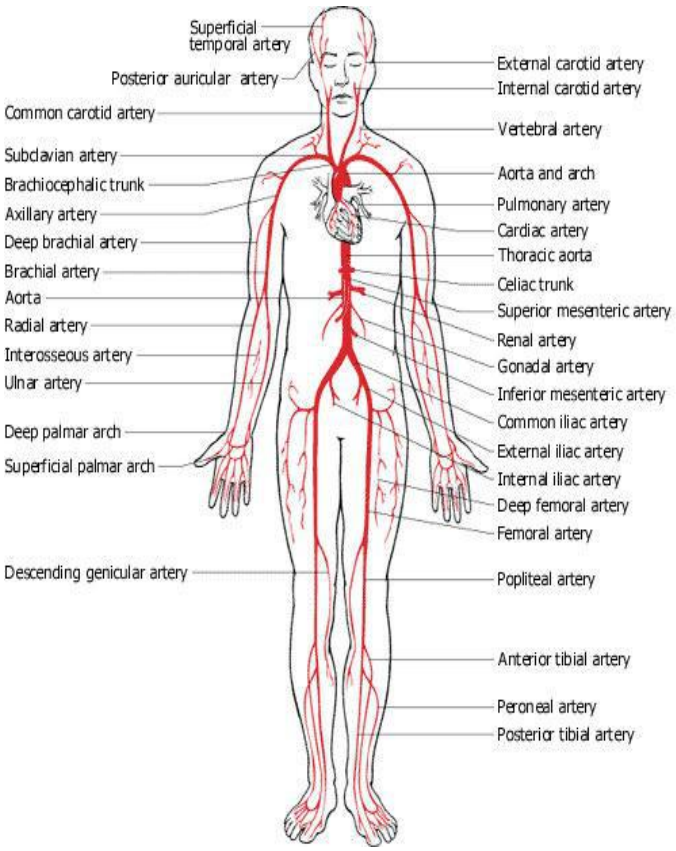

চিত্র:মানবদেহের ধমনিতন্ত্র

বহিঃস্থ ইলিয়াক: উদরীয় প্রাচীরে রক্ত সরবরাহের পর উরু অঞ্চলে ফিমোরাল ধমনি গঠন করে। এর একটি শাখা পপলিশিয়াল নামে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং একটি শাখা সাফেনা ম্যাগনা পায়ের পাতার উপরিতলে যায়। পপলিশিয়াল থেকে উৎপন্ন টিবিয়াল ধমনি টিবিয়াতে এবং সাফেনা পার্ভা ধমনি
পায়ের গোড়ালির তলদেশে রক্ত সরবরাহ করে।

খ. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র : যে শিরাতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রক্ত সংগ্রহে প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাকে সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র বলে।

সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রটি দু'টি প্রধান শিরা নিয়ে গঠিত। যথা–

১. সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা বা প্রিক্যাভাল ও ২. ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা।

১. সুপিরিয়র ভেনাকাভা বা প্রিক্যাভাল: ডান এবং বাম ব্র্যাকিও-সেফালিক বা ইনোমিনেট শিরা, সাবক্লেভিয়ান শিরা ও অন্তঃস্থ জুগুলার শিরা নিয়ে গঠিত।

ব্র্যাকিও-সেফালিক শিরা: মেরুদন্ড ও মস্তিষ্ক থেকে ভাটিব্রাল শিরা, ঊর্ধ্ববাহু বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্র্যাকিয়াল শিরা এবং ডায়াফ্রাম, স্তন্য গ্রন্থি থেকে অন্তঃস্থ ম্যামারি শিরা প্রভৃতি মিলিত হয়ে এ শিরা গঠিত হয়।

সাবক্লেভিয়ান শিরা: বাহু, শ্রোণিচক্র, গ্রীবা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

অন্তঃস্থ জুগুলার শিরা: ডান ও বাম শাখা নিয়ে গঠিত এবং নিজ নিজ দিকের মস্তিষ্ক, মুখমন্ডল এবং গ্রীবা অঞ্চল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

অ্যাজাইগাস শিরা: দেহের বক্ষীয় অঞ্চল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সুপিরিয়র ভেনাকাভা ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হবার পূর্বেই একটি একক অ্যাজাইগাস শিরা তার সাথে মিলিত হয়।

খ. ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা বা পোস্টক্যাভাল: সাধারণ ডান এবং বাম ইলিয়াক নিয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি শাখা পুনরায় অন্তঃস্থ এবং ইলিয়াক শিরা নিয়ে গঠিত। অন্তঃস্থ ইলিয়াক শ্রোণি অঞ্চল, মলাশয়, জরায়ু প্রভৃতি থেকে ও বহিঃস্থ ইলিয়াক পায়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাফেনাপার্ভা, টিবিয়াল, পপলিশিয়াল, সাফেনাম্যাপনা ও ফেমোরাল শিরার মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে এবং পরিশেষে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা গঠন করে।
কলোনারী সাইনাস: হৃদপিন্ড থেকে রক্ত সংগ্রহকারী শিরা নিয়ে গঠিত একটি সাধারণ নালিকা, যা স্বতন্ত্রভাবে ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয়।

(খ)পালমোনারি সংবহন

যে সংবহনে রক্ত হৃদপিন্ডের ডান ভেন্ট্রিক্ল থেকে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সংবহন বলে। সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে পৌঁছার পর সেখান থেকে ট্রাইকাসপিড কপাটিকা অতিক্রম করে ডান ভেন্ট্রিকুলে প্রবেশ করে। ডান ভেন্ট্রিকূলে প্রবেশের পরপরই হৃদপিন্ডের সংকোচনের ফলে পালমেনারি ধমনির মধ্য দিয়ে রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে গ্যাসের বিনিময় ঘটে। রক্ত থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়। সব ধমনি অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহন করলেও কেবলমাত্র পালমোনারি ধমনি এর ব্যতিক্রম। এ ধমনি হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুসে অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করে। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা কালীন অসংখ্য সূক্ষ্ম জালিকা অ্যালভিওলাইয়ের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। ফলে, ব্যাপনের মাধ্যমে রক্তে গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। নতুনভাবে অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে রক্ত পালমোনারি শিরায় সংগৃহীত হয়ে তার ভেতর দিয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে গমন করে। বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাইকাসপিড কপাটিকার ভেতর দিয়ে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকূলে গমন করে। সব শিরা অক্সিজেনবিহীন রক্ত বহন করলেও একমাত্র পালমেনারি শিরা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে। এভাবে ডান ভেন্ট্রিক্ল থেকে রক্ত ফুসফুসে এবং সেখান থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে সংবহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিক্রম সম্পন্ন হয়, তাকে পালমোনারি সংবহন বলে। পালমোনারি সংবহন শেষে হৃদপিন্ডে আনীত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় সিস্টেমিক সংবহনের মাধ্যমে সারা দেহে প্রেরিত হয়।

(গ) করোনারি সংবহন

যে পদ্ধতেতে হৃদপিন্ডের প্রাচীরে রক্ত সংবাহিত হয় তাকে করোনারি সংবহন বলে। হৃদপিন্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃদপিন্ডের গহবর হতে রক্ত সংবাহিত হয়না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া থেকে সৃস্ট করোনারি ধমনির মাধ্যমে হৃদপিন্ডের প্রাচীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সংবাহিত হয়। আবার হৃদপিন্ডের প্রাচীর হতে কার্বনডাই অক্সাইডযুক্ত রক্ত করোনারী শিরার মাধ্যমে হৃদপিন্ডে ফেরত আসে।

(ঘ) পোর্টাল সংবহন

কোন অংগে কৌশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃদপিন্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অংগে প্রবেশ করে, পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এধরনের সংবহনই পোর্টাল সংবহন। মানবদেহে পাকস্থলী, অগ্নাশয়, অন্ত্র, প্লীহা ইত্যাদি অংগ হতে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক বা যকৃৎ পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হয়। যকৃতের মধ্যে এ শিরা আবার কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এসব রক্ত জালিকা পরে একীভূত হয়ে হেপাটিক শিরায় পরিনত হয় এবং এর মাধ্যমে রক্ত নিম্ন মহাশিরায় পৌঁছে হৃদপিন্ডের দিকে যায়। এটিই মানুষের যকৃত পোর্টাল সংবহন। উল্লেখ্য যে অনেক মেরুদন্ডী প্রাণিতে বৃক্কীয় পোর্টাল সংবহন দেখা গেলেও মানুষের বেলায় তা অনুপস্থিত।

হৃদপিন্ড সম্পর্কিত রোগ

মানবদেহের শরীরতত্ত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছে হৃদপিন্ড। এটি মাংসল, ফাঁপা ও মোচার মত। হৃদপিন্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক দ্বিস্তরী আবরনী দ্বারা আবৃত্ত। এর বাইরের স্তরটিকে প্যারাইটাল ও ভেতরের আবরনটিকে ভিসেরাল স্তর বলে। পেরিকার্ডিয়াল হৃদপিন্ডকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া হৃদপিন্ড ও রক্তবাহিকাগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হলে একাধিক ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এগুলোকে একত্রে হৃদরোগ বলা হয়। যেমন- বুকে ব্যথা ,হার্ট অ্যাটাক, উচ্চ রক্তচাপ, ধমনির কাঠিন্যতা এবং হার্ট ফেইলিউর ইত্যাদি।

১. বুকে ব্যথা

বুকে ব্যথা, সাধারণত: হৃদপিন্ডে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে কোন প্রকার বিঘ্নিত হলে ব্যথার সৃষ্টি হয়, তাকে বুকে ব্যথা বলে।

বুকের ব্যথার কারণ ও স্থান

কারণ: স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার ফলে হৃদপিন্ডের পেশিতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে, হার্ট ফেইলিউরের জন্য, গ্যাস বৃদ্ধিজনিত কারণে।

স্থান: বক্ষ প্রাচীর, পেশি এবং ত্বক, মেরুদন্ড ও তৎসংলগ্ন পেশি, ফুসফুস ও ট্রাকিয়া, হৃৎপিন্ড ও পেরিকার্ডিয়াম, অ্যাওর্টা, অন্ননালী ও ডায়াফ্রাম।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সাধারণত নানা কারণে বুকের ব্যথা সৃষ্টি হয় বলে একে পৃথকভাবে শনাক্ত করা কঠিন হয়। ফলে ব্যথার ধরন এবং স্থান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ব্যথার কারণ এবং তীব্রতা বিবেচনা করে চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং অনেক সময় রক্ত পরীক্ষা, X-ray, সিটি স্ক্যান ও বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়।

২. হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack)

হৃদপেশিতে আঘাত লেগে বুকে ব্যথা ও চাপ সৃষ্টি হয়ে ২০-৪০ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ ফিরে না আসলে হৃদপেশির মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং এরূপ ৬-৮ ঘন্টা ধরে পেশি মারা যেতে থাকলে তবে হার্ট অ্যাটাক ঘটে থাকে।

হার্ট অ্যাটাকের কারণ

হৃদপেশির আঘাতজনিত কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। যখন হৃদপেশির স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়, তখন তা সঠিকভাবে সংকোচন ঘটাতে পারে না এবং হৃদপিন্ডের স্পন্দন থেমে যায়। ফলে মস্তিষ্ক বিনষ্ট হয় এবং দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রেরণে অক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্পন্দন শুরু না হলে মস্তিষ্ক বিনষ্ট ও রোগী মৃত্যু ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকুলার ফ্রাইব্রিলেশনজনিত হার্ট অ্যাটাক থেকে রোগীর মৃত্যু ঘটে। ভেন্ট্রিকুলার ফ্রাইব্রিলেশন শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি কার্ডিও পালমোনারি সঞ্চালন করা সম্ভব হয় তবে রোগী মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এছাড়া হার্ট অ্যাটাকের জন্য দায়ী এবং ঝুকিপূর্ণ কারণগুলো হলো–

- ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন: হৃদপেশির আঘাতজনিত কারণে হৃৎপিন্ডের স্পন্দন থেমে যায় এমন কি মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য অঞ্চলে রক্ত সঞ্চালন অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ৫ মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- **রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি (Hyperlipidemia):** অতি মাত্রার কোলেস্টেরল (Lipid) বৃদ্ধির ফলে ধমনির ভেতরের প্রাচীরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।
- **উচ্চ রক্তচাপ (Hyper Blood Pressure/Hypertension):** অতি মাত্রায় উচ্চ রক্তচাপের কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ রোগীর মৃত্যু হতে পালে।
- **তামাক সেবন:** তামাক ও তামাক জাতীয় দ্রব্যের রাসায়নিক উপাদান রক্তনালীর প্রাচীর আক্রান্ত করে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা

১. তাৎক্ষনিক ডাক্তারের শরণাপন্য হওয়া ও অক্সিজেন সরবরাহ করা।
২. রক্ত জমাট বাঁধানো প্রতিহত করার জন্য অ্যাসপিরিন দেয়া।
৩. করোনারি ধমনির মধ্যে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য নাইট্রোগ্লিসারিন দেওয়া।
৪. বুকের ব্যথার চিকিৎসা আরম্ভ করা।
৫. নিয়মিত খাবার গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করা।

৩. হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃদপিন্ড দেহের প্রয়োজনীয় রক্ত প্রবাহ না করতে পারলে তাকে "হার্ট ফেইলিউর" বলে। উপসর্গ হিসেবে শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা, অবসাদ, পদতলে স্ফীতি, দ্রুত বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ও বুকে ব্যথা অনুভুত হয়।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

১. হৃদপেশিতে সর্বদা রক্ত সরবরাহকারী ধমনিগুলোর মধ্যে চর্বি জমা হলে রক্তের প্রবাহ মাত্রা কমে যায়, হৃদপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ায় অক্সিজেন রক্ত সেখানে পৌঁছাতে পারে না। অনেক সময় ধমনি বিদীর্ন হয়ে হার্ট ফেইলিউর ঘটে।
২. **উচ্চ রক্তচাপ:** ধমনির প্রাচীর ও হৃদপেশি দুর্বল হয়ে হার্ট ফেইলিউর ঘটায়।
৩. **ত্রুটিপূর্ণ হৃদ-কপাটিকা:** হৃৎপিন্ডের কপাটিকা বিনষ্ট হলে রক্ত প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে হৃৎপিন্ডকে দুর্বল করে হার্ট ফেইলিউর ঘটে।

৪. অস্বাভাবিক ছন্দময়তা (Drop Beat)

হৃদপিন্ডের অস্বাভাবিক ছন্দময়তা হৃদপিন্ড দুর্বল করে হার্ট ফেইলিউর ঘটায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- নিয়মিত ব্যায়াম, মানসিক বিষন্নতা পরিহার, দেহের ওজন কমানো, পরিমিত খাবার গ্রহণ, খাদ্যে লবণ পরিহার।
- চিকিৎসক পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন, প্রয়োজনে সার্জিকেল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখার উপায়

মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় হৃদপিন্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হৃদপিন্ড সুস্থ রাখার জন্য সঠিক জীবনচক্র ও খাদ্য নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। নানা ধরনের চর্বি জাতীয় খাদ্য হৃদযন্ত্রের কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। রক্তে কোলেস্টেরোল হৃদপিন্ডের রক্তনালিতে প্রতিন্ধকতা সৃষ্টি করে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে থাকে।

- মাদক ও নেশা সেবনে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং হৃদযন্ত্রের প্রভূত ক্ষতি হয়।
- ধুমপান বা জর্দার নিকোটিন হৃদপেশির ক্ষতি করে।
- মেদ সৃষ্টিকারী খাদ্য যেমন– তেল, চর্বি, অতিরিক্ত শর্করা পরিহার করে, সুষম খাদ্য গ্রহণ করে, প্রতিদিন পরিমিত ব্যায়াম এবং হাঁটা চলার মাধ্যমে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়।

১০ : ৫ ABO রক্ত গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা (রক্ত সঞ্চালন ও গর্ভধারণ জনিত জটিলতা)

ABO রক্তগ্রুপ: অস্ট্রিয় বংশোদ্ভুত আমেরিকান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মানুষের লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা আবরণীর বাইরের দিকে সংযুক্ত অ্যান্টিজেন নামক প্রোটিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এ অ্যান্টিজেন সাধারণত দু'ধরনের হয়, যথা– অ্যান্টিজেন- A এবং অ্যান্টিজেন- B। কোন একজন মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেন- A অথবা অ্যান্টিজেন- B অথবা অ্যান্টিজেন- A ও B উভয়ই উপস্থিত থাকতে পারে অথবা অ্যান্টিজেন- A ও B উভয়ই অনুপস্থিত থাকতে পারে।

মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিভাগ করেন তাকে রক্তগ্রুপ বা ABO রক্তগ্রুপ বলে।

ABO রক্তগ্রুপ পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষকে চারটি রক্তগ্রুপে বিভক্ত করা হয়, যথা–

(১) A রক্তগ্রুপ, (২) B রক্তগ্রুপ, (৩) AB রক্তগ্রুপ ও (৪) O রক্তগ্রুপ। নিম্নের ছকে এদের বিবরণ দেয়া হল–

১. রক্তগ্রুপ A: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন- A প্লাজমায় অ্যান্টিবডি- b থাকে।

২. রক্তগ্রুপ B: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন- B এবং প্লাজমায় অ্যান্টিবডি- a থাকে।

৩. রক্তগ্রুপ AB: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন A ও B উভয়ই থাকে কিন্তু প্লাজমায় কোন অ্যান্টিবডি থাকে না।

৪. রক্তগ্রুপ O: এদের RBC তে কোন অ্যান্টিজেন থাকে না। কিন্তু প্লাজমায় অ্যান্টিবডি a ও b উভয়ই থাকে।

রক্ত সঞ্চারণের পূর্বে অবশ্যই রক্তগ্রুপ নির্ণয় করে ক্রস ম্যাচিং করে নিতে হয়। তা না হলে বিভিন্ন উপসর্গসহ রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

নিম্নের ছকে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের রক্তগ্রুপ এবং রক্তদান ও রক্তগ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণ দেয়া হল–

রক্তগ্রুপ	RBC-র অ্যান্টিজেন	প্লাজমার অ্যান্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে
A	অ্যান্টিজেন- A	অ্যান্টিবডি- b	A, AB	A, O
B	অ্যান্টিজেন- B	অ্যান্টিবডি- a	B, AB	B, O
AB	অ্যান্টিজেন A ও B	নেই	AB	A, AB, B, O
O	নেই	অ্যান্টিবডি- a ও b	A, B, AB, O	O

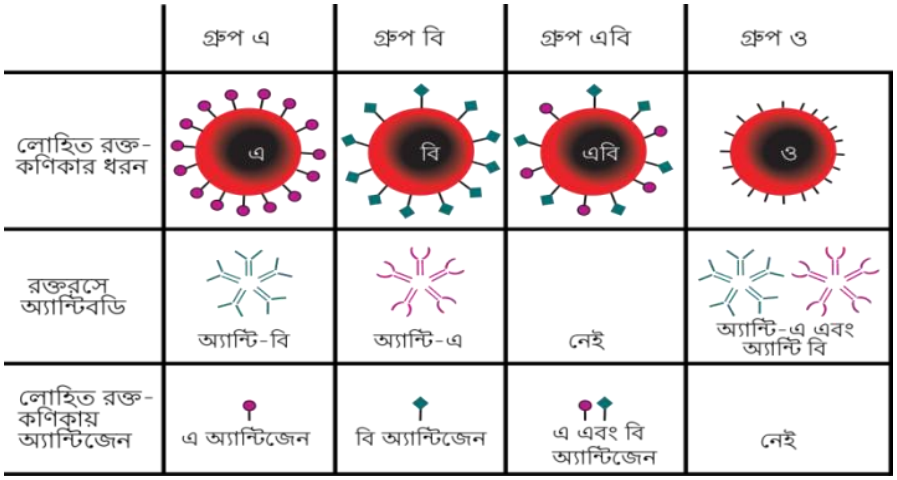

চিত্র : মানুষের রক্ত গ্রুপ

Rh রক্তগ্রুপ (RH Blood Group)

Karl Landsteiner এবং A. M. Wiener 1940 খ্রিস্টাব্দে রেসাস বানর *Macaca Mulatta*-এর লোহিত রক্তকণিকায় এক ধরনের অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন। এ অ্যান্টিজেনকে রেসাস অ্যান্টিজেন বা রেসাস ফ্যাক্টর বা Rh ফ্যাক্টর বলে। পরবর্তীতে এ দুজন বিজ্ঞানী মানুষের লোহিত রক্তকণিকায়ও এদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রায় ৮৫% মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় Rh ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকে। যে সব মানুষের RBC তে Rh ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকে তাদের রক্তগ্রুপকে Rh নেগেটিভ বা Rh-ve বলা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্তরস বা প্লাজমায় কোন Rh-অ্যান্টিবডি থাকে না যা Rh অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। কিন্তু Rh নেগেটিভ মানুষের দেহে Rh পজেটিভ মানুষের রক্ত সঞ্চারণ ঘটালে Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে Rh-অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তের লোহিতকণিকা ধ্বংস করে দেয়। AB+ve গ্রুপধারী মানুষকে সর্বজন গ্রহীতা বলে কারণ তারা যে কোন গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। অন্যদিকে O-ve গ্রুপধারী মানুষকে সর্বজন দাতা বলে কারণ তারা যে কোন গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে।

Rh- ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা

১. **রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রেঃ** Rh নেগেটিভ (Rh-ve) রক্তগ্রুপ বিশিষ্ট কোন রোগীর দেহে Rh পজেটিভ (Rh+ve) গ্রুপের রক্তের সঞ্চারণ ঘটালে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর রক্তের প্লাজমায় Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। ঐ রোগী যদি পরবর্তীতে কখনও Rh+ve গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করে তাহলে Rh-অ্যান্টিবডির প্রভাবে গৃহীত রক্তের লোহিত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এতে বিভিন্ন অসুবিধাসহ রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

২. **গর্ভ সঞ্চারণের ক্ষেত্রেঃ** Rh নেগিটিভ (Rh-ve) রুক্তগ্রুপ বিশিষ্ট মহিলার সাথে Rh পজেটিভ (Rh+ve) রক্তগ্রুপের কোন পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বংশগতভাবে Rh পজেটিভ (Rh+ve) অবস্থা Rh নেগেটিভ (Rh-ve) অবস্থার উপর প্রকট হওয়ায় এ দম্পতির প্রথম সন্তান Rh পজেটিভ (Rh+ve) হবে। এ শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের রক্তে Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। প্রথমবার গর্ভধারণকালে Rh-অ্যান্টিবডি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত না হওয়ায় শিশুর কোন ক্ষতি হয় না এবং এ শিশু জীবিত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে Rh+ve সন্তান ধারণকালে পূর্বে উৎপাদিত মায়ের রক্তের Rh-অ্যান্টিবডি অমরার মাধ্যমে ভ্রূণে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের লোহিত রক্তকিণকাগুলো ধ্বংস করতে থাকে। এতে ভ্রূণের বা সদ্যোজ্যাত শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। এ অবস্থাকে হিমোলাইটিক ডিজিস অব নিউবর্ণ (HDN) বা এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলে।

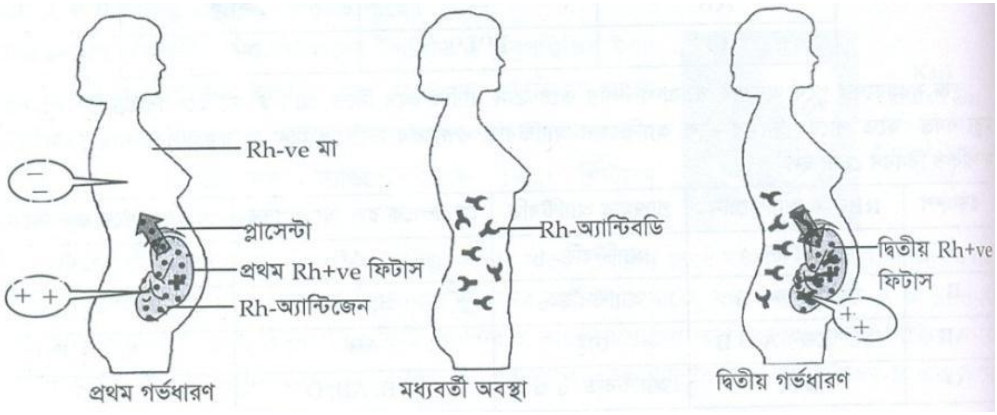

চিত্র: গর্ভ সঞ্চারণে Rh-ফ্যাক্টরের এর গুরুত্ব

প্রশ্নমালা

১. রক্ত কী? রক্তের প্রধান উপাদানগুলো কি কি?

২. অণুচক্রিকার কাজ কী?

৩. রক্ত কণিকাগুলোর চিহ্নিত চিত্র অংকন করুন।

৪. ছক আকারে রক্তের বিভিন্ন উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।

৫. রক্তের বিভিন্ন গ্রুপের বৈশিষ্টগুলো লিখুন।

৬. মানবদেহের রক্তদানের ক্ষেত্রে রক্ত নির্বাচন গুরুত্বপুর্ণ কেন- ছক আকারে লিখুন।

৭. মানবদেহের হৃদপিন্ডের রক্ত সংবহনের একটি (→ চিহ্ন দিয়ে) চিহ্নিত চিত্র অংকন করুন।

৮. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়? ধমনি ও শিরার প্রধান কাজ কী?

৯. কাজ: শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিম্নে উল্লিখিত ছকটি পূরণ করবে। সময় ১০ মিনিট। শিক্ষকের নির্দেশানুযায়ী দলগতভাবে উপস্থাপন করবে।

কপাটিকাগুলোর নাম	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য	কাজ
১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মিট্রাল ভাল্‌ব			
২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা			
৩. অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা			
৪. পালমোনারী সেমিলুনার কপাটিকা			
৫. ইউস্টেশিয়াল কপাটিকা			

References:

1. Verma PS, Agarwal VK, 1982. Genetics, Fourth edition, S. Chand & Company ltd. Publishers, Ram Najar, New Delhi-110055.

৩. আলীম এম এ, ২০১৮. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, তৃতীয় সংস্করণ, মুবীন পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (নিচতলা), ঢাকা-১১০০।

৪. বেগম হাবিবা, ২০১৮. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (ফাস্ট ফ্লর), ঢাকা-১১০০।

ইউনিট ১১ : খাদ্য পুষ্টি, পরিপাক ও শোষণ

সুষ্ঠুভাবে জীবন প্রবাহ পরিচালনার জন্য প্রতিটি জীব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায়। এই কাজের জন্য জীবের খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্য শক্তি ও তাপ যোগায়, তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য ভিন্ন। উদ্ভিদ তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীর বৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য মাটি ও পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। একই ভাবে দেহকে সুস্থ্য ও সবল, কর্মক্ষম রাখতে, দেহের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। পুষ্টির অভাবে দেহে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়া মানবদেহের খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও নানা সমস্যা দেখা দেয়। সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য খাদ্য পুষ্টি সম্বন্ধে যেমন সম্যক জ্ঞান থাকবে তেমনি খাদ্য কিভাবে পরিপাক হবে, পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা সহ আন্ত্রিক সমস্যাগুলোর কিছুটা ধারণা থাকবে। যাতে করে বাস্তব জীবনে নিজেদের স্বচ্ছ ধারণা কাজে লাগানো যাবে। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

১১.১: পুষ্টি উপাদানে শক্তি; বিএমআই (BMI) এবং বিএমআর (BMR)
১১.২: মুখগহ্বরে, পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশে ও ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক
১১.৩: পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা, বিভিন্ন ধরনের আন্ত্রিক সমস্যা

১১.১: পুষ্টি উপাদানে শক্তি; বিএমআই (BMI) এবং বিএমআর (BMR)

পুষ্টি উপাদানে শক্তি

খাদ্য আমাদের পুষ্টি ও শক্তি দেয়। তবে কী পরিমাণ খাদ্য উপাদান থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাই? আবার পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ কত? আমরা জানি, খাদ্যের উপাদান ছয়টির মধ্যে শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বি জাতীয় উপাদানই কেবল শক্তি দিতে পারে। বাকি তিনটি উপাদান শক্তি দিতে পারে না। শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে– তাপশক্তি। পুষ্টিবিদগণ একে ক্যালরি বলে থাকেন।

আমাদের দেহের মাংসপেশির সংকোচন ও সম্প্রসারণের উপর শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। অন্যদিকে আমরা যদি কোন কাজ না করি, তবুও আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, ক্ষুধা লাগে, বিশ্রামরত অবস্থায়ও শক্তি খরচ হয়। বিশ্রামাবস্থায় আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ না করলেও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদপিন্ড অর্থাৎ জৈবিক কার্যক্রম চলে । এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলোর সংকোচন প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত হয়। তখনই শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলবিপাক শক্তি বলে। সুতরাং একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তা প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা–

- মৌলবিপাক
- দৈহিক পরিশ্রমের উপর
- খাদ্যের প্রভাব।

এ ছাড়া শারীরিক বৃদ্ধি, অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

বিএমআর (BMR) এবং বিএমআই (BMI)

পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় Basal Metabolic Rate(BMR) মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে। আর Body Mass Index (BMI) মানবদেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে। অর্থাৎ কোনো নিদিষ্ট বয়সে সুস্থ জীবন যাপনের জন্য শরীরের দৈর্ঘ্যের সাথে ওজনের পরিমানগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দুটি খুবই উপযোগী।

বিএমআর (BMR) এর মান নির্ণয়

বিএমআর এর মান বের করা কঠিন। হ্যারিস বেনেডিক্ট সূত্রটি ব্যবহার করে লিঙ্গ ও বয়স ভেদে এর পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন–

মেয়েদের বিএমআর= ৬৫৫+ (৯.৬×ওজন কেজি) + (১.৮×উচ্চতা সেমি) − (৪.৭×বয়স বছর)
ছেলেদের বিএমআর= ৬৬+ (১৩.৭×ওজন কেজি) + (৫×উচ্চতা সেমি) − (৬.৮×বয়স বছর)

যেমন ধরা যাক,

একজন মহিলার বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা ১৬৫ সেমি, ওজন ৯৪ কেজি

∴ তার = ৬৫৫+ (৯.৬×৯৪) + (১.৮×১৬৫=) − (৪.৭×৩৩)
= ৬৫৫ + ৯০২.৪ + ২৯৭ − ১৫৫.১
= ১৬৯৯.৩ ক্যালরি

বিএমআর ও ব্যয়িত শক্তির সম্পর্ক

বিএমআর মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। দৈহিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআর এর মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। এই বিএমআর আমাদের শরীরে ৬০-৭৫ ভাগ শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মাত্র ১০-২০ শতাংশ ও শ্রমের মাধ্যমে ২০-৩০ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিএমআর এর মান কমতে থাকে। তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমান না কমিয়ে যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাতে বিএমআর মান বেড়ে যাবে এবং স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায়।

বিএমআই মান নির্ণয়

বিএমআই = দেহের ওজন (Kg)/দেহের উচ্চতা (মিটার)^২

মান নির্দেশিকা

১৮০৫ এর নিচে শরীরের ওজন কম, (পরিমিত খাদ্য গ্রহণে ওজন বাড়াতে হবে)।
১৮.৫–২৪.৯ সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান
২৫-২৯.৯ শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ব্যায়াম করে ওজন কমানো দরকার)
৩০-৩৪.৯ মোটা হওয়ার প্রথম স্তর (পরিমিত খাবার ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন)
৩৫-৩৯.৯ মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর (পরিমিত খাবার ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন)
৪০ এর উপরে অতিরিক্ত মোটাত্ব, (মৃত্যু ঝুঁকির সম্ভাবনা, ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন)

[সাধারনত: সুস্বাস্থ্যের জন্য ৩৮ কেজি ওজন থাকা প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুষ্টি গ্রহণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে মানসম্মত মানে নিয়ে যেতে হবে।]

১১.২: মুখগহ্বরে, পাকস্থলীর বিভিন্ন অংশ ও ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য পরিপাক

পরিপাকতন্ত্র: মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষগুলোকে কার্যকর রাখতে সময় মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল ও জৈব অবস্থায় গ্রহণ করা হয় বলে কোষগুলো তা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যকে শোষনযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে রূপান্তরিত করা আবশ্যক।

মানবদেহে পরিপাক ও পরিশোষণ মূলত পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটি একটি স্বতন্ত্র তন্ত্র। অতএব যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ভেঙ্গে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিনত হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও কয়েকটি গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত এবং মুখ থেকে শুরু করে পায়ুতে শেষ হয়। পরিপাকনালি মুখছিদ্র থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ নালিবিশেষ যা কোথাও থলির ন্যায় স্ফীত কোথাও কুন্ডুলীকৃত। এর প্রধান অংশগুলো হলো: মুখছিদ্র, মুখবিবর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলী, অন্ত্র (ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র) ও পায়ু।

খাদ্য মানবদেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে এবং স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখে। খাদ্যের অভাবে যেমন পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ দেখা দেয় তেমনি অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ শরীরে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি করে।

মানুষ সর্বভুক প্রাণী। এদের খাদ্য তালিকায় আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি-এ ছয় ধরনের খাদ্যই অন্তর্ভুক্ত। তবে ভিটামিন, পানি ও খনিজ লবণ কোষ কর্তৃক সরাসরি গৃহীত হয় বলে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য জটিল বিধায় এগুলোকে পরিপাকের প্রয়োজন হয়।

মানব পরিপাকতন্ত্র প্রতিদিন ভক্ষণকৃত জটিল খাদ্য দেহের গ্রহণযোগ্য সরল খাদ্যে রূপান্তর করার উপযোগী করে। কতগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সঞ্চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য পরিপাক নালীর ভেতরে প্রবাহিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে। অন্যদিকে কতগুলো ধারাবাহিক বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সরল ও গ্রহণ উপযোগী ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

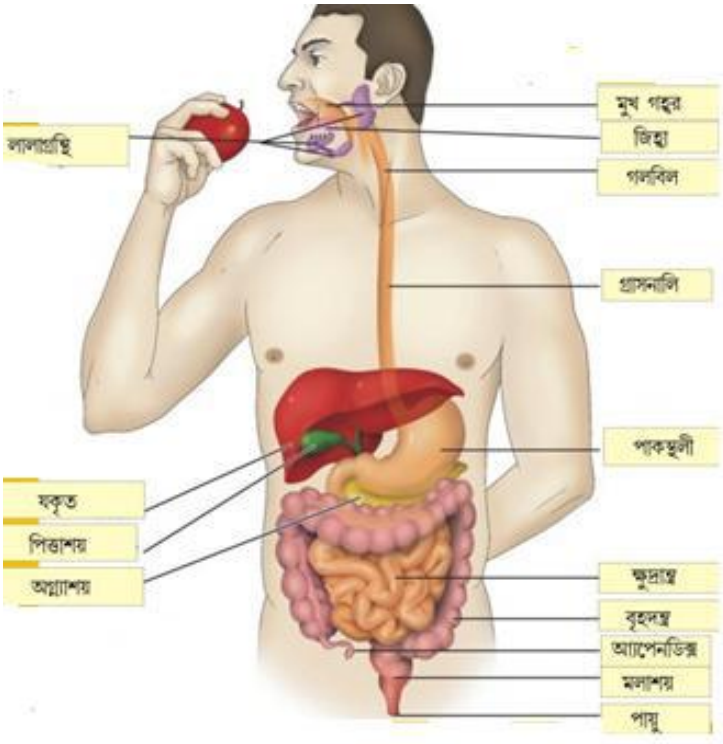

চিত্র : মানব পরিপাকতন্ত্রের গঠন

মুখবিবরে খাদ্য পরিপাক

যান্ত্রিক পরিপাক: খাদ্যবস্তু মুখবিবরে প্রবেশ করলে দাঁতের সাহায্যে চর্বিত হয় ও লাল মিশ্রিত হয়। লালা মুখবিবরকে সর্বদা আর্দ্র রাখে। এটি খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে এবং চর্বণের সময় লুব্রিকেন্ট হিসেবে কাজ করে। লালা মিশ্রিত পিন্ডাকৃতির খাদ্য জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে গলবিলের মাধ্যমে পেছনের অন্ননালীতে প্রেরিত হয়।

রাসায়নিক পরিপাক

ক. শর্করা পরিপাক: লালারসে বিদ্যমান শর্করা বিশ্লেষী এনজাইম টায়ালিন ও ম্যাল্টেজ দ্বারা জটিল শর্করা ম্যাল্টোজে এবং সামান্য ম্যাল্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়।

$$\text{জটিল শর্করা} \xrightarrow{\text{টায়ালিন}} \text{ম্যাল্টোজ}$$

$$\text{ম্যাল্টোজ} \xrightarrow{\text{ম্যাল্টেজ}} \text{গ্লুকোজ}$$

খ. আমিষ পরিপাকঃ মুখবিবরে আমিষ খাদ্য চর্বিত ও লালা মিশ্রিত হয়ে পিচ্ছিল ও নরম হয়। কিন্তু এখানে কোন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম না থাকায় আমিষ খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

গ. স্নেহ পরিপাকঃ মুখবিবরে স্নেহ জাতীয় খাদ্য পরিপাকের কোন এনজাইম থাকে না। এখানে খাদ্য চর্বিত ও লালা মিশ্রিত হয়ে নরম হয়।

পাকস্থলীঃ খাদ্যবস্তু অন্ননালী হতে পাকস্থলীতে প্রবেশের পর প্রতি ১৫-২০ সেকেন্ড পরপর পাকস্থলীর প্রাচীরে একটি পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালন প্রবাহিত হয়। এ ধরনের সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর গ্রন্থি নিঃসৃত পরিপাক রসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং নরম, পিচ্ছিল হ্রাস প্রাপ্ত খাদ্যপিন্ড কাইমে পরিণত হয়। পাকস্থলীর পরিপাক রসে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা খাদ্য জীবাণুমুক্ত এবং অম্লীয় হয়। এ সময় পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালন মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যকে পাকস্থলীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে কয়েকবার সামনে পেছনে সঞ্চালিত করে। এ সঞ্চালনের ফলে খাদ্যবস্তু পরিপাক রসের সাথে ভালোভাবে মিশ্রিত হয়ে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত হয়। এ ঘটনাকে পাকস্থলীর যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

রাসায়নিক পরিপাক

ক. শর্করা পরিপাকঃ পাকস্থলীতে শর্করা বিশ্লেষী কোন এনজাইম থাকে না। এজন্য এখানে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিপাক ঘটে না।

খ. আমিষ পরিপাকঃ চিবানো ও লাল মিশ্রিত আমিষ খাদ্য পাকস্থলীর গহ্বরে পৌঁছালে পাকস্থলীর প্রাচীর হতে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলীর প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয়। এ রসে পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম থাকে। এ দুটি নিষ্ক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক রসের হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে পেপসিন ও রেনিন নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে প্রোটিওজ ও পেপটোনে পরিণত করে। রেনিন দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।

আমিষ + পানি —পেপসিন→ প্রোটিওজ + পেপটোন

দুগ্ধ কেসিন + পানি —রেনিন→ প্যারাকেসিন

প্যারাকেসিন —পেপসিন→ পেপটোন

চিত্র : পরিপাক নালির সাথে সম্পর্কিত পরিপাক গ্রন্থিসমূহ

ক্ষুদ্রান্ত্র

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ও শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে।

যান্ত্রিক পরিপাকঃ ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের দু'ধরনের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। প্রথমত এখানে খাদ্যের সেগমেনটেশন ঘটে অর্থাৎ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের সুনির্দিষ্ট খণ্ডের মধ্যে সামনে-পেছনে সঞ্চালিত হয়। এতে আন্ত্রিক রস ও মিউকাসের সাথে খাদ্য ভালোভাবে মিশ্রিত হয়। দ্বিতীয়ত পেরিস্ট্যালটিক সঞ্চালনের মাধ্যমে কাইম জাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ধীরভাবে প্রভাহিত হয়। খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে কারণ এর ভেতর দিয়ে কাইম প্রতি মিনিটে এক সেন্টিমিটার গতিতে সঞ্চারিত হয়।

ক. শর্করা পরিপাকঃ অন্ত্রের ডিওডেনামে বিদ্যমান অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় শর্করাই ডাইস্যাকারাইড ও কিছু ডাইস্যাকারাইডকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

স্টার্চ $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ ডাইস্যাকারাইড

গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ ডাইস্যাকারাইড

ডাইস্যাকারইড $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেটিক এজাইম}}$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

অন্ত্রের ইলিয়ামের বিদ্যমান আন্ত্রিক রসের অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইমসমূহ সকল ডাইস্যাকারাইডকে নিম্নোপায়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে গ্লুকোজে পরিণত করে।

ম্যান্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ম্যাল্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্লুকোজ

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

ইনভারটোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ইনভারটেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ

ল্যাকটোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ

খ. আমিষ পরিপাকঃ অগ্ন্যাশয় রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ট্রেপসিন, কাইমোট্রিপসিন, কার্বোক্সিপেপটাইডেন, ট্রাইপেপটাইডেজ, ডাইপেপটাইডেজ, কোলাজিনেজ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এরা আমিষ খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে–

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপলিস / কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইজেড}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম ইরেসসিন থাকে। এটি ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ইরেপসিন}}$ অ্যামিনো অ্যাসিড

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়েজ (DNase) এবং রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase) এনজাইমের ক্রিয়ায় যথাক্রমে DNA ও RNA পরিপাক হয়ে এদের মনোনিউক্লিওটাইড অণু সৃষ্টি করে।

গ. স্নেহ পরিপাকঃ স্নেহ পরিপাকে পিত্তরস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে বিদ্যমান পিত্তলবণ সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (Sodium Taurocholate) ও সোডিয়ায়াম টাউরোকোলেট (Soudium Glycocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে সাবানের ফেণার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে ইমালসিফিকেশণ (Imulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ ও কোলেস্টেবল এস্টারেজ থাকে। এরা স্নেহদানাকে নিম্নরূপে পরিপাক করে–

চর্বি $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসায়ল

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও কোলেস্টেরল

আন্ত্রিক রসে স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজ ও লেসিথিনেজ থাকে। এরা স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে–

ট্রাইগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড ও মনোগ্লিসারাইড

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{সেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক অ্যাসিড + কোলি

খাদ্যসার শোষণ (Absorption of Food)

যে প্রক্রিয়ায় পরিপাককৃত খাদ্যসার পরিপাকনালী হতে রক্তে ও লসিকায় প্রবেশ করে তাকে খাদ্যসার শোষণ বলে। খাদ্যসার শোষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। পরিপাককৃত অধিকাংশ খাদ্যসার, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির সাথে ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেনে সক্রিয় পরিবহন বা ব্যাপন কিংবা এন্ডোসাইটোসিন পদ্ধতিতে শোষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ৯০% শোষণ ঘটে ক্ষুদ্রান্ত্রে, বাকী ১০% সংঘটিত হয় বৃহদান্ত্র ও পাকস্থলীতে। বিভিন্ন হরমোন দ্বারা খাস্যসার শোষণ নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসার শোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হল–

ক. **শর্করা শোষণঃ** শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ, জাইলোজ, লেবুলোজ, ম্যানোজ প্রভৃতি সরল মনোস্যাকারাইডে পরিণত হয়। ইনসুলিন ও গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. **আমিষ শোষণঃ** আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও জেজুনাম অংশের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা সক্রিয় শোষণ, ব্যাপন ও পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড শোষিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত থাইরক্সিন হরমোন আমিষ শোষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. **লিপিড শোষণঃ** লিপিড জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লিসারল, মনোগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড ও কোলেস্টেবল-এ পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনাম ও ইলিয়াম অংশে লিপিড শোষণ ঘটে। গ্লিসারল পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় সরাসরি ভিলাইয়ের প্রাচীর ভেদ করে পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে।

ঘ. **খনিজ লবণ শোষণঃ** বৃহদান্ত্রের ভিলাই প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অধিকাংশ খনিজ লবণ শোষিত হয়।

ঙ. **ভিটামিন শোষণঃ** ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাই কর্তৃক পানি বা চর্বিতে দ্রবীভূত হয়ে ভিটামিন শোষিত হয়।

খাদ্যসার পরিবহনঃ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসার অন্ত্রের ভিলাইয়ের এপিথেলিয়াল কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ভিলাসের অভ্যন্তরে থাকে কৈশিক জালিকা (Capillaries), লসিকাতন্ত্রের ল্যাকটিয়েল (Lacteal)। গ্লুকোজ ও অ্যামিনো অ্যাসিড ভিলাসের কোষ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কৈশিকনালীতে আসে। অতঃপর এরা হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে আসে এবং যকৃত থেকে হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসায়ল ভিলাসের কোষ থেকে ল্যাকটিয়েলে প্রবেশ করে। ল্যাকটিয়েল থেকে থোরাসিক লসিকা নালির মাধ্যমে বাহিত হয়ে শিরাতন্ত্রের রক্ত প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে হৃৎপিন্ডে আসে এবং দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়

১১.৩ : পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা এবং বিভিন্ন ধরনের আন্ত্রিক সমস্যা

মানবদেহে পরিপাক ও শোষণ পরিপাকতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিপাকতন্ত্র পোষ্টিক নালী ও পরিপাক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। পরিপাক নালী মুখছিদ্র থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ নালিকা বিশেষ যা কোথাও থলির ন্যায় স্ফীত কোথাও বা কুন্ডুলীকৃত। এই পরিপাক নালীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খমন প্রোটিন, স্নেহ ও শর্করা, দ্রবনীয়, অদ্রবর্ণীয় ইত্যাদি খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি সাধন, কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এমনকি তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় হরমোন ও স্নায়ুতন্ত্রের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পরিপাকে স্নায়ুর ভূমিকা

যে তন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করে এবং তাদের কাজে সুসংবদ্ধতা আনায়ন ও শারীর বৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।
স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ দেহের বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অংশের কাজের মধ্যে যোগসূত্র এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। পরিপাকের ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরিপাকে নালা গ্রন্থি থেকে যে লীলারস ক্ষরিত হয় তা সম্পূর্ণরূপে স্নায়ুবিক পদ্ধতি। মস্তিষ্কের মেডুলা অঞ্চলে লালাকেন্দ্র অবস্থিত। লালাগ্রন্থির নিঃসরণে সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক উভয় স্নায়ুতন্ত্রই কার্যকরী থাকে। খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে দুই ধরনের স্নায়ুর ভূমিকা রয়েছে।

১. ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস: পরিপাকতন্ত্রের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাসকে এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্র (Enteric Nervous System) বা অন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। এগুলো পৌষ্টিকনালীর অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের প্রাচীরে ঘন সন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থাকে। এগুলো পৌষ্টিকনালীর ভেতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। দুই ধরনের ইনট্রিনসিক প্লেক্সাস পরিপাকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের একটি হল মায়েনটারিক প্লেক্সাস (Myenteric Plexus) যা পরিপাকতন্ত্রের মসৃণ পেশীগুলোর সঙ্কোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি হল সাবমিউকোসাল প্লেক্সাস (Submucosal Plexus) যা পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্র খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও পরিমাণ দেখে এর সাড়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিবর্তন করতে পারে।

২. এক্সট্রিনসিক প্লেক্সাসঃ এগুলো পৌষ্টিকনালীর বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। এরা পরিপাকতন্ত্রের দীর্ঘ প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- খাদ্যের ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ গ্রহণ করে কিংবা খাদ্য দেখে খাদ্যের প্রতি সাড়া দেয়া। এক্সট্রিনসিক স্নায়ুগুলো স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথেটিক শাখা হতে আসে। এরা অ্যাসিটালকোলিন (Acetylcholine) এবং অ্যাডরেনালিন (Adrenaline) নামক রাসায়নিক পদার্থ মুক্ত করে। অ্যাসিটালকোলিন পোষ্টিকনালীর ভেতর দিয়ে খাদ্য ও পানীয় দ্রুত প্রবাহিত হতে শক্তি প্রয়োগ করে। এছাড়া এটি পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয় হতে অধিক পরিমাণ পাচক রস নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে। অ্যাডরেনালিন পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীকে শিথিল করে এবং এসব অঙ্গে রক্ত প্রবাহ মন্থর করে।

বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের বৃহদন্ত্রের প্রাচীরে বিদ্যমান স্নায়ুজালিকা খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাকে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এন্টেরিক স্নায়ুতন্ত্রকে বিজ্ঞানীগণ মানুষের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক (Second Brain) নাম দিয়েছেন। কেননা এটি একদিকে যেমন মস্তিষ্কে উদ্দীপণা প্রেরণে সক্ষম অন্যদিকে তেমনি পরিপাকতন্ত্রের হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিপাকনালিতে খাদ্য চলাচল, মানুষের ক্ষুধা ও তৃপ্তি অনুভব ইত্যাদি অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম।

পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব হরমোন ক্ষরণ ব্যহত হলে পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্নতা ঘটে। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলী ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এগুলো রক্তে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তনালী দিয়ে হৃৎপিন্ডে পৌঁছে এবং সেখান থেকে ধমনীর মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে ফিরে আসে এবং যেখানে এরা বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কার্যকে উদ্দীপিত করে। খাদ্যের পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলো হলো–

১. **গ্যাস্ট্রিন (Gastrin):** পাকস্থলীর প্রাচীর হতে গ্যাস্ট্রিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলীর প্রাচীরে বিদ্যমান গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি হতে গ্যাস্ট্রিক রস এবং পাকস্থলীর প্রাচীর হতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। এছাড়া পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও কোলনের অন্তঃআবরণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ হরমোনের ক্ষরণ অপরিহার্য।

২. **সিক্রেটিন (Secretin):** অন্ত্রের প্রাচীর থেকে সিক্রেটিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। এছাড়া এটি পাকস্থলীর প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

৩. **কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin):** ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে কোলেসিস্টোকাইনিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এছাড়া এটি পিত্তথলি থেকে পিত্তরস বের হতে উদ্দীপনা প্রদান করে।

৪. **এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin):** ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এ হরমোনের প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাকটেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৫. **পেপটাইড YY (Peptide YY):** ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভেতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৬. **গ্যাস্ট্রিক ইনহ্যাবিটরি পেপটাইড (Gastric Inhibitory Pepide- GIP):** ডিউডেনামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি পাকস্থলী থেকে খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

আন্ত্রিক সমস্যা

শোষিত খাদ্য বস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করার পদ্ধতি হলো **আন্ত্রিকরণ**। এটা একটি গঠনমূলত বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন– অ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল রক্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানের প্লোটোপ্লাজমা নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্নেহ ও শর্করা তৈরি হয়। ফলে প্লোটোপ্লাজম কোষের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে। এতে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

আন্ত্রিক সমস্যার কারণে কখনও কখনও নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়, যেমন–

অজীর্ণতা: একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন– পাকস্থলিতে সংক্রমণ, বিষন্নতা, অগ্ন্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা, এনজাইমের ঘাটতি, ডায়োবেটিস ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হয়, বুক জালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক ঢেঁকুর উঠা ইত্যাদি অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলি বা অন্ত্রের আলসারের কারণে হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো– অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে উত্তমরূপে খাবার চিবিয়ে খাওয়া, ধুমপান পরিহার করা। প্রয়োজনে কারণ নির্ণয় করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা।

আমাশয়ঃ Entamoeba Histolytica নামক এক প্রকার প্রটোজোয়া অথবা সিগেলা নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আমাশয় হয়।

ঘন ঘন মল ত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষামুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া ও দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো– বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমুল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান বা ছাই দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালা-বাসন উত্তরূপে ধুয়ে নেওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সময় মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্যঃ এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় অথবা দুই বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয় না এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে হাতে পারে, যথা– পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, কোলন অপ্রাচ্য খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষণ করলে, পৌষ্টিক নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ্য অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে, পরিশ্রম না করলে, আন্ত্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি আস্তে আস্তে সংকুচিত হলে, আঁশযুক্ত খাবার না খেলে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্থিকর অবস্থা, পেট ব্যাথা ও নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো– আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল, নারকেল, খেঁজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, চা, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটা, চলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

গ্যাস্ট্রিক আলসারঃ আলসার হলো পাকস্থলির বা অন্ত্রের প্রদাহ বা ক্ষত। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্য গ্রহণে অনিয়ম হলে পাকস্থলিতে অম্লের আধিক্য ঘটে। অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে পাকস্থলি বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে।

এ রোগে পেটের ঠিক মাঝখানে একঘেয়ে ব্যথা অনুভব হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যাথা বাড়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনও কখনও বমি ও মলের সাথে রক্ত নির্গত হয়। এন্ডোসকপি বা বেরিয়াম এক্স-রে এর মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ প্রতিকার করতে হলে যা করতে হবে তা হলো– নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল ও মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটোনো দুধ, চিনি, পনির এবং কলা খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কপি, সিগারেট ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অ্যাপেনডিসাইটিসঃ পেটের ডানদিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স যুক্ত থাকে। এটি আঙ্গুলের আকারের একটি থলে। অ্যপেনডিক্স-এর সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এই রোগে নাভীর চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তার নিচের ডানদিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি ও প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্সের অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কৃমি জনিত রোগঃ কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষক দেহে বাস করে। মানব দেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রে গোল কৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতা কৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটের ব্যথা দুর্বল বোধ করা, বদহজম, পেটে অস্বস্তিবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় অরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত-পাওয়া ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় কৃমি মলের সাথে বা নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কিনা তা জানা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমি নাশক ঔষধ সেবন করতে হবে।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা অথবা মাছি দ্বারা খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। খাওয়ার আগে হাত উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাটা এবং অল্পসিদ্ধ শাকসব্জী বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি অবলম্বন করে কৃমিজনিত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডায়রিয়াঃ যদি দিনে অন্তত তিন বার পাতলা পায়খানা হয় তবে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সাধারণত শিশুরা ডায়রিয়ায় বেশি ভোগে। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি ও লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এসময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বার বার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া কুচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়রিয়া রোগের উপসর্গ। এসময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমত খেতে চায় না, কাঁদলে শিশুর মাথার চাঁদী বা তালু বসে যায়, আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি-পচা, নোংরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা-বাসন ব্যবহার করলে, অপরিষ্কার হতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো– পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বমি হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুধ খাওয়ানো, রোগীকে নিয়মিত অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরও অন্তত এক সপ্তাহ রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর

১. পুষ্টি কী ?
২. খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎসগুলো কী কী?
৩. উপাদান অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুতকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং ভাগগুলো কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানবদেহের পোষ্টিকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
২. পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, আমিষ, শর্করা ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক বর্ণনা করুন।
৩. মানবদেহের পোষ্টিকতন্ত্রের সৃষ্ট আন্ত্রিক সমস্যাগুলোর বর্ণনা দাও।
৪. পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

References :

1.Verma PS, Agarwal VK, 1982. Genetics, Fourth edition, S. Chand & Company ltd. Publishers, Ram Najar, New Delhi-110055.

২.আলীম এম এ, ২০১৬. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, তৃতীয় সংস্করণ, মুবীন পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (নিচতলা), ঢাকা-১১০০।

৩.বেগম হাবিবা, ২০১৭. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (ফাস্ট ফ্লর), ঢাকা-১১০০।

ইউনিট ১২ : জীনতত্ত্ব ও জীব প্রযুক্তি (Genetics & Biotechnology)

পৃথিবীতে প্রত্যেকটি প্রাণীর অন্যতম মৌলিক চাহিদা হল প্রজনন। প্রজননের মাধ্যমেই সে তার নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে। তাই নতুন প্রজন্মের আকার আকৃতি অনেকটা তার পিতামাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে। অর্থাৎ পিতামাতার নিকট হতে কিছু তথ্য/বৈশিষ্ট্য তাঁর পরবর্তী বংশধরে প্রবেশ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত শুক্রানু ও ডিম্বানুর মিলনের ফলেই স্থানান্তর ঘটে। তাই বলা যায় যে, The tendency of individuals to rembel their progenitor is called heridity অর্থাৎ সন্তান-সন্তনাদি তাদের পিতা-মাতার মত হওয়ার যে প্রবণতা তাকে বংশগতি বলে।

বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরে কোষের নিউক্লিয়াসের ভূমিকা অন্যতম। নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়প্লাজমে সুতার ন্যায় গঠন লক্ষ্য করা যায়। এগুলোকে ক্রোমাটিন তন্ত বলে। এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো কোষ বিভাজনের সময় মোটা ও স্পষ্ট হয়। এই মোটা তন্তু গুলোকে ক্রোমোজোম বলে। ক্রোমসোমের ক্ষুদ্রতম একক হল DNA । DNA এর ক্ষুদ্রতম অংশই হল জিন। যার মাধ্যমে বংশগতির বৈশিষ্ট্য গুলো পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়। তাই DNA কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

DNA অনুর একটি খন্ডিত অংশই হলো জিন (Gene)। 1953 সালে Watson ও Cric এর DNA অনুরগঠন আবিস্কারের মধ্যদিয়ে জীব বিজ্ঞানের জিনতত্ত্ব একটি আলাদা স্থান লাভ করে। পূর্বে ল্যামার্ক, ডারউইন এর মত প্রকৃতি বিজ্ঞানী তাদের বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে এক প্রজন্মের সাথে অন্য প্রজন্মে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুজে বেড়াতেন। এই সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্যগুলোকে অনেকে একে প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত, বা অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত বলে অভিহিত করেন। এ অধ্যায়ে নিম্নের বিষয় আলোচনা করা হবে-

১২.১ বংশগতির ধারণা ও মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স(মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র),লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি,
১২.২ বিবর্তনের ধারণা ও প্রমাণাদি
১২.৩ জীব প্রযুক্তি

১২.১ বংশগতির ধারণা ও মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স (Concepts of Genetics & Mendelian Inheritance)

বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) ছিলেন অস্ট্রিয়ারবাসী একজন ধর্মযাজক ও শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন মটরশুঁটি উদ্ভিদের সংকরায়ন ও বংশগতি সম্পর্কিত গবেষণা ও নির্ধারনের পরীক্ষা নিরিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি তার গবেষণা লব্ধ-ফলাফল Experiments on plant hybridization শিরোনামে Burn Natural Science Society এর বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞানীগণ এর তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। প্রায় দীর্ঘ ৩৪ বছর এর ফলাফল ধামাচাপা পড়ে থাকে। মেন্ডেলের মৃত্যুর ১৬ বছর পর হলান্ডের বিজ্ঞানী হুগো দ্যা ভ্রিম জামার্নির অধ্যাপক কার্ল কবেন্স এবং অস্টিয়ার বিজ্ঞানী এরিখ ভন চেরমার্ক মেন্ডেলের গবেষণার যথার্থতা পুনরাবিস্কার করেন। এর ফলে বিজ্ঞানী মেন্ডেলার গবেষণা কর্ম স্বীকৃতি লাভ করে এবং তার মূল গবেষণা পত্রটি Flora জার্নালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এসব অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে জিনতত্ত্বের জনক বলা হয়। ১৯৫৩ সালের DNA আবিস্কার তার গবেষণা সংক্রান্ত ফুলাফলের ব্যাখ্যাগুলোকে সহজতর এবং বোধগম্য করে তুলে। শুরু হয় জিনতত্ত্ব নামক অধ্যায়ের পথচলা।

গ্রিকশব্দ Genesis হতে Genetics শব্দের উৎপত্তি হয়। যার অভিধানিক অর্থ to become, বা (to grow into) অর্থাৎ প্রকাশ পাওয়া বা উদ্ভুত হওয়া। Wiliam Bateson (1906) খ্রি. সর্বপ্রথম Genetics শব্দটি ব্যবহার করেন। জীববিজ্ঞানের যে শাখায়, কিভাবে জিবের বংশগতিয় বৈশিষ্ট্য এক বংশধর হতে পরবর্তী বংশধরে স্থানন্তারিত হয়, কীভাবে জীবদের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, প্রকরণ সৃষ্টি হয় তার নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়নণ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা করা হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা বলে।

বিজ্ঞানী গ্রেগব জোহান মেন্ডেল তার গবেষণা চলাকালীন সময়ে মটরশুঁটি গাছের প্রথমে একজোড়া ও পরবর্তীতে দুই জোড়া বিপরিত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রেখে সংকরায়ণ করেন। এ অনুযায়ী তিনি একটি ১ম ও ২য় সূত্র নামে অভিহিত করেন।

মেন্ডেলের ১ম সূত্র (Mendel's 1st Law)

একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রসে সৃষ্ট সংকর জীবে বিপরিত বৈশিষ্ট্যের মোটরগুলোর (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামিট (জনন কোষ) সৃষ্টির সময়। এগুলো পরস্পর হতে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করে। মেন্ডেলের এ সূত্রকে পৃথকীকরণ সূত্র বা মনোহাইব্রিড ক্রস বা জনন কোষ শুদ্ধতার সূত্র বলে।

[Mendel's First Law of Inheritance The Law of Segregation or Law of Purity of gamales State that in a heterozygote a Dominant and recessive alleles remain together throughout their life without contamination or mixing with each other and finally separate or segregate from catch other during gametogenesis, so that eatch gamate receives only onle allele either dominant or recessive]

ব্যাখ্যা ঃ বিজ্ঞানী মেন্ডেল তার এ মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি উদ্ভিদের সাথে একটি বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি উদ্ভিদের ক্রোস ঘটান। তিনি ধরে নিয়েছেন,

লম্বা মটরশুঁটির জন্য দায়ি জিন T

লম্বা মটরশুঁটির জিনোটাইপ TT

খাটো মটরশুঁটির জন্য দায়ি জিন t

খাটো মটরশুঁটির জিনোটাইপ tt

সংকরায়ণঃ

বিশুদ্ধ লম্বা x বিশুদ্ধ খাটো ♀

♂ জিনোটাইপ → TT tt

গ্যামিট (T) (t)

১ম (F_1) বংশধর ⟶ Tt (অবিশুদ্ধ লম্বা/হেটারজাইগাস)

F1 বংশধরে প্রাপ্ত মটরশুঁটি গাছগুলোর মধ্যে তিনি পুনরায় সংকবায়ন ঘটান এবং নিমোক্ত ফলাফল পান।

অবিশুদ্ধ লম্বা x অবিশুদ্ধ লম্বা ♀

♂ জিনোটাইপ Tt Tt

গ্যামিট (T) (t) (T)(t)

২য় বংশধর (F_2)⟶

♂ / ♀	T	t
T	TT লম্বা	Tt লম্বা
t	Tt লম্বা	tt খাটো

F_2- বংশধরে তিনি লক্ষ্য করেন যে চারটি মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ৩টি (TT, Tt, Tt) লম্বা ও ১টি খাটো (tt) মটরশুঁটি উদ্ভিদ। অর্থাৎ

লম্বা ঃ খাটো

৩ ঃ ১ ফিটোটাইপিক অনুপাত।

এছাড়াও F_2 জেনারেশন/বংশধরে TT ঃ 2Tt ঃ tt জিনোটাইপিক পাওয়া যায় যার অনুপাত ১ঃ২ঃ১ ।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (Mendel's 2nd Law)

ডাই হাইব্রিড বা পলি হাইব্রিড ক্রসে দুই বা ততোধিক জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ি ফ্যাকটরগুলো গ্যামিট সৃষ্টির সময় স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে সনঞ্চারিত হয় এবং এ সনঞ্চারণে এক জোড়া ফেক্টর অন্যজোড়ার উপর নির্ভরশীল নয়। মেন্ডেলের এ সূত্রকে স্বাধীনভাবে সঞ্চারণের সূত্র বলে।

[Mendels Law of independent anssortment or recombination of gamets states that when gamates are formed the members of the different pairs of factors (gene) segregate quite independently of each other and that all possible combination of the factors (genes) concerned will be found among the progeny]

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বিজ্ঞানী মেন্ডেল মটরশুঁটি গাছের দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মধ্যে সংকরায়ণ করেন। তাই তিনি একটি গোলাকার হলুদ বীজ যুক্ত মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত সবুজ বীজ যুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটান। তিনি ধরে নিয়েছিলেন -

গোলাকার বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ি জিন R
গোলাকার বৈশিষ্ট্যের জন্য জিনোটাইপ RR
হলুদ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ি জিন Y
হলুদ বৈশিষ্ট্যের জন্য জিনোটাইপ YY
গোলাকার ও হলুদ উদ্ভিদের জিনোটাইপ, RR YY

কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ি জিন r
কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের জন্য জিনোটাইপ rr
সবুজ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ি জিন Y
সবুজ বৈশিষ্ট্যের জন্য জিনোটাইপ yy
কুঞ্চিত ও সুবজ উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে rryy

সংকরায়ণ ঃ

RRYY (গোলাকার ও হলুদ) x rryy (কুঞ্চিত ও সুবজ) ♀

♂ গ্যামিট → (RY) (ry)

১ম (F_1) বংশধর RrYy (গোলাকার হলুদ)

প্রথম বংশধরে প্রাপ্ত উদ্ভিদগুলোর মধ্যে পুণরায় সংকরায়ন করে তিনি নিম্নোক্ত ফলাফল পান-

গোলাকার হলুদ (F_1) x গোলাকার হলুদ (F_1) ♀

জিনোটাইপ → RrYy x RrYy

গ্যামিট → (RY) (Ry) (rY) (ry) ♂ (RY) (Ry) (rY) (ry)

F_1 ও ♀ F_1 - এর মধ্যে সংকরায়নে F_2 জেনারেশন/বংশধর নিম্নরূপ বীজ যুক্ত উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে।

♂ / ♀	RY	Ry	rY	ry
RY	**RRYY** গোলাকার হলুদ	**RRYy** গোলাকার হলুদ	**RrYY** গোলাকার হলুদ	**RrYy** গোলাকার হলুদ
Ry	**RRYy** গোলাকার হলুদ	**RRyy** গোলাকার সবুজ	**RrYy** গোলাকার হলুদ	**Rryy** গোলাকার সবুজ
rY	**RrYY** গোলাকার হলুদ	**RrYy** গোলাকার হলুদ	**rrYY** কুঞ্চিত হলুদ	**rrYy** কুঞ্চিত হলুদ
ry	**RrYy** গোলাকার হলুদ	**Rryy** গোলাকার সবুজ	**rrYy** কুঞ্চিত হলুদ	**rryy** কুঞ্চিত সবুজ

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে ফিনোটাইপিক অনুপাত পাওয়া যায়-
(৯) গোলাকার : হলুদ ঃ (৩) গোলাকার সবুজ ঃ (৩) কুঞ্চিত হলুদ ঃ (১) কুঞ্চিত সবুজ
বিজ্ঞানি মেন্ডেলের ২য় সূত্র থেকে ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১ ফিনোটাইপিক অনুপাত পাওয়া যায়।

লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Sex Determination, XX-XY, XX-XO)

যে প্রক্রিয়ায় জীবকোষের পরিস্ফুটনের শুরুতে অর্থাৎ নিষেক কালে অপত্যের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিংঙ্গ নির্ধারণ বলে। যে বিশেষ ধরনের ক্রোমসোম কোন জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমসোম বলে। পুরুষ এবং স্ত্রীতে অন্য যেসব একই ধরনের ক্রোমোজোম থাকে তাদের অটোসোম বলে। পুরুষ প্রাণী জন্ম নিবে না স্ত্রী প্রাণী জন্ম নিবে তা শুক্রাণূ ও ডিম্বানু নিষিক্ত হওয়ার সময়ই নির্ধারিত হয়। ঘাসফড়িং জাতীয় কয়েকটি পতঙ্গের শুক্রাশয়ে মিয়োসিস বিভাজন দ্বারা শুক্রাণূ সৃষ্টির সময় একটি ক্রোমোসোমের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা হয়। এই ক্রোমোসোমটি একা এবং এর কোন হোমলোগাস সঙ্গী নেই। তার এই ক্রোমোসোমটির নাম দেন সেক্স ক্রোমোসোম। এই সেক্স ক্রোমসোমই X ক্রোমসোম নামে পরিচিত।

মানুষ ও ড্রসোফিলা মাছির ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাণীর সেক্স ক্রোমোসোমের একটি X ও অন্যটি Y এবং এরা পরস্পর হোমলোগাস নহে। তাই পুরুষ প্রাণীর শুক্রানুতে দুধরনের ক্রোমোজোম উৎপন্ন করে একটি X অন্যটি Y ক্রোমসোম, অর্থাৎ হেটোরগ্যামেট উৎপাদক প্রাণী। কিন্তু স্ত্রী প্রাণীরা হোমগ্যামেট ধরনের তারা X ক্রোমসোম উৎপন্ন করে। তবে সকল প্রাণীর সেক্স ক্রোমসোম মানুষ ও ড্রোসফিলার মত নয়। পাখি, মাছ ও প্রজাপতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ক্রোমসোম ঠিক বিপরিত ধরনের। পুরুষের হোমগ্যামিটিক (XX) ও স্ত্রীরা হেটোরগ্যামিটিক (XY) ক্রোমসোম বহন করে। আবার কোন কোন পতঙ্গে Y ক্রোমোসোমটি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকে। এদের স্ত্রী প্রাণী দুটি (XX) এবং পুরুষ প্রাণী একটি (XO) ক্রোমোজোম বহন করে।

লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

মানুষ, স্তন্যপায়ী প্রাণী ও ড্রসোফিলা মাছিতে XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। ১৯০৫ সালে Nettie Stevens ও Edmund Beecher Wilson-1905 প্রথম পৃথকভাবে এই পদ্ধতি নির্ধারণ করেন।

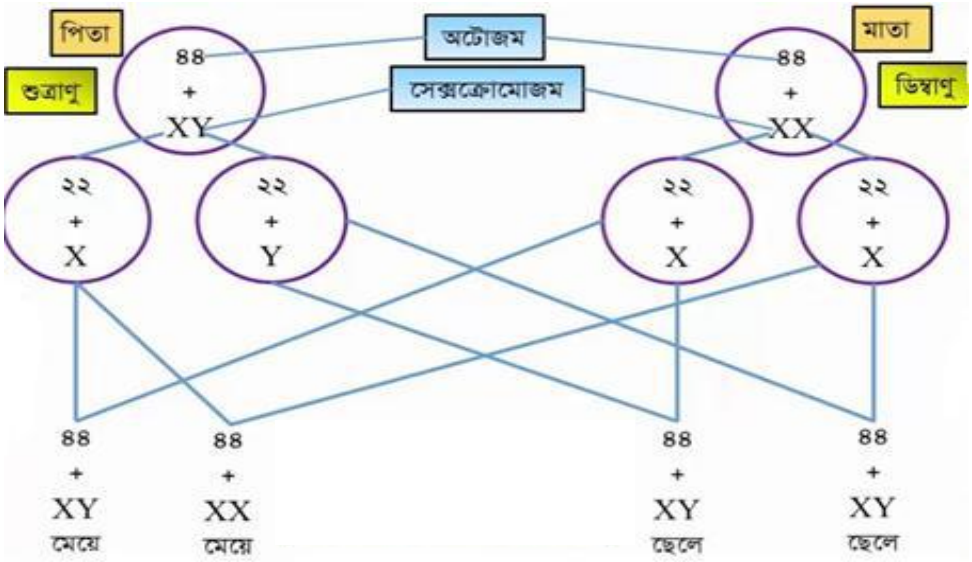

চিত্রঃ মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

মানবদেহে ক্রোমসোম সংখ্যা ২৩ জোড়া। এদের মধ্যে ২২জোড়া ক্রোমোসোমকে অটোজম এবং ১জোড়াকে সেক্স ক্রোমোজোম বলে, যা X ও Y নামে পরিচিত। এ দুই ক্রোমোসোমই লিঙ্গ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যখন XX একত্রে অবস্থান করে তখন কণ্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার যখন XY একত্রে অবস্থান করে তখন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে।

সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স (Sex Linked Inheritance)

ক্রোমসোমকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। ১টি হলো X ও অন্যটি Y ক্রোমসোম। এই X ও Y ক্রোমসোম গুলো আকারে ভিন্ন। যেমন কিছু মানুষ ও ফলের মাছিতে X ক্রোমসোমটি সোজা, রডের মত এবং Y ক্রোমসোম অপেক্ষা বড়। জিনতাত্ত্বিকভাবে X ও Y ক্রোমসোমের গঠনগত নানা ধরনের পার্থক্য রয়েছে। তবে দুটি ক্রোমোসোমের কিছু অংশ একইরকম অর্থাৎ তারা হোমলোগাস জিন বহন করে। তাই X ও Y ক্রোমোসোমে এ অংশ গুলোকে হোমলোগাস অঞ্চল বলে। ঠিক একইভাবে X ও Y ক্রোমোসে যে অঞ্চলে হোমালোগাস জিন নাই সে অঞ্চলকে নন-হোমোলোগাস অঞ্চল বলে।

X ও Y-উদ্ভিদ দেহহোমোলোগাস ও নন-হোমালোগাস অঞ্চলগুলো কোষ বিভাজনের মিয়োসিস দশায় ক্রোসিং ওভারের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। X ও Y উদ্ভিদ দেহহোমোলোগাস অঞ্চলের জিনগুলো ক্রসিং ও ভারের সময় সবসময় পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হয় না। কারণ এ সময় ক্রসিং ওভার ঐ অঞ্চল হতে হয়ত দুরে সরে যায়। এ ধরনের জিনকে আংশিক বা অসম্পূর্ণ সেক্সলিংকড জিন বলে। আবার, X ও Y ক্রোমসোমের নন-হোমলোগাস অঞ্চলরের জিনগুলো সর্বদা একসাথে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় কারণ এ অঞ্চলগুলোতে কখনই ক্রসিং ওভার ঘটে না। এ ধরনের জিনকে সম্পূর্ণ সেক্সলিংকড জিন বলা হয়।

সম্পূর্ণ সেক্সলিংকড জিন ২ প্রকার :

- **হোলাংড্রিক জিন (Holandric gene):** যে সকল জিন শুধুমাত্র Y ক্রোমোসোমের বিভিন্ন অংশে সীমাবদ্ধ থাকে তাদেরকে holandric বা Y-Linked gen বলে।
- **সেক্স লিংকড জিন (Sex-Linked gene):** যে সকল জিন শুধুমাত্র-X ক্রোমোসোমে বিভিন্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে তাদেরকে X Linked or Sex Linked gene বলে।

Y- লিংকড জিনের ইনহেরিট্যান্স : Y- লিংকড জিনগুলো সরাসরি এক পুরুষ হতে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়। Y লিংকড জিন যেমন Hypertricosis (অধিক লোম যুক্ত কানের পিনা) পিতা হতে পুত্রে সঞ্চারিত হয়।

X- লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স : X - লিংকড ইন্যারিট্যান্স পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কারণ পুরুষ (XY) ও নারী (XX) উভয়ের 'X' ক্রোমোজোম বহন করে। পুরুষে X লিংকড প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে স্ত্রীতে দুটি X লিংকড জিন প্রয়োজন একটি ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য। প্রচ্ছন্ন X লিংকড জিনটি বংশগতির ক্ষেত্রে Criss-Cross গমনাগমন ঘটে অর্থাৎ পিতা হতে কন্যায় এবং মাতা হতে পুত্রে বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়।

মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত এরকম কয়েকটি রোগের নাম হল-

- লাল সবুজ বর্নান্ধতা
- হিমোফিলিয়া
- ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রাফি (DMD)
- রাতকানা
- ফ্রিজাইল X সিনড্রম (অটিস্টিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা)
- ফেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন (পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হওয়া)
- হাইপারট্রাইকোসিস (দেহে ঘনলোমের উপস্থিতি)
- ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস।

X লিংক ডিসঅর্ডার কতগুলো নিময় মেনে চলে-

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা X-ক্রোমোজোম দ্বারা বাহিত হয়।
- এসব রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।
- এসব অস্বাভাবিকতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষে বেশি প্রকাশিত হয়।
- লিঙ্গ জনিত অস্বাভাবিকতাধারী পুরুষের সকল কন্যা সন্তানই বাহক হবে কিন্তু কোন পুত্র সন্তানে এ জিন সঞ্চারিত হবে না।
- লিঙ্গজনিত অস্বাভাবিকতাধারী স্ত্রীর সকল পুত্র-সন্তান বৈশিষ্ট্যধারী হবে কিন্তু কন্যারা বাহক হবে।

বর্ণান্ধতা (Colour Blindness)

মানুষের চোখের রেটিনাতে কিছু বর্ণসংবেদী কোষ আছে যেগুলো বিভিন্ন বর্ণ সনাক্ত করতে পারে। মানুষের x ক্রোমোসোমে বিদ্যমান একটি জিন দ্বারা এ কোষগুলোর বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়।কিন্তু মিউটেশনের কারণে এ জিনের একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল সৃষ্টি হয় যেটি রেটিনার সংবেদী কোষগুলোর বিকাশকে রহিত করে। ফলে এ প্রচ্ছন্ন জিনধারী মানুষ কতগুলো বিশেষ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পরেনা। একে বর্ণান্ধতা বলে। প্রাণিজগতে শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা বেশি দেখা যায়।

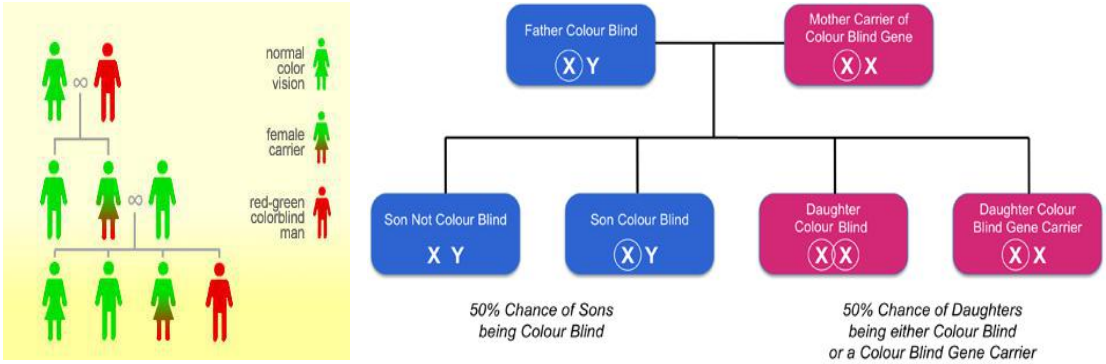

চিত্র : **বর্ণান্ধতার কারণ**

হিমোফিলিয়া (Haemophilia)

হিমোফিলিয়া হল মানুষের লিঙ্গ জড়িত বংশগতিয় রক্ত তঞ্চন অস্বাভাবিকতা। মানুষের x ক্রোমোসোমে বিদ্যমান একটি প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির জিন দ্বারা এ রোগ নিয়ন্ত্রিত হয় ও বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ জিনের প্রকট অ্যালিল নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর সংশ্লেষণের মাধ্যমে রক্ত জমাট বাধার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। হিমোফিলিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট হল দেহের কোথাও কোন কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হলে তা জমাট না বেধে অবিরাম চলতে থাকে। জিনগত কারণে রক্ত জমাট না বাধার এ অবস্থাকে হিমোফিলিয়া বলে।

এ রোগকে রাজকীয় রোগ বলা হয়। ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার (১৮৩৭-১৯০১) সময় থেকে ইউরোপে কিছু রাজ পরিবারে হিমোফিলিয়ার অস্তিত্ব ব্যাপক ভাবে ধরা পড়ে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পূর্ব পুরুষে হিমোফিলিয়া রোগের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। । অনুমান করা হয়, যে গ্যামেটগুলোর মাধ্যমে তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন তার কোনটির মিউটেশনের ফলেই হিমোফিলিয়ার প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (h) সৃষ্টি হয়েছিল। মহারানী ভিক্টোরিয়া থেকে এ জিনটি বিয়ের মাধ্যমে ইউরোপের রাজ পরিবারগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

চিত্র : হিমোফিলিয়া

ডুশেন মাসকুলার ডিসট্রফি (Duchene muscular dystrophy-DMD)

ডুশেন মাসকুলার ডিসট্রফি একটি বংশগতিয় রোগ যাতে মানবদেহে পেশিসমূহ বিশেষ পুষ্টিহীনতা কারণে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পরিশেষে মানুষের মৃত্যু ঘটে। ফরাসি স্নায়ুবিশেষজ্ঞ Guillaume Benjamin Amand Duchene (১৮০৬-১৮৭৫) এর নামানুসারে এ রোগের নামকরণ করা হয়। মানুষের x ক্রোমোসোমের xp21 লোকাসে অবস্থিত ডিসট্রফিন জিনের (Distrophin gene) পরিব্যক্তির ফলে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ জিনের প্রকট অবস্থা পেশীকোষের গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান ডিসট্রফিন (dystrophin) প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। এ প্রোটিনের অভাবে পেশী কোষের সারকোলেমা দিয়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে কোষকে ধীরে ধীরে শক্ত করে ফেলে।

বংশগত রোগ মাস্কুলার ডিস্ট্রফির মধ্যে DMD সবচেয়ে জটিল। যুক্তরাজ্যে প্রতি ৩৫ হাজার নবজাতকের একজন এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্তদের মাংসপেশীকে শক্তিশালী রাখার জন্য যে ডিসট্রফিন প্রোটিন দরকার তা থাকে না। ফলে মাংসপেশী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এরা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

চিত্র : ডুশেন মাসকুলা ডিস্ট্রফি

১২.২ বিবর্তন (Evolution) ধারণা ও এর প্রমাণাদি

বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান যে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীববৈচিত্র্য দেখা যায় তা তাদের বর্তমান রূপ নিয়ে এই দিনেই পৃথিবীতে আসেনি। এক প্রজাতি থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে অন্য প্রজাতির। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বেঁচে থাকার তাগিদেই এসব পরিবর্তন সাধিথ হয়েছে। আর প্রজাতি গঠনে জীব জগতের যে কোন ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে।

বিবর্তন একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক জটিল প্রক্রিয়া। জীব জগতে হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের বিকাশ ঘটেছে। প্রথম সৃষ্ট জীব হতে বিবর্তনের জটিল পথ ধরে অগ্রসর হয়েই বর্তমান পৃথিবীর সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, এটাই বিবর্তনের মূল কথা।

জীববিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে বিবর্তনের সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞানী ডারউইন বিবর্তনকে পরিবর্তনসহ উদ্ভাবন বলেছেন। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী "প্রকৃতিতে যে ধারাবাহিক অথচ অতি মন্থর ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোন সরল জীব হতে জটিলতর ও উন্নত জীবের উদ্ভব হয় তাকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন বলে।

জীব জগতের যে বিবর্তন ঘটেছে এ প্রত্যয় জীব বিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে অনেক আগেই। কিন্তু ঠিক কিভাবে বিবর্তন হচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। এ মতানৈক্যের মূল কারণ হল বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া, যা সহজে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায় না।

বিবর্তনের ধাপ

বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বিবর্তনের তিনটি ধাপ নির্ণয় করেছেন, যথা–

১. **মাইক্রো বিবর্তন (Micro evolution):** জীবের জিন মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে তাকে মাইক্রো বিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে কোন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীতে অল্প মাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হয়ে বিভিন্ন জাত, ক্লাইন বা উপ-প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

২. **ম্যাক্রো বিবর্তন (Macro evolution):** মাইক্রো বিবর্তন উপ-প্রজাতির ধাপ অতিক্রম করে প্রজাতি সৃষ্টির বিবর্তনকে ম্যাক্রো বিবর্তন বলে।

৩. **মেগা বিবর্তন (Mega evolution):** ম্যাক্রো বিবর্তন ধাপ অতিক্রম করে গণ এর উপরের পর্যায়ের স্তরগুলো সৃষ্টি হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে। এ বিবর্তনের মাধ্যমে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বিবর্তনের ধরণ

জীবের আবাসস্থলের বৈচিত্র্য এবং অভিযোজনিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিবর্তন তিন ধরনের হয়ে থাকে, যথা–

১. **অপসারী বিবর্তন (Divergent Evolution):** এক্ষেত্রে নিকট সম্পর্কযুক্ত জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হয়ে বিবর্তন ঘটায় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

২. **অভিসারী বিবর্তন (Convergent Evolution):** এক্ষেত্রে দূর সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী একই পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে অভিযোজনের কারণে তাদের দেহে সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে বিবর্তন ঘটে তাকে অভিসারী বিবর্তন বলে।

৩. **সমান্তরাল বিবর্তন (Parallel Evolution):** দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর দুটি দূরবর্তী কিন্তু একই পরিবেশে বসবাস ও অভিযোজনের মাধ্যমে যখন একইভাবে বিবর্তিত হয় তখন তাকে সমান্তরাল বিবর্তন বলে।

১. ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম (Lamarckism)

বিবর্তনের উপর সর্বপ্রথম একটি যুক্তিযুক্ত মতবাদ তুলে ধরেন জ্যা বাপটিস্ট ল্যামার্ক, ১৭৪৪-১৮২৯ নামক একজন ফরাসি বিজ্ঞানী। এ মতবাদটি æTheory of inheritance of acquired characters" বা 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম' নামে খ্যাত। সমসাময়িক অন্যান্য জীব বিজ্ঞানীদের মতো ল্যামার্কও বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি জীবের একটি অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি থাকে। আর এ শক্তিই পরিবেশের সব প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিহত করে জীবের বিভিন্ন অঙ্গের বিকাশ ও কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যামার্কের মতবাদ মূলত এ প্রত্যয়কে ভিত্তি করেই। ল্যামার্কের মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল-

১. জীবন ধারণের প্রয়োজনে পরিবেশ প্রতিটি প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও সংগঠনকে প্রভাবিত করে।
২. কোন অঙ্গের পুনুঃপুনঃ ব্যবহার বা প্রতিনিয়ত ব্যবহার সে অঙ্গকে সুগঠিত করে এবং তার বৃদ্ধি ঘটায়। আবার কোন অঙ্গ ব্যবহৃত না হলে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলুপ্তি ঘটে।
৩. পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণীর দেহে নতুন অঙ্গের উদ্ভাবন হয়। এ নতুন অঙ্গের আকার ও বিকাশ তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল।
৪. ব্যবহার ও অব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ কর্তৃক আনীত সব পরিবর্তন প্রাণীর দেহে সংরক্ষিত হয় এবং প্রজননের মধ্যেমে তা পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্কের মতবাদের ব্যাখ্যা

১. ল্যামার্ক তাঁর মতবাদের সমর্থন যোগাতে জিরাফের লম্বা গলার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণায় জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা লম্বা ছিল না। বিবর্তনের মাধ্যমে খাটো গ্রীবা বিশিষ্ট পুর্বপুরুষ থেকেই বর্তমানের লম্বা-গ্রীবার জিরাফের আবির্ভাব হয়েছে। ব্যাখ্যা দিতে দিয়ে ল্যামার্ক বলেছেণ যে খাটো গ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফ ঘাসের পরিবর্তে উঁচু গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে শুরু করে এবং পাতা নাগাল পাওয়ার জন্য তারা অনবরত ঘাড় লম্বা এবং উঁচু করার প্রচেষ্টা চালায়। বংশ পরম্পরায় এ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের ঘাড় ও গলা লম্বা হয়ে যায় এবং বর্তমান রূপ ধারণ করে।
২. ব্যবহারের চাহিদায় যে নতুন অঙ্গের সংযোজন হতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ ল্যামার্ক জলজ পাখির প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর ধারণায় এক সময় সব পাখিই ছিল স্থলচর। কিন্তু কিছু সংখ্যক পাখি খাদ্যের অন্বেষণে জলাশয়ের কাছে যায় এবং পানির ভেতর থেকে খাদ্য আহরণের জন্য তাদের পায়ের ব্যবহার শুরু করে। এছাড়া পানিতে চলাচলের জন্যও তারা পায়ের ব্যবহার চালায়। ফলে পায়ের আঙ্গুলের পাশ দিয়ে চামড়ার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে লিপ্ত-পদের (web-toed foot) উদ্ভব হয় যা বর্তমানে হাঁস, পেলিক্যান ইত্যাদি পাখিতে দেখা যায়।
৩. অব্যবহারের ফলে অঙ্গের যে বিলুপ্তি ঘটে ল্যামার্ক তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সাপের আঙ্গিক গঠনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময় সাপ তার শরীরকে অহরহ প্রসারিত করে এবং এক্ষেত্রে পায়ের ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন হয় না বরং সরু জায়গা দিয়ে চলাচল করার সময় পা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ল্যামার্কের ধারণা অনুযায়ী সাপের পূর্বপুরুষেরা চলাচলের সময় পায়ের ব্যবহার ধীরে ধীরে বর্জন করে। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকায় অব্যবহারের ফলে এক সময় তাদের দেহ থেকে পা সম্পূর্ণরূপে নিচিহ্ন হয়ে যায়।

ল্যামার্কের পর বিবর্তন সম্পর্কিত সুচিন্তিত এবং জোড়ালো মতবাদ প্রকাশ করেন চার্লস ডারউইন। তার মতবাদটি প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ নামে পরিচিত এবং বিখ্যাত গ্রন্থ On the Origin of Species by Means of Natural Selection-এ 1859 সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ মতবাদকে ডারউইনিজম নামে অভিহিত করা হয়।

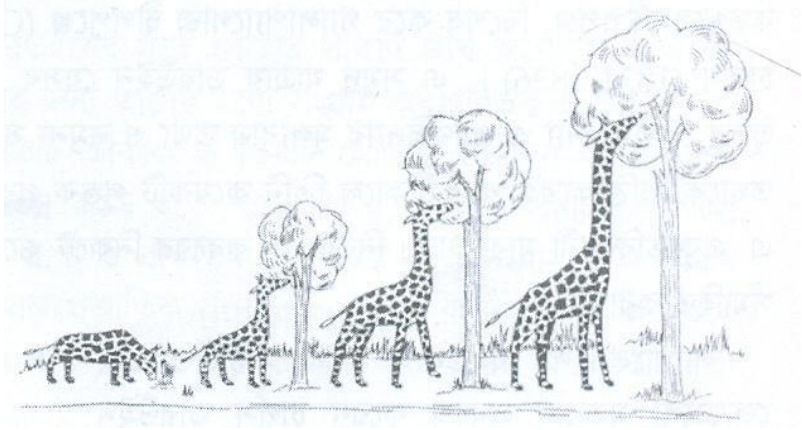

চিত্র: ল্যামার্কের মতবাদ অনুযায়ী জিরাফের গলার বিবর্তন

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ নিম্নলিখিত পাঁচটি তথ্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. **প্রকরণ (Variation):** প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি জীব প্রজাতির মধ্যেই চেহারা, আকৃতি বা জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জীবের এসব অমিল বা বৈসাদৃশ্যতাকে প্রকরণ বা Variation বলে। একই প্রজাতির দুইটি সদস্য, এমনকি অভিন্ন যমজ (Identical Twins) ব্যতিরিকে একই পিতা-মাতার দুটি সন্তানও কখনো হুবহু এক রকম হয় না। বিভিন্ন জীবে এসব প্রকরণ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেতে পারে। ডারউইন জীব জগতের এ প্রকরণকে বিবর্তনে বা নতুন প্রজাতি গঠনের চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেন।

২. **গুণোত্তর হারে সংখ্যা বৃদ্ধি (Geometric Ratio of Increase):** জীব জগতে প্রতিটি প্রজাতির গুণোত্তর হারে সংখ্যা বাড়াবার একটি প্রবণতা আছে। তাই প্রতিটি জীব যে পরিমাণে বেঁচে থাকতে পারে তার তুলনায় অনেক বেশী সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়। অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশী। জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির এ ধরনের প্রবণতা থাকা সত্বেও স্বাভাবিক পরিবেশে প্রায় সব প্রজাতির সদস্য সংখ্যাই মোটামোটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। কারণ প্রতিটি জননের অধিকাংশ সন্তান-সন্ততিই বিভিন্ন কারণে মারা যায়।

৩. **বাঁচার সংগ্রাম (Struggle for Existance):** ডারউইনের মতে যেহেতু প্রতিটি জীব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী পরিমাণ সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য তাদের মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। এ সংগ্রাম ঘটে মূলত খাদ্য, বাসস্থান ও প্রজনন স্থানকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি জীবকে এ তিনটি মৌলিক উপাদান লাভের জন্য প্রতিনিয়ত বহুমুখী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এ সংগ্রাম বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, প্রাণীতে প্রাণীতে সংগ্রাম উদ্ভিদে উদ্ভিদে সংগ্রাম, উদ্ভিদে প্রাণীতে সংগ্রাম এবং উদ্ভিদ-প্রাণী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সংগ্রাম। প্রকৃতির অমোষ নিয়মে জীবণ-মরণ এ সংগ্রাম চলছে প্রতি নিয়ত, জীবনের প্রতি স্তরে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

৪. **প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection):** ডারউইন জীব জগতের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সংগ্রামকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে কিছু কিছু প্রাণীর অনুকূল প্রকরণ পরিবেশের এ প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকার জন্য তাদের সহায়ক হয়। অন্যদিকে যারা এ ধরনের প্রকরণ লাভ করেনি তারা প্রকৃতি কর্তৃক মনোনীত হয় না। ফলে তাদের বিলুপ্তি ঘটে অথবা প্রজনন ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

   ঘন চারা গাছের মধ্যে যেসব গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে স্বভাবতই তারা অন্যদের ছায়ায় ফেলে নিজেরা সাফল্যভাবে জন্মায়। অন্যগুলো আলোর অভাবে টিকতে ব্যর্থ হয় এবং মারা যায়। এভাবে জীবন সংগ্রামে যারা বাঁচে ডারউইনের কথায় তারাই 'প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত' এবং তারাই বংশ বিস্তারে সুযোগ যায়। হার্বার্ট স্পেনসার এ প্রক্রিয়ায় টিকে থাকাকে যোগ্যতমের উর্ধ্বতন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫. **নতুন প্রজাতির সৃষ্টি (Origin of New Species):** ডারউইনের মতে জীবন ধারণ সংগ্রাম কেবল যে সব জীব সাফল্য লাভ করে যে সব জীবদেহে সংগ্রামের জন্য অনুকূল ও সহায়ক প্রকরণ থাকে। এসব প্রকরণ প্রজননের মাধ্যমে পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত ও সংরক্ষিত হয়। কয়েক প্রজন্ম ধরে এটি চললে আরো সুষ্ঠুভাবে পরিবেশে অভিযোজিত হয়। পরিবেশের অবস্থার আবার কোন পরিবর্তন ঘটলে যে সব প্রাণী সে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের মধ্যে অনুকূল প্রকরণ ঘটাতে পারে কেবল তারাই টিকে থাকে। যারা পারে না তারা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। যে সব প্রজাতি অতীতে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে গেছে, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের ব্যর্থতা এ জন্য দায়ী। ডারউইন তাই মুক্তি দেখান যে, দীর্ঘদিন ধরে প্রকরণের ক্রমাগত সঞ্চয় একটি জীবের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটায়। আর এর ফলেই উদ্ভব হয় নতুন প্রজাতির।

বিবর্তনের প্রমাণ

বিজ্ঞানীদের দেয়া বিভিন্ন মতবাদ ও তথ্যাদি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বিবর্তন একটি সচল প্রক্রিয়া, যা খুব ধীর গতিতে প্রকৃতিতে সব সময় ঘটে চলছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে আকৃতিগত, অঙ্গ সংস্থানিক ও আচরণগত বৈচিত্র্য দেয়া যায় তা অতি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে লক্ষ বছর ধরে পরিবর্তনের ধারা বেয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। বিবর্তনের ধারণানুযায়ী পৃথিবীর সকল প্রাণীই সাধারণ পূর্বপুরুষে থেকে উদ্ভূত এবং এ কারণেই এরা বিভিন্ন দিক দিয়ে একে অন্যে সাথে সম্পর্কযুক্ত। কলাকৌশল নিয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীগণ বিবর্তনের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। বিবর্তনের বহুল আলোচিত প্রমাণগুলো হল:

১. **জীবাশ্মগত ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ:** সুদূর অতীতে বিলুপ্ত কোন জীবের দেহ বা দেহাংশ বা কোন চিহ্ন প্রাকৃতিক উপায়ে পাললিক শিলায় প্রস্তরীভূত হয় সংরক্ষিত থাকলে তাকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে। জীবাশ্ম বিবর্তনের অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। জীবাশ্মের অধ্যয়নের মাধ্যমে অতীতের প্রাণীকূলের অবস্থা এবং কিভাবে বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তিত ও অভিযোজিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তর থেকে অনেক প্রাণীর ক্রমবিকাশেল চমৎকার ঐতিহাসিক ধারাবাহিক জীবাশ্ম তথ্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে মানুষ, হাতি, ঘোড়া, উট উল্লেখযোগ্য।

ঘোড়ার পূর্ববর্তী হিসেবে এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট Hyracotherium প্রাণীটি প্রথম উত্তর আমেরিকায় আর্বিভূত হয় ইয়োসিন যুগে। এরা আকৃতিতে অনেকটা ছোট কুকুরের মতো ছিল। বিবর্তনের পথ বেয়ে বিভিন্ন সময়ে Miohippus, Merychippus এবং Pliohippus মাধ্যমে আধুনিক কালের ঘোড়া Equus-এর উদ্ভব হয়েছে যারা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে। ঘোড়ার বিবর্তনের সাথে যুগপৎ ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের একটি সাদৃশ্যপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণ বহন করে।

২. **শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণঃ** বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাণি জগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে উঠেছে। প্রাণীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সংস্থান এবং জ্ঞাতিতাত্ত্বিক সম্পর্ক যাচাই করে এসব বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয় যার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের গণ (Genus), গোত্র (Family), বর্গ (Order), শ্রেণি (Class), পর্ব (Phylum) ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতিতে বৈশিষ্ট্যেল তারতম্য থাকার কারণেই শ্রেণি বিন্যাসের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয়েছে যা বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে। বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী আদিকালে কেবল একটি বা কয়েকটি প্রজাতির প্রাণী ছিল। পরে এদের ধারাবাহিক ও ধীর পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে অগণিত অন্যান্য প্রজাতি। বিবর্তনের পথ ধরে সামনের দিকে যতই অগ্রসর হয়েছে ততই নিম্নস্তরের প্রাণী হতে উচ্চ স্তরের প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। তাই প্রাণী জগতের শ্রেণি বিন্যাসের যত নিচে যাওয়া যায় তত বেশী প্রাণীদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। এমন কিছু প্রাণী পাওয়া যায় যারা ভিন্ন ভিন্ন দুটি শ্রেণির প্রাণীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং ফলে শ্রেণি বিন্যাসের সময় তাদের কোন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।যোগসূত্র হিসেবে এসব প্রাণীর উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে এবং তার গতিপথ নির্দেশ করে।

৩. **জীব ভৌগোলিক প্রমানঃ** ডারউইন তাঁর মতবাদের জীবের ভৌগোলিক অবস্থান বা বিস্তৃতিকে বিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি প্রাণীগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং পরে সেখান থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাণীর বিস্তৃতি লাভের সময় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে তাদের অনেক আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্নতার ফলে বিভিন্ন পরিবেশের প্রাণী নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে। বিবর্তনবাদীদের মতে সমগ্র পৃথিবী এক সময় গন্ডোয়ানাল্যান্ড নামে এক অখন্ড ভূখন্ড হিসেবে বিরাজিত ছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘকালের ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে এটি বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন মহাদেশ গঠন করে। এ বিচ্ছিন্নতার ফলে পূর্বেকার সকল প্রাণী বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্ব স্ব পরিবেশে অভিযোজিত হয়ে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন ঘটায় এবং যেসব প্রাণী নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে পারেনি তারা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪. **অঙ্গ সংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণঃ** নিকট সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গ সংস্থান তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করলে তাদের গঠন পরিকল্পনায় অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাণীল অঙ্গসংস্থানের এ সম্পর্ককে বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। একটি পর্বের বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীতে কোন একটি বিশেষ অঙ্গের গঠন তুলনা করলে তাদের মধ্যে স্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ অঙ্গটি মূল কাঠামো সকল ক্ষেত্রে একই রকম। তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানকে বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিজ্ঞানীগণ সমসংস্থ, সমবৃত্তীয় এবং লুপ্তপ্রায় অঙ্গসমূহের কথা তুলে ধরেছেন।

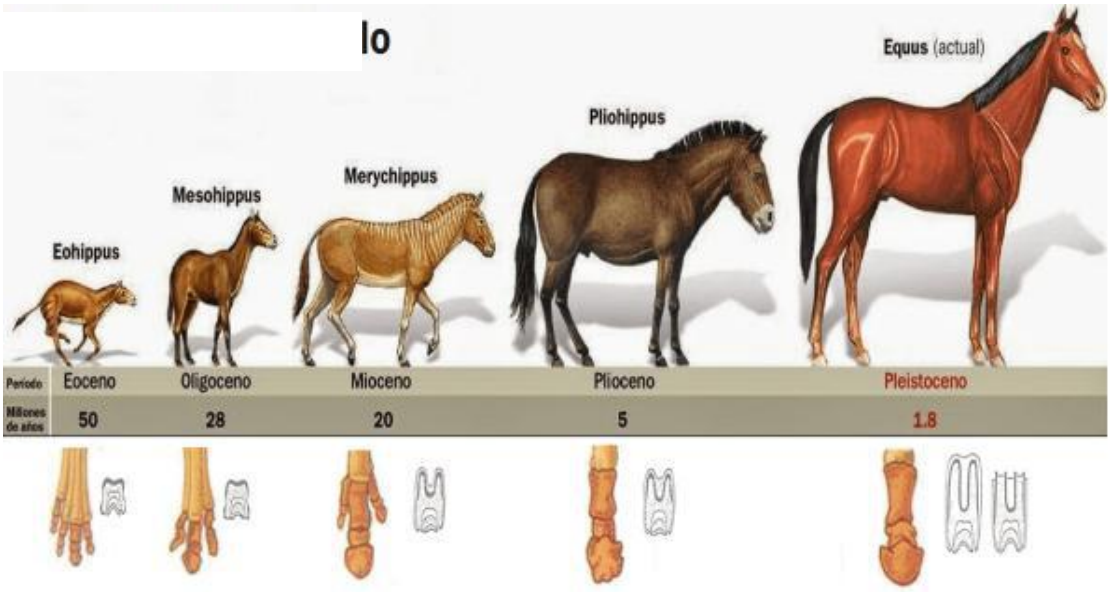

চিত্রঃ ঘোড়ার বিবর্তনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

৫. **ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণঃ** সকল বহুকোষী প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশায় ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন দেখা যায়। প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের দশাগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত প্রাণীর অনুরূপ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে নিম্নতর প্রজাতির বয়স্ক প্রাণীর অনুরূপ। তবে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশায় অদ্ভূত ধরনের সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায়। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা করা হয় যে মাছের ন্যায় কোন এক পূর্বপুরুষ হতে বিবর্তনের মাধ্যমে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপাখী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

৬. **শরীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়নঘটিত প্রমাণঃ** জীবের শরীরবৃত্তীয় এবং জীবরাসায়নিক কতগুলো দিক বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় সকল প্রাণীর পরিপাক, রেচন, স্নায়ু এবং সংবহনের শারীবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো মোটামুটি একই রকম। ধারণা করা হয় বিভিন্ন প্রাণী বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার পূর্বেই এ তন্ত্রগুলো তাদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছিল। রক্তের হিমোগ্লোবিন, রক্ত আমিষ, এনজাইম ও হরমোনের জীব রাসায়নিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রাণীগোষ্ঠীতে এসব উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায় যা বিবর্তনের সপক্ষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ নির্দেশ করে।

৭. **কোষতাত্ত্বিক প্রমাণঃ** সকল প্রাণীল দেহই কোষীয় একক দ্বারা গঠিত। প্রাণীর শ্রেণিতাত্ত্বিক বা আকৃতিগত যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন সকলের কোষীয় গঠণ প্রায় এক রকম। জৈব রাসায়নিক দিক থেকে সকল প্রাণীর কোষের গঠনে সাদৃশ্য থাকায় অনুমান করা হয় যে, সকল প্রাণী মূলত একটি সাধারণ পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে। এছাড়া কোষের অঙ্গসংস্থান, ক্রোমোজোম সংখ্যা ও অন্যান্য গুণাবলী বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক ও বিবর্তনের গতিপথ নির্দেশ করে।

৮. **জিনতাত্ত্বিক প্রমাণঃ** জীবের জিনতাত্ত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতিতে একই প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটে সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। ভিন্ন ধরনের দুটি প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে কখনো প্রজনন ঘটে না। কদাচিৎ খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি প্রজাতির মধ্যে যৌন জননে সংকর ও বন্ধ্যা প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এ সংকর সন্তান উৎপাদন অবশ্যই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।

জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনের হঠাৎ কোন পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলে প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এ জন্য মিউটেশনকে বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করা হয়। জিন মিউটেশনের ফলে আনীত জীবের পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য অনেক সময় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবেশে অভিযোজিত হয় এবং নতুন প্রজাতি গঠনের ভিত্তির সূচনা করে।

১২.৩ জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। বায়োটেকনোলজি শব্দটি ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেক (Karl Erekh)। Biology এবং Technology শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি।

বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তিই জীবপ্রযুক্তি নয়। মাটি দিয়ে ইট তৈরিও একটি প্রযুক্তি, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস, উঠানোও প্রযুক্তিনির্ভর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে মুহূর্তেই যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সবই প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

উত্তম ব্যাকটেরিয়া প্রকরণ নির্বাচন করে উত্তম গুণমানের দই তৈরি করা একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীবপ্রযুক্তি। ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে পনচশীল জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস তৈরি এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোট একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি। ১৯৭০ দশকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি নতুনমাত্রা লাভ করেছে।

বিজ্ঞানী কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি।

জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনস্যুলিন উৎপাদনঃ

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ইনস্যুলিন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিতে এত ইনস্যুলিন কোথায়? একসময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যায়শয় থেকে ইনস্যুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু গরু বা শূকর থেকে নেয়া ইনস্যুলিন মানুষের জন্য ততটা উপযোগী নয়। কাজেই জিন প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনস্যুলিন উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এক সময় তা সফল হয়। প্রথমেই মানুষের DNA-তে ইনস্যুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তা হলো ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে। এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন-বেস নিয়ে গঠিত ইনস্যুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান।

জিন প্রকৌশলীর তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনস্যুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় 'হিউমুলিন' নামে।

প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

১। একটি ব্যাকটেরিয়ামের (*E.coli*) প্লাসমিড নির্দিষ্টকরণ এবং মানুষের অগ্ন্যাশয় কোষ থেকে DNA পৃথকীকরণ।

২। মানুষের DNA থেকে ইনস্যুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ পৃথক করা হয় এবং ঐ মাপে ব্যাকটেরিয়ামের (*E.coli*) প্লাসমিড অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।

৩। প্লাসমিডের কাটা অংশে ইনস্যুলিন জিন প্রবেশ করানো ও লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হলো।

৪। এবার একটি *E.coli* কোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো হলো, ফলে *E.coli* টি GM *E. coli* (জেনেটিক মডিফাইড *E.coli*) এ পরিণিত হলো।

৫। একটি উপযুক্ত পাত্রে (ফার্মেন্টেশন ট্যাংক যাতে উপযুক্ত তাপমাত্রা বিদ্যমান) GM *E.coli* প্রবেশ করিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হল।

৬। ফার্মেন্টেশন ট্যাংক থেকে ইনস্যুলিন উৎপাদনকারী *E.coli* নিয়ে ইনস্যুলিন সংগ্রহ করা হয় এবং তা বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত Mixtard ইনস্যুলিন ডেনমার্কের Novo Nordisk A/s ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক জীব প্রকৌশল প্রক্রিয়ার উৎপন্ন ও বাজারজাতকৃত।

জীবপ্রযুক্তির অবদান/গুরুত্ব (Importance of Biotechnology):

জীবপ্রযুক্তির বহু পদ্ধতি ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হয়েছে। নিচে কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১। **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষের) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগ নিরাময়। (iii) বিভিন্ন জীবাণু প্রয়োগে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার। (iv) বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ।

২। **এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নতমানের এনজাইম উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ওষুধ, সঞ্চয়ী প্রোটিন প্রভৃতি জৈব যৌগের উৎপাদন।

৩। **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন। (ii) রোগ-পতঙ্গ-বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ জাত উৎপাদন। (iii) বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী সুস্থ ও সবল গবাদিপশু উদ্ভাবন। (iv) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

৪। **চিকিৎসা শাস্ত্রে :** (i) বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্ডিবডি উৎপাদন। (ii) ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনস্যুলিন ও ইন্টারফেরণসহ নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। (iii) মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (iv) মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে বায়োফার্মের মাধ্যমে হরমোন, অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরি করা হচ্ছে।

৫। **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ওষুধের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন।

৬। **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানার নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র রক্ষা।

৭। উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার (Application of tissue culture technology):

টিস্যু কালচার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রজননবিদরা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো।

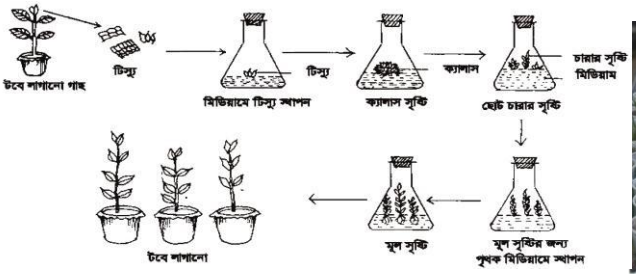

চিত্র: ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ

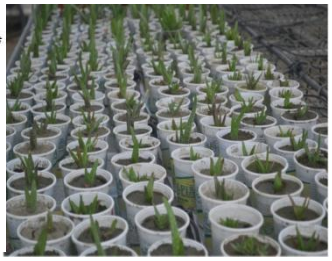

টিস্যু কালচার

১। **হুবহু মাতৃ-গুণাগুণসম্পন্ন চারা উৎপাদন :** যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন- থুজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

ফুল, ফল বা শস্য উৎপাদনকারী কোনো ভালো জাতের উদ্ভিদ থেকে যদি অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদিনত চারাগাছসমূহ হুবহু এদের মাতৃ-উদ্ভিদের মতো হয়ে থাকে। কাজেই একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়া। তাই এ পদ্ধতি **মাইক্রোপ্রোপাগেশন** নামেও পরিচিত।

২। **বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদিভদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিত থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তির ব্যবহারেই সম্ভব।

৩। **ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে আন্ত:প্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণকালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

৪। **সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন বা ফিউশন:** এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি ও তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়নের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলননের সময় পুংগ্যামিটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রীগ্যামিটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে **সোমাটিক হাইব্রিড** তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তখন তাকে **সাইব্রিড** (cybrid) বলে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমেই সাইটোপ্লাজমের বিশেষ গুণ স্থান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আলু ও টমোটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে পোমাটো।

৫। **মেরিস্টেম কালচার:** মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

৬। **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচর পদ্ধতি পয়োগ করে একটিমাত্র উদ্ভিদ থেকে অল্প সময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট্ট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৭। **হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন : পরাগরেণু** এবং **পরাগধানী** কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজনেনর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধনী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ইপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৮। **কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ:** কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ কৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ভ্রূণ থেকে বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উন্নতজাত যেমন- AdhI নামক গম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। যে কোনো **আবাদী কোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলে সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন**। এর মাধ্যমে উন্নত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হয়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আবাদী গ্যামিট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে বলে গ্যামিটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।

৯। **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি:** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সংযোজন করা সম্ভব হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নানা ধরনের অণুজীব নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষের প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব । টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ কোষ বা ভ্রূণ হতে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। আগাছানাশকরোধী, পতঙ্গরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ যেমন-আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, স্বর্ণধান (golden rice) ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচারের কাজের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই টিস্যু কালচার কাজ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

(১) বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

(২) কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

(৩) চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ চারা উৎপাদন।
(৪) কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।
(৫) বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।
(৬) পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।
(৭) টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেণাগারেও টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলে চারা উৎপান এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকরতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানাধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশি ও বিদেশি নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন,মুগ কালাই ও মাষ কালাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বর্তমানে বহু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান (NGO) তথা ব্র্যাক কর্তৃক Stevia, প্রশিকার বিদেশি অর্কিড ও গোল আলুর চারা উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি প্রসার এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো-

সুবিধাসমূহ :

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।
২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।
৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।
৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।
৫। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।
৬। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুনঃউৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ :

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন-ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না।
২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যক সম্ভবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।
৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয় ।
৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।
৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না। এতে উদ্ভিদগুলো ভবিষ্যতে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভবনা থাকে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

প্রাণী বা উদ্ভিদ জীবের ক্ষুদ্রতম একক হলো কোষ (cell)। কোষের প্রাণকেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস (Nucleus) বলা হয়। এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিশেষ কিছু পেঁচানো বস্তু থাকে যাকে বলা হয় ক্রোমোজোম (Chromosome)। ক্রোমোজোম জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। ক্রোমোজোমের মধ্যে আবার চেইনের মত পেঁচানো কিছু উপাদান থাকে যাকে ডিএনএ বলা (DNA-Deoxyribo Nucleic Acid) হয়। এই ডিএনএ অনেক অংশে ভাগ করা থাকে । এর এক একটি নির্দিষ্ট অংশকে বলে জীন (Gene)। ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত জীনই জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে মানুষের শরীরে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে এবং বিড়ালের রয়েছে ৩৪ জোড়া। আবার মশার আছে ৬ জোড়া। এদের মধ্যে একজোড়া ক্রোমোজোম বংশগতির বাহক। আমাদের শরীরে প্রায় ৩০০০০০ জীন রয়েছে। এক সেট পূর্ণাঙ্গ জীনকে জীনোম (Genome) বলা হয় । বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীকে নিঃসন্দেহে বলা হচ্ছে Century of Biological Science. এর কারণ ১৯৭২ সালে পল বার্গের রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবিষ্কার। **যে বিশেষ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে জীবের বৈশিষ্ট পরিবর্তন করা হয় তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জীব প্রকৌশল বলে।** অন্যভাবে বলা যায় রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে জিন প্রকৌশল বলে। রিকম্বিনেন্ট কৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন জিনকে কোনো বাহক বা মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে জীবের প্রোটোপ্লাস্টে প্রবেশ করিয়ে ট্রান্সজেনিক জীব বা GM(Genetically Modified) জীব তৈরি করা হয়।

জিন ক্লোনিং বা রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি (Gene Cloning or Recombinent DNA Technology)**:** DNA এর পূর্ণবিন্যাসকেই রিকম্বিনেন্ট DNA বলা হয়। রিকম্বিনেশন ঘটিয়ে এক প্রজাতির DNA তে অন্য প্রজাতির DNA ঢুকানোর মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রজাতি উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে বলে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বা জিন ক্লোনিং। ক্লোনিং সম্পন্ন করা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করার মাধ্যমে। একটি DNA অণুর কাঙ্খিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি DNA অণুতে প্রতিস্থাপনের ফলে যে নতুন DNA অণু পাওয়া যায়, তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে এই রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করে কোন বাহকের DNA এর সহযোগিতায় কাঙ্খিত DNA এর অবিকল কপি সৃষ্টি করাকে জিন ক্লোনিং বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপ :

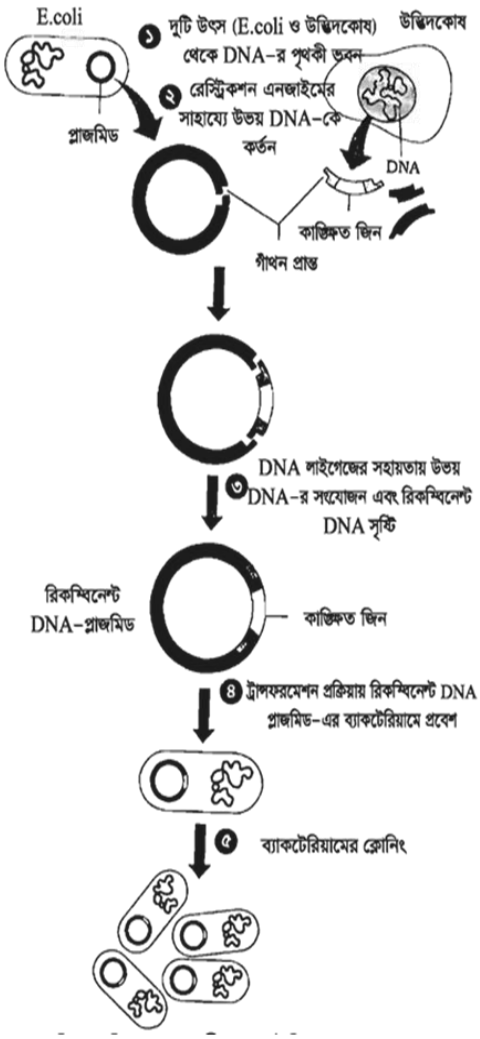

চিত্র: রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি এর ধাপ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ :

জিন প্রকৌশলের এই প্রযুক্তি জীবজগতের উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত জীবকে ট্রান্সজেনিক জীব বলা হয়। গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা কিছু নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্ভাবন করেছেন। যা মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পুষ্টিগুনও নিশ্চিত করা হচ্ছে। ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম ক্লোনিং এর মাধ্যমে প্রাণী উদ্ভাবন করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। তবে ক্লোনিং করা প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীটি হল ডলি নামের একটি ভেড়া।

চিত্রঃ ডলি নামের ভেড়া

জীন প্রকৌশল প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন মানুষের উপর গবেষণা করে যাচ্ছেন। এই গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিউম্যান জিনম প্রোজেক্ট (Human Genome Project) খুবই বিখ্যাত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত জীনের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এই প্রকল্পটি তাদের গবেষণায় সফল হলে মানুষের হাজার হাজার রোগ-ব্যাধি সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসায় একটি নতুন বিপ্লব সাধিত হবে। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমানে বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি বিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির সম্ভবনার দ্বার উন্মুক্ত। নিচে এই প্রযুক্তির কয়েকটি প্রয়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। কৃষিক্ষেত্রেঃ কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেঃ যেমন-

(ক) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদঃ আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (Cotton bollworm) আক্রমণের ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেতো। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাই ব্যবহার করতে হতো ইনসেক্টিসাইড (insecticides পতঙ্গনাশক)। Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির উপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভূট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও এখন Bt cotton চাষ করা হচ্ছে এবং ফলন হ্রাসের সম্ভাবনা কমে গিয়েছে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভূট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইকোসেট একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮ আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছানাশক দেয়া ভালো। কিন্তু ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইকোসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানিগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এই জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভূক্ত করে ট্রান্সজেনিক তুলা ও ট্রান্সজেনিক সয়াবিন উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে গ্লাইকোসেট হার্বিসাইড (herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

(খ) গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা ক্লোভার জাতীয় ঘাস খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিন সমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

(গ) সুপার রাইস (Super rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুইডেনের বিজ্ঞানী I. Portykus (১৯৯৯) ও তাঁর সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন সুপার রাইস। তাঁরা Japonica টাইপ ধানে, ড্যাফেডিল থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এই ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মেয়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। এখন সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়েছে।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর কোট প্রোটিন (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ঙ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে 'নিফ জিন' (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

(চ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি : জোনাকি পোকার দেহে লুসিপারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে 'লুসিফেরিন' নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা উড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধক।

(ছ) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সারা বিশ্বের অনেক দেশে বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেমন- জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই এক প্রতিফলন।

(জ) ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Production of insect pest resistant plant) : অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যারা ফসল উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরা হলো ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ insect pest । জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এসব ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী ফসল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

(i) ইউরোপিয়ান কর্ণবোরার (European corn-borer) এক প্রকার মথ। এদের লার্ভা ভূট্টা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে, ফলে ভুট্টার ফলন শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus thuringiensis*-এর একটি জিন ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই ক্ষতিকারক কর্নবোরার প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *Bacillus thuringiensis*-ব্যাকটেরিয়াতে একটি প্রোটিন তৈরি হয় যা কীট-পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী 'জিন' কে ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে যা পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত ঐ প্রোটিন তৈরিকারী উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে ভুট্টার ঐ নতুন উদ্ভাবিত জাত কর্ণবোরার দ্বারা আক্রান্ত হয় না (কর্ণবোরার নিজেরাই মরে যায়) এর ফলে ভুট্টার ফলন হ্রাস পায় না, ফলন বাড়লে অথবা ফলন হ্রাস না পেলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না, তাই উৎপাদন খরচ আরও কমে যায়। এছাড়া ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে পানির সাথে পুকুর, ডোবা, নদী-নালায় পড়ে জলজ ইকোসিস্টেমের যে মারাত্মক ক্ষতি করে তা থেকেও পরিবেশ রক্ষা পায়। ইনসেক্টিসাইড ছিটানো ফসল থেকে মানুষের দেহে ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড প্রবেশ করে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়। কাজেই পতঙ্গনিরোধী ফসল উদ্ভিদ চাষে খরচ কম পড়ে, উৎপাদন বাড়ে, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা পায়।

(ii) *Bacillus thuringiensis* (Bt) একটি মৃত্তিকাবাসী বড়আকারের ব্যাকটেরিয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এটি বিরাজমান আছে। গবেষণাগারে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে বায়ো-ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ফসলে (যেমন- বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদিতে) প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা পায়, ফলন হ্রাস পায় না, পরিবেশের এবং মানবদেহেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger print) : DNA finger prints বুঝতে হলে প্রথমে finger prints সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফিঙ্গার প্রিন্ট বলতে সাধারণত মানুষের হাতের আঙ্গুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ একই রকম হয় না (ক্লোনিং বা আইডেনটিক্যাল টুইন ব্যতীত)। তাই জমিজমা হস্তান্তর বা রেজিস্ট্রি, কাবিন নামা রেজিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সীম নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট রাখা হয়। দুজন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট ভিন্নতা হয় জিন তথা DNA (A.T.G.C) এর ভিন্নতার কারণে। কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করে জেল ইলেকট্রোফোরোসিস (Gel electrophoresis)-এর মাধ্যমে (উক্ত DNA এর) যে ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় **তাকে DNA finger print বা DNA profile বলে**। প্রথমে কোনো জীব তথা মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে জেল ইলেকট্রোফোরোসিস এর মাধ্যমে জেল স্তরের উপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড় থেকে ছোট হিসেবে কতগুলো সারিবদ্ধ ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফি পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পারিক অবস্থান জানা যায়। প্রত্যেক জীব তথা মানুষের DNA খন্ডগুলোর এমন ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা চিত্রকে DNA finger print বা DNA profile বলে।

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা (Biosafety) বিধানসমূহ

সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যাণের জন্যই অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভারসাম্য অবস্থা। হাজার হাজার বছর ব্যবহারের মাধ্যমে জানা হয়েছে কোনটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, আর কোনটি ক্ষতিকারক নয়। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহার করে পূর্বে জেনে নিতে হবে এটি মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না , বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন, Bt.cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে এই বেগুন খেলে মানুষের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিনা। মানুষের ইমিউন সিস্টেমের উপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Gudelines বলে। এই নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলী এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। **এই নির্দেশিকায় মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।**

এই Biosafety guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি জাতীয় জীবনিরাপত্তায় কমিটি (National Committee on biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (Institutional biosafety committee) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও জীবনিরপত্তা কোর কমিটি (Biosafety core committee) মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (Field level biosafety committee) এবং জীব নিরপত্তা অফিসার (Biological safety officer) গঠন করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিবর্তন কাকে বলে?
২. **হিমোফিলিয়া কী?**
৩. বিবর্তনের প্রধান মতবাদসমূহ কী কী?
৪. ল্যামার্কবাদের সীমাবদ্ধতা কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জৈব বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদগুলো উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন ।
২. ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদ এর মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?
৩. বিবর্তনের স্বপক্ষে বিভিন্ন প্রকার প্রমানসমুহের নাম উল্লেখ করুন ।
৪. Rh- ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করুন।
৫. ইন্টারফেরণ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।
৬. ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা বর্ণনা করুন।

References :

1.Verma PS, Agarwal VK, 1982. Genetics, Fourth edition, S. Chand & Company ltd. Publishers, Ram Najar, New Delhi-110055.

2. www.monstercrawler.com

৩. *আলীম এম এ,ও অন্যান্য* ২০১৮. জীববিজ্ঞান ১ম পত্র, ষষ্ঠ সংস্করণ, মুবীন পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (নিচতলা), ঢাকা-১১০০।

৪. *বেগম হাবিবা*, ২০১৭. জীববিজ্ঞান ২য় পত্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ৩৮ বাংলাবাজার (ফাস্ট ফ্লোর), ঢাকা-১১০০।

৫. *ঘাসান, এম এ*, ২০১৮. জীববিজ্ঞান ১ম পত্র, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, মৈত্রী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ২৪/সি, শীস দাস লেন,ঢাকা-১১০০।

৬. সব ছবি www.goole.com এর image থেকে নেয়া।